মহাশ্বেতা দেবীর
ছোটগল্প সঙ্কলন

আদান প্রদান

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন

(লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত)



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-0296-5

প্রথম প্রকাশ : 1993 (*শক* 1914)
চতুর্থ মুদ্রণ : 2002 (*শক* 1924)

প্রচ্ছদের ছবি : রামকিঙ্কর (1910-1980)
সৌজন্যে : কলাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Mahasweta Devir Chhotogalpo Sankolan *(Bangla)*

মূল্য : 30.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

1984 সালে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন, 'সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখককেই, মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।' এই 'অবিচ্ছিন্ন ধারাটি'ও বায়বীয় কিছু নয়, বরং জাতপাত, জমিজঙ্গলের অধিকার, এবং সর্বোপরি ক্ষমতাসীন শ্রেণীর ক্ষমতার আস্ফালনের তথা কায়েম রাখার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণের ক্রমান্বয়িক ইতিহাস। তাঁর এই নতুন সংকলনটির জন্য লেখিকা যে গল্পগুলি বেছেছেন তার ন'টির মধ্যে আটটির কেন্দ্রে রয়েছে অন্তেবাসী মানুষ—যারা সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, সংস্কার তথা ইতিহাসের শাসনেই নির্বাসিত। এই গল্পগুলিতে এরা কখনো তথাকথিত নিচু জাত, কখনও বা অন্ত্যজ উপজাতিক। এদেশে অর্থনৈতিক শোষণ বহুদিন ধরে ধর্মীয় সংস্কারের মায়াজাল বিস্তার করে তার আড়াল থেকে অব্যর্থ শরক্ষেপ করেছে। এইভাবেই শোষণ লোকবৃত্ত-পুরাকথাকে আশ্রয় করে শোষিতদের মায়াবি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। অন্তেবাসীদের মধ্যে লোকবিশ্বাসের এই ভয়ংকর পিছুটান মহাশ্বেতা দেবীকে একটু বিশেষভাবেই চিন্তিত করে। নিজের লেখা গল্পে যে-সমাজকে তিনি চিত্রিত করতে ক্রমশই আরো আগ্রহী হয়েছেন, তাদের জীবনতথ্য ও ইতিহাসের সন্ধানে যতই তাদের কাছে গেছেন ততই তাদের জীবন-জীবিকা-অধিকারের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন, সেই সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রেই তিনি দেখেছেন ও জেনেছেন এই বিশ্বাসের জগৎ। এই বিশ্বাসে যে-গৌরববোধ, সেই গৌরববোধই হয়ে ওঠে দাসত্বশৃঙ্খল, বঞ্চনাকে আশীর্বাদ বলে মেনে নেবার যুক্তি। মিথ বা পুরাকথা-অতিকথাকে রমণীয় করে দেখানোর যে প্রবণতা এদেশে অদ্ভুত এক অনৈতিহাসিকতাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে, কখনো বা আপাত মার্কসীয় ঢঙে তাকে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের বিবাদী অন্য উত্তরাধিকার রূপে সমাদর করছে, এবং যার ধোঁয়াটে ঐতিহ্যবিলাসের আড়ালে চোরাপথে জায়গা গুছিয়ে বসছে এক রাজনৈতিক হিন্দুত্ব, তারই মূলে আঘাত করেছেন মহাশ্বেতা দেবী।

এই গল্পগুলিতে যে অন্তেবাসী সমাজ বা সম্প্রদায়গুলিকে চেনা যায় তাদের মধ্যে আছে বাগদি ('বান'), ডোম ('বাঁয়েন'), পাখমারা ('সাঁঝ-সকালের মা'), ওঁরাও ('শিকার'), গঞ্জু ('বিছন') দুসাদ ('মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ'), মাল বা ওঝা ('বেহুলা'), সাঁওতাল ('দ্রৌপদী')। এদের মধ্যে 'গঞ্জুদের কাজ মৃত পশুর চামড়া ছোলা', ভিখারী দুসাদের জীবিকা 'ঘুরে ঘুরে ছাগল চরানো', বাঁয়েন হয়ে যাবার আগে চণ্ডীর 'বংশগত উত্তরাধিকার' ছিল 'কাঁচা ভাগাড়ের কাজ'। এই যে জীবিকা বা বংশগত উত্তরাধিকার এই এক একটি সমাজকে বংশানুক্রমে অন্তেবাসী করে রেখে দেয়, তাকে ঘিরে যেন বা সংস্কারের শাসনকেই অনন্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এক একটি পুরাকথা। পাখমারারা 'জরা-ব্যাধের বংশধর', ডোমেরা সেই আদিম গঙ্গাপুত্রের সন্ততি যে হরিশচন্দ্রের কাছে

পৃথিবীর সকল শ্মশান ভিক্ষা পেয়ে নির্বোধ আনন্দে 'দুই হাত তুলে ভীষণ নেচেছিল। উল্লাসে বলেছিল, 'হাঁ, মোরা শ্মশান পেয়েছি গো, সকল শ্মশান পেয়েছি। এ পিথিবীর সকল শ্মশান মোদের।' পুরাকথাকে কেবলমাত্র স্মৃতি বা উপাখ্যানের শ্রুতি মাত্রায় আবদ্ধ না রেখে মহাশ্বেতা দেবী যখন তাকে নাটকীয় মাত্রার বিরাটত্ব দেন, ঐ পৌরাণিক বিস্তারই তখন যুগপৎ ধর্মের ছল তথা ছলনা ও তার মায়াজালের নাগপাশকে মূর্ত করে, অন্তেবাসীকে ইতিহাসের পটের সামনে দাঁড় করায় উচ্চতর বর্গের শঠতার নির্বোধ শিকার হিসেবে। এইভাবেই ইতিহাসের সাজানো বিন্যাসে ফাটল ধরিয়ে তিনি অন্য এক ইতিহাস উন্মোচন করেন — গল্প-বলার বিশেষ শৈলী বা কারিগরিকে যেন এক বিশেষ ভাষা রূপে কাজে লাগিয়েই।

এদিকে কিন্তু অনেক কিছু পালটায় আর্থ-সামাজিক স্তরে। মলিন্দর গঙ্গাপুত্র শ্মশানের ডোম থেকে 'মহকুমার লাশঘরে কাজ পেয়েছে।' সরকারবাবুর সঙ্গে যোগসাজশে সে বেওয়ারিশ মড়ার খুলি-হাড়-কঙ্কাল বেচার ব্যবসায়ে লিপ্ত, সেই চোরা পথে পাওয়া 'উপরি টাকা সুদে খাটিয়ে' সে কয়েকটা শুয়োরও কিনেছে। তবুও তার বিশ্বাসের সংস্কার পালটায় না। নিজের স্ত্রীকে বাঁয়েন বলে চিহ্নিত করে সমাজের বার করে দিতে তার বাধে না। মহাশ্বেতা দেবীর 'বাঁয়েন' গল্পের সবচেয়ে যন্ত্রণার জায়গা এইখানেই। যারা নিজেরা ভদ্র সমাজ থেকে নির্বাসিত তারাই আবার নিজেদের একজনকে নিজেদের সমাজ থেকে বার করে দেয়। মনুষ্য সমাজের প্রান্তদেশে যাদের অবস্থান, তারা যখন কাউকে বার করে দেয়, সেই নির্বাসিতা যেন মনুষ্যেতর শ্রেণীতে গিয়ে পড়ে, নিজেও সেই জায়গাটা মেনে নেয়। চণ্ডী তাই মানুষ নয়, বাঁয়েন। মলিন্দর ছেলে ভগীরথকে বলে, 'আগে মানুষ ছিল, তোর মা ছিল।' সংস্কারের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অনির্বাণ মানবতার দ্বন্দ্ব কখনোই নিঃশেষ হয় না। তাই বাঁয়েন চণ্ডীরও 'হঠাৎ মানুষের বউয়ের মতো অবিবেচক মলিন্দরের ওপর রাগ' হয়। এই গল্প অন্য বাঁক নেয় তখনই যখন আধুনিক মানসিকতার প্রতিভূ হয়েই ভগীরথ তার মায়ের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করে, যখন সে চণ্ডীকে কিছুতেই আর মানুষ না ভেবে অন্য কিছু ভাবতে পারে না। চণ্ডীব সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুত্র ভগীরথ যেন সমাজবিচ্ছিন্না এই মহিলাকে আবার টেনে আনে সমাজের দায়দায়িত্বের মধ্যে। প্রথমে 'টোকাটাকে' সামলাবার দায়িত্ব থেকেই অবলীলায় অনিবার্যভাবেই চণ্ডী পৌঁছে যায় ট্রেনযাত্রীদের বিপুলতর সমাজকে রক্ষা করার দায়বোধে।

একটা পবিত্র ভয়ে যে সমাজ একদা চণ্ডীকে বাঁয়েন ঘোষণা করেছিল, চণ্ডী তার নতুন প্রতিরোধী ভূমিকায় সেই পবিত্র ভয়ই ধরায় সামাজিক ডাকাতদের মনে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই সূত্রগুলিই মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের প্রাণ। 'ওর সমাজের মানুষদের এত ভয় পেতে বাঁয়েন কোনোদিন দেখেনি।' সমাজের বাইরে নির্বাসিত জীবন যাপনের জমাট যন্ত্রণা নবোন্মেষিত মানবতাবোধের দাহে প্রজ্বলন্ত হয়ে উঠে সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিবেকের রূপ পায়। আধুনিক ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যে সুপরিচিত বহিঃস্থ মানুষের ভূমিকা এখানে অন্য এক মাত্রায় সঞ্জীবিত হয়। সমাজের অবিচারই চণ্ডী বাঁয়েনকে এই শক্তি দিয়েছে সেই অবিচারেরই আরেক প্রকাশকে প্রতিহত করতে। চণ্ডীর এই প্রবল নৈতিক আত্মঘোষণা চণ্ডীকে ফিরিয়ে আনে তার সমাজে। ভগীরথ যখন রাষ্ট্রের কাছে, প্রশাসনের কাছে তার বংশপরিচয় দেয়, নিজেকে চণ্ডী বাঁয়েনের সন্তান বলে পরিচয় দেয়, সেই নাটকীয় ক্ষণটি হয়ে ওঠে গল্পের তুঙ্গমুহূর্ত, পুরাকথাসম কোনো পুনর্জন্ম যেন।

সংস্কারের পাথরভার ফেলে দিয়ে আধুনিক মানসিকতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আরেকটি ছবি 'বেহুলা' গল্পে। এখানে বহিঃস্থ সংস্কারকের দায় নিয়ে আসে বসন্ত কুমার। এখানে পুরনো সংস্কারের ধারক শ্রীপদ মাল—'এ অঞ্চলে সাপের ওঝা, উইচ ডক্টর।' কিন্তু যেখানে মুনাফাব হিসেব মৃত্যুকে লালন করে (একদিকে হেদো নস্কর ঠিক দাম না পেলে ইঁটের পাঁজা বেচবে না, আর সেই ইঁটের পাঁজায় সর্পকুল বংশবৃদ্ধি করে যাবে ; অন্যদিকে 'সর্পদংশন কোনো ওষুধ কোম্পানিকে আগ্রহী করতে পারে না, কেননা সাপ কামড়ায় চার লাখ মানুষকে, মরে হাজার বিশেক'), সেখানে বসন্ত-শ্রীপদের মধ্যে গভীর সহযোগ গড়ে ওঠে, শিক্ষার স্বচ্ছন্দ বিনিময় ঘটে, 'বিজ্ঞান ও বিষহরি, উভয়ের সাধনা' যুক্ত হয়। কিন্তু এই গল্পে মহাশ্বেতা দেবী নানা ভাষাকে ব্যবহার করেন কাহিনীকে অন্য মাত্রা দেবার উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞানের ভাষায় ইংবেজির অফুরন্ত মিশেল একদিকে দূবস্থ ক্ষমতাসূত্রের অদৃশ্য শাসনের দ্যোতক হয়, অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহরের সংস্কৃতিব ব্যবধানেরও সাক্ষ্য বহন করে। বসন্তের গ্রামদর্শন তথা তার দৃষ্টিকোণ একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে যে দূবত্ব বহন করে তারই পরিচয় লেগে থাকে বাংলা বুনটের মধ্যে বিজাতীয় শব্দেব বাহুল্যে— 'এখানে অপুষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানবশরীর ও কালাজ অ্যাবাউনডিং'— 'অবলাইজ', 'বেজিম', 'এ্যাকাডেমিক আকর্ষণ', এমনি শব্দগুলি যেন বসন্তেব চর্চিত বৌদ্ধিকতার সংস্কার থেকে উঠে এসে এই গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকেই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় অবরুদ্ধ করতে চায়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাষা ও দৃষ্টিকোণও একেক সময় যেন ব্যবধানের প্রাচীর হয়ে ওঠে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘনিষ্ঠ সংলাপ, ও সেই সংলাপের মধ্য দিয়েই এক মানবসম্পর্কের উন্মেষে এই ব্যবধান ভাঙে। যেমন 'বাঁয়েন'-এ, তেমনি 'বেহুলা'তেও। দুটি গল্পেই সংস্কারের মধ্য থেকে অন্যতর সমাজবোধের এই যে দীপ্ত উন্মেষ, তাকে সংস্কারমুক্ত এক অন্যতর পবিত্রতা বা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কবার জন্যই যেন মহাশ্বেতা দেবী এক প্রাণপ্রদ মৃত্যুতে পরিণতি দেন। 'বেহুলা' গল্প শেষ হয় এক ভয়মুক্ত সংস্কারবিনাসী সর্পযজ্ঞে: 'গ্রামের লোকগুলির শোক, কালাজ বিষয়ে ভয়, হেদো নস্করের ওপব রাগ, সব উত্তরিত হয় এক্ষণিক প্রজ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে।' শ্রীপদর মৃত্যুকালে সে যে মুক্ত, সর্ববিদারক দৃষ্টি নিয়ে দেখতে দেখতে জানতে জানতে বুঝতে বুঝতে মৃত্যু বরণ করে, সেই মৃত্যুর মধ্যেই এই মুক্তির আশ্বাস নিহিত ছিল।

'সাঁঝ-সকালের মা' ঠিক অমনই এক মৃত্যুকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এই মৃত্যুর কাছে এসে, এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জটেশ্বরী ঠাকুরনি সত্তা থেকে তার স্বাভাবিক মানবী সত্তায় ফিরে আসে। যে পুত্র সাধনকে জটি একদা বারণ করে দিয়েছিল, 'মা বোলে ডাকো না বাপ, বাপো আমার,' যার কাছে সে হয়ে উঠেছিল, 'সাঁঝে আর সকালে তু মা, আর দিনেমানে তু ঠাকুরনি', সাধনের 'সাঁঝ-সকালের মা', সেই সাধনকে সে মৃত্যুর আগে আবার তাকে মা বলে ডাকবার অনুমতি দেয়। জটির দেবীত্বমুক্তিব ক্রমিক ইতিহাস বস্তুত শুরু হয় এই 'মা' ডাকার অনুমতিদান থেকেই। তারপর অনাদি ডাক্তার দেখে, 'জটি ঠাকুরনির চোখে শুধু আশ্চর্য, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ... আসন্ন মৃত্যু ছাড়া আর কেউ এমন সৌন্দর্যে মানুষের চোখ রাঙিয়ে দিতে পারে না।' তার মানবীত্বে প্রত্যাবর্তনেরই ইংগিত বহন করে 'অনাদি ডাক্তারের টেবিলে মাঝে মাঝে যে-সব যুবতী মেয়েরা অসহায় বেদনায় শুয়ে থাকে', তাদের

সঙ্গে জটির তুলনায়। চণ্ডী বাঁয়েনের মতো, শ্রীপদ মালের মতো জটি ঠাকুরনিও মৃত্যুতে এক মহনীয় মাত্রা পায়: 'যেন এক অন্ত্যজ, গরিব, হতভাগিনী মারা যাচ্ছে না, যেন কোন মহামানী দামী মানুষ মারা যাচ্ছে তাই এত ভিড়।'

'বাঁয়েন'-এর সঙ্গে মিল আছে 'সাঁঝ-সকালের মা'-র। ডোমদের অভিশপ্ত অন্ত্যজ জীবনের পিছনে যেমন হরিশচন্দ্রের উপহার, পাখমারারাও তেমনি জরা ব্যাধের বংশধর রূপে 'ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল বলে' 'অভিশপ্ত'। একই ভাবে বন্য আত্মনিবেদনের রোম্যান্স্-এ মলিন্দর-চণ্ডী জটি-উৎসবের প্রেমের সূত্রপাত। মলিন্দরের মতোই জটি-উৎসবও প্রথাগত বৃত্তি ছেড়ে সরে এসেছিল। 'এখন তুমি জাতে উঠেছ, শ্রেণী বদলিয়েছ।' কিন্তু সংস্কারে প্রোথিত ভয় যায় না। জাতে ওঠার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, পুরনো জাতপরিচয় মুছে ফেলার দুরন্ত সাধ, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়—এ নিয়ে তাদের অনেক দিন কাটে। যতদিন উৎসব বেঁচে থাকে। এবার আর চেষ্টা করেও জটি পাখমারাদের সমাজে ফিরে যেতে পারে না, তাদের খুঁজেই পায় না। 'অলৌকিকতা দিয়ে নিজের চারদিকে বর্ম ' এঁটে জটি নিজেকে বাঁচিয়েছিল, 'সন্ধে হলে ঠাকুরনি হয়ে যেত সাধনের মা। ঠাকুরনি হয়ে যে চাল পেত, মা হয়ে তার ভাত রেঁধে ওর হাবা ছেলেকে খাওয়াত!' যে পবিত্রতাকে বা দেবীত্বকে জটি বাঁচবার ও ছেলেকে বাঁচাবার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যেই নিহিত ছিল অর্থহীন আচারের প্রতি সেই অনীহা যা নাটকীয় মাত্রা পায় যখন সাধন পুরোহিতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় 'ছরাদের চাল', যা 'খেতে নাই'। আবার মহাশ্বেতা দেবী তাঁর স্বভাবধৃত ভাষাপ্রয়োগে এই আপাত অনাচারকে মানবীয় মর্যাদা দেন, ক্ষুন্নিবৃত্তিকে ধর্মের ঐশ্বর্য দেন, আবার ঐ ভাষার গার্হস্থ্য অন্তরঙ্গতায় তাকে কঠিন, নির্মম বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেন: 'বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাঁধবে। ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ-সকালের মা বাঁধা থাকবে। মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। 'মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।'

সাধন কান্দোরীর অপরিণতবুদ্ধি সারল্যের মধ্যে একটা নগ্ন সত্যদৃষ্টি আছে যা ক্ষুধার রূঢ় বাস্তবকে সবার উপরে স্থান দেয়। সেই একই দৃষ্টি 1435 শকাব্দে চৈতন্যের সমকালে কল্পিত 'বান' গল্পে বালক চিনিবাসের। এদের দুজনেরই চোখে ধর্ম ও ক্ষুন্নিবৃত্তি সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। এক বিচিত্র আয়রনির প্রসাদে মহাশ্বেতা দেবী যেন এই কথাই বলতে যান, ক্ষুধার অন্নের সংস্থান করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে বড় আর কোন্ আদর্শ ধর্ম হয়ে উঠতে পারে? 'বান' গল্পটিতে আকাঙ্ক্ষিত, প্রত্যাশিত চৈতন্যদেব যখন চিনিবাসের গ্রামে শেষ পর্যন্ত আসেন না, তখন চিনিবাসের আশাভঙ্গ শুধু সাম্যের, সান্ত্বনার, অভিযোগ-নিরসনের প্রত্যাশারই বিনাশ নয়, 'শুধু তো গৌরাঙ্গ দর্শন নয়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।' অতীতে গঙ্গার কোনো এক বান তার ভয়ংকর ধাক্কায় অন্তত সাময়িকভাবে জাতপাতের বিভাজনকে আড়াল করেছিল, উঁচু জাতের ক্ষমতাবান প্রতিভূরা অন্ত্যজ দরিদ্রদের তাঁদের উদ্বৃত্ত খাদ্য পরিবেষণ করেছিলেন। সেই একবারই অন্তেবাসীদের হৃদয় ও পেটের

ক্ষুধা শান্তি পেয়েছিল। তাই স্বভাবতই চৈতন্যপ্রেমের বানের সম্ভাবনায় চিনিবাস সেই একই পরিণাম কল্পনা করে, কামনা করে। এই দুই বানকে মিলিয়ে দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী যেন অসাম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠাকে ঘিরেই একটা অন্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন—দয়া, দাক্ষিণ্য, হৃদয়পরিবর্তনে নয়, একটা প্রবল বিপর্যয়ের মধ্যেই ঘটতে পারে ঐ সাম্যের প্রতিষ্ঠা।

স্মৃতি, সংস্কার, অক্ষমতাবোধ, ভয় অন্ত্যেবাসীদের যে শুধু দমিত করে রাখে তাই নয়, তাদের মন ও চরিত্রের গভীরেও ক্রিয়া করে যায়। এই ক্রিয়া প্রথমে হয়ত টিঁকে থাকার পদ্ধতি-কৌশল আবিষ্কার-উদ্‌ভাবনে মুক্তি খোঁজে (যেমন জটির ঠাকরুন হয়ে ওঠায়), কখনো বা এক শুদ্ধ মানবীয় আবেগে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি এনে দেয় (যেমন বাঁয়েনের সেই অতিমানবীয় ভূমিকায়)। সত্তরের দশকের প্রথম পর্যন্ত এই দিকটাই মহাশ্বেতা দেবীকে বেশি ভাবিত করেছিল। ঐ ভয় অন্ত্যেবাসীদের মধ্যেই সীমিত নয়। মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিমণ্ডলে ঐ ভয়ের ছবি ‘রং নাম্বার’ গল্পে। 1972 সালে লেখা এই গল্পটি একদিক থেকে দেখতে গেলে একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা টেনে দিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলির মধ্যে একটা বিভাজন এনে দেয়। তেমন যান্ত্রিক কোনো বিভাজন নয়, তবুও বিভাজন। ‘দ্রৌপদী’ (1976), ‘বিছন’ (1977), ‘শিকার’ (1978) গল্পে একটা প্রবল প্রতিবাদী চেতনা প্রতিবোধে উদ্যত হয়। অন্ত্যেবাসীরা এবার লড়াইয়ের পথে নেমেছে। ‘দ্রৌপদী’তে সে-পথ সংগঠিত আন্দোলনের। কিন্তু অন্য দুটি গল্পে প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণ স্বতঃস্ফূর্ত; এবং তা অন্ত্যেবাসীদের জীবনযাপন তথা অনেক-কিছু মেনে নিয়ে টিঁকে থাকার যে প্রাণান্ত অভিযান, তারই অন্তস্তল থেকে উৎসারিত, বাইরে থেকে সঞ্চারিত কোনো রাজনৈতিক বোধ বা চেতনার পরিণাম নয়।

তবুও সত্তরের দশকের শেষপাদে লেখা এই তিনটি গল্প বা এই সংকলনে অনুপস্থিত ঐ সময়ের অন্য গল্পগুলি কোনোমতেই ব্যতিক্রমী নয়। ‘বিছন’ গল্পে দুলন গঞ্জুর অভিজ্ঞতায়, ‘বেঁচে থাকবার কৌশল ভাবতে ভাবতে বাবা কোনোদিন ছেলে বা নাতির সঙ্গে কথা কইতে সময় পেল না।’ ‘বাঁচবার তাগিদেও, জোর খাটিয়ে নয়, ফিচলেমি করে সর্বদা প্রতি পরিস্থিতি থেকে ফায়দা তুলে নেয়।’ কিন্তু ঘটনা তথা ইতিহাস দুলনকে ঐ অবস্থানে থিতু হয়ে থাকতে দেয় না। মহাশ্বেতা দেবীর লেখকধর্ম স্বরূপ ঐ ইতিহাসচেতনা শুধু তাঁরই নয়, তাঁর চরিত্রদেরও, যাদের মধ্যে ইতিহাস চেতনায় জারিত হয়ে চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের এই আত্মীকরণকে তাঁর কাহিনীধর্মে পুরাণের মাত্রা দেন নানাভাবে— কখনো নতুন কোনো গানের জন্মে, যেমন ধাতুয়ার সেই গান, ‘কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন? তারা পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে’— কিংবা পুরাণ-প্রকৃতির সেই মেলবন্ধনে যাতে মৃতদের শরীর ও অস্থি প্রকৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করে, বীজ হয়ে ফলনের কারণ হয়। দুলন বলে, ‘ধাতুয়া, তোদের হম বিছন বনা দিয়া।’ সেই ফলনের আদিম আবেগ থেকেই এক বৈনাশিক প্রতিহিংসাস্পৃহা জাগ্রত হয়। জন্ম-বিনাশের অবিচ্ছেদ্য দ্বান্দ্বিকতায় নবপুরাণের মাত্রা লাগে। তখনই সংস্কারের দাসত্ব ভেঙে পড়ে যুগান্তর ঘটে।

‘শিকার’ গল্পে অন্ত্যেবাসী মেরী ওঁরাও সাহেবের জারজ হিসেবে জাত-পাত সংস্কারের বিচারে এক অদ্ভুত বৈষম্য-দূরত্বে প্রতিষ্ঠিত। ‘আদিবাসী যুবকদের কাছে মেরীর গায়ের রঙ একটা প্রতিরোধের দেয়াল।’ ‘শ্বেতাঙ্গ পিতার জারজ মেয়ে বলে ওকে ওঁরাওরা রক্তের রক্ত মনে করে না এবং স্বয়ং স্ব সমাজের কঠোর রীতিনীতি ওর ওপর আরোপ করে

না।' আবার ঐ ওঁরাও সমাজের সংস্কারের যাবতীয় প্রতিবন্ধের বাইরে তাকে মুক্তি দিয়ে তার যথার্থ সমাজ তাকে এক বিশেষ অধিকার তথা শক্তি দেয়, তারা নিজেরাও মানে, 'মেরীর মধ্যে সাচাই আছে, অস্ট্রেলিয়ান রক্তের তেজ।' ঐ সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে — আবার বাঁয়েনের মতোই — শিকারের 'পবিত্রতাকে' অন্য মাত্রায় অন্য পবিত্রতা দেয় মেরী তার প্রতিহিংসাত্মক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। জাত-পাতের যে পবিত্রতা উঁচু জাতকে প্রশ্রয় দেয়, নিচু জাতকে শোষণ করবার, অসম্মান করবার অধিকার দেয়, তার বিরুদ্ধে শিকারের প্রাচীন আচারের পবিত্রতাকে আশ্রয় করে মেরী যেন তার নিজস্ব সমাজের ধর্মকেই পুনরাবিষ্কার করে তাকে আত্মস্থ করে : সে আর তখন তোহরি বাজারের বাজারিয়া নয়, প্রসাদজীর মুনাফার নিষ্ঠাবতী রক্ষয়িত্রী নয়, বড় শিকারের পর যেন তার পুনর্জন্ম হয়। তার প্রতিশোধ পৌরাণিক মাত্রা পায় : 'নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছে ও।' তারপর সে যেন অন্য এক পুনর্জাত মেরী ওঁরাও 'মদ আর গান, মদ আর নাচ'-এর মধ্য দিয়ে তার সমাজের জীবনের ছন্দের স্বাদ নেয়, তার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে, নবার্জিত স্বাধিকারে, 'বড় শিকারের' অর্জনের দাবিতে। কিন্তু এখানেও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতায় যে-মুহূর্তে মেরী ওঁরাও তার পদানত পর্যুদস্ত-নিপাতিত সমাজের অতীত শক্তিকে আবিষ্কার কবে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ কবে, সেই মুহূর্তে সে যুগপৎ তার স্বসমাজে তার স্থান নিজে করে নেয়, আবার সেই সমাজকে পেরিয়ে যায়, কারণ যে অতীত আজ তার করায়ত্ত তথা চেতনায় প্রসারিত সে-অতীত আজ আর তার সমাজের নয়, বরং জালিমকে নিয়ে যে ভবিষ্যৎ সে সৃষ্টি করতে চায়, তারই দিগ্‌দর্শন।

নবপুরাণের ভাষাতেই যেন মহাশ্বেতা দেবী লেখেন : 'তখন নাচতে নাচতে মেরী পিছোতে থাকল। পিছোতে পিছোতে অন্ধকারে ওরা নাচছে, খুব নাচছে। মেরী অন্ধকারে ছুটে চলল।' পিছনো-এগনো ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতায় যখন একাত্ম হয়ে যায়, তখন অতীতেব পথ ভবিষ্যতেরই পথ। তাই শিকারের আদিম শক্তি আয়ত্ত করে মেরীকে যেতে হবে বাস-এ চড়ে, কাঠের ট্রাকে করে 'রাঁচি-হাজারীবাগ-গোমো-পাটনা', অরণ্যের আদিম মায়াবি অন্ধকারের গভীরে নয়। 'অন্ধকারে, তারার আলোয় রেললাইন দেখে পথ চলতে চলতে মেরীর মনে কোনো ভয় এল না, কোনো জানোয়ারের ভয়। আজকে ও সবচেয়ে বড় জানোয়ার মেরেছে বলে বন্য চতুষ্পদদের বিষয়ে সব প্রাত্যহিক, রক্তে অভ্যাসের ভয় ওর চলে গেছে।' জঙ্গল থেকে রেললাইন— ইতিহাসেরই অমোঘ যাত্রাপথ।

মেরী স্বেচ্ছায় আসে জঙ্গল থেকে রেললাইনে। 'দ্রৌপদী' গল্পে দোপ্‌দি মেঝেন্‌কে পুলিশি প্রশাসন বিশ্বাসঘাতক দলছুটদের সঙ্গে যোগসাজসে টেনে আনে জঙ্গল থেকে সেনানায়কের ক্যাম্প-এ—ইতিহাসেরই আরেক পথ ধরে একই অমোঘ যুক্তিতে। 'শিকার' ও 'দ্রৌপদী' একই কাহিনীর দুই পিঠ। মেরীর রক্ত 'সাহেবি রক্ত'। 'দোপ্‌দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপ্‌দির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়লডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওয়ার্ডস রাঢ়ভূমি।' মেরীকে ছেড়ে আসতে হয় তার সমাজকে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দোপ্‌দি বাঁধা পড়েছে শক্তপোক্ত সূত্রে তার সমাজের সঙ্গে, যে-সমাজ আবার ঐ

আন্দোলনের কারণেই আরো প্রসারিত, বৃহত্তর — তাতে শহরের সেই ছেলেরাও আছে যারা নির্মম সমরনীতি রচনা করে: 'অরিজিতের গলা, যদি কেউ ধরা পড়ে, টাইম বুঝে অন্যরা হাইড-আউট চেন্‌জ করবে। ....কোনো কমরেড নিজের জন্যে অন্যদের ডেসট্রয়েড হতে দেবে না।' তাই সেই সমাজের সহজাত চেতনা নিয়েই দোপ্‌দি লড়াই করতে করতে তার সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকেই লালিত করে। সেই শক্তিরই পৌরাণিক মাত্রায় অতিকায় প্রকাশ ঘটে তার 'সর্ব সত্তার শক্তি' দিয়ে তার 'একবার, দুবার, তিনবার' সেই প্রবল কুলকুলিতে যাতে গল্পের দ্বিতীয় পর্বের নাটকীয় পরিসমাপ্তি। জঙ্গলে যা কুলকুলি, প্রতিপক্ষের শিবিরে তাই কিন্তু পুনরুচ্চারণে সমানই দুর্মর 'লেঃ কাঁউটার কর্‌...।' 'শিকার' গল্পের শেষে মেরী যে ভয় পার হয়ে আসে, ইতিহাসের দাবার ছক উলটে দিয়ে দোপ্‌দি সেই ভয়ই সঞ্চার করে দেয় সেনানায়কের মনে। 'দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।' 'শিকারে'র ভিত্তি ও পরিবেশ জঙ্গলই, 'দ্রৌপদী'তে জঙ্গল আর প্রশাসনের সংঘাত। তার ভাষাতেও তাই সেই সংঘাত, ভাষার স্তরবৈচিত্র্য: ড্যসিয়ারের ইংরেজী ক্ষমতার, অধিকারের, শাসনের ভাষা; তকমাধারীদের ভাষায় তা নেমে আসে মধ্যম স্তরে, যেখানে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়; সেনানায়কের ভাষায় এবং তাকে ঘিরে ভাষার যে বহুমাত্রিক আবহ মহাশ্বেতা দেবী রচনা করেন, তাতে আছে ক্ষমতার আরো এক জটিল বিন্যাস। এই নানা ভাষার বুনটে তৈরি ক্ষমতার জাল ছিন্ন করেই উচ্চারিত হয় দোপ্‌দির ভাষায়: 'লেঃ কাঁউটার কর্‌'— যেখানে প্রশাসনের ক্ষমতার ভাষা তার উচ্চারণে উলটে পড়ে, মাথা থুবড়ে পড়ে, তার প্রবল শারীরিক তাড়নায় তারই শরীর থেকে, তার প্রতিরোধী রোষ থেকে অর্থান্তরে পৌঁছে যায়।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্প উপন্যাসে যে কথনবৃত্ত বেছে নিয়েছেন তাতে যেমন বাস্তবের উপস্থিতি রয়েছে, তেমনই রয়েছে সেই বাস্তবকে ইতিহাসের ক্রমান্বয়তায় পরিবর্তমান রূপে দেখানোর নানা পদ্ধতি: ইতিহাস মানে এখানে কেবল অতীতের উৎস বা উত্তরাধিকারের উদ্‌ঘাটন নয়, বরং অতীত থেকে ভবিষ্যতের যাত্রাপথের ইংগিতও বটে; তাতেও অবশ্য আশাবাদী ভবিষ্যদ্দর্শনের সহজ উত্তরণ নেই, বরং বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজের উদ্‌গমের পুরাকথাসম উদ্‌ভাস আছে। বাস্তবে এমন হয়ত ঘটে না বা ঘটেনি, বা ঘটলেও ঘটেছে আপতিক অতর্কিত কোনো উৎক্ষেপে; মহাশ্বেতা দেবী সেই সম্ভাব্য বা সম্ভাবনাকেই এক পুরাবৃত্তীয় বিস্তার তথা কল্পমাত্রা দেন যা বাস্তবের মধ্য থেকেই উদ্‌গত হয়ে বাস্তবকে অতিক্রম করে। ভাষাকে টেনে প্রসারিত করে তার মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাস্তবের একাধিক মাত্রা ও তাদের অহরহ টানাপোড়েনকে গ্রথিত করে তিনি ভাষার এমন এক ক্ষেত্র রচনা করেন যে ঐ ক্ষেত্র থেকে ঐ নাটকীয় কল্পক্ষণের উদ্‌ভব কখনোই রূপকথা হয়ে যায় না, বরং বাস্তবেরই অনিবার্য উপচিতি মনে হয়। দোপ্‌দি মেঝেন্‌, দুলন গঞ্জু, চণ্ডী বাঁয়েন, শ্রীপদ মাল, জটি ঠাকুরনি, এরা সকলেই বাস্তবেরই মানুষ হয়েও বাস্তববিসারী।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

বান

ভাদ্রমাসে রান্নাপূজার দিন এসেছে, এ সময়ে গৃহস্থমাত্রেই মনসাগাছ খোঁজে। রূপসী বাগদিনীর ছেলে চিনিবাস মনসাগাছ খুঁজতে গেল। মনসাগাছ নিয়ে পূর্বস্থলীর গৃহস্থরা উঠোনে পোঁতে। মনসা বাস্তু। মনসা ক্ষেতে ধান, গাইয়ের পালানে দুধ, পুকুরে মাছ, গৃহস্থ বউয়ের কোলে ছেলে দেন। কিন্তু ঘরে ঘরে মনসাগাছ থাকে না। রান্নাপূজার পরদিন অরন্ধন।

'মা, রান্নাপূজা করবি না?' চিনিবাস জিগ্যেস করেছিল।

'না বাপ, এবার আমাদের রান্নাপূজা নেই।'

'কেন মা?'

'ই সনে তোর কাটোয়ার জ্যেঠা মরেছে না?'

'তোকে বললে কে?

'আমি জানি।'

চিনিবাস অবাক হয়ে ভাবল, এ কেমন কথা হল? গতবছর তো রান্নাপূজার দিন মা পিদিম জ্বেলে বসে কত কি বেঁধেছিল। শোল মাছের টক, নারকেল দিয়ে কচুশাকের ঘন্ট, তিতোপুঁটি ভাজা, সরলপুঁটির ঝাল, ময়ামাছ আর বেগুনের ঝোল, চালবাটা দিয়ে ঢেঁকিশাক, পিটুলি দিয়ে পাট পাতার বড়া আর তালবড়া। পরদিন দু'বেলা ধরে চিনিবাস তাই খেয়েছিল।

এ-বছর বড় কষ্ট, এদিকে গঙ্গায় বান ওদিকে খোড়ে নদী টুবুটুবু। চিনিবাস শুনেছে অঞ্জনা নদীতে তিন খানা বাঁশ ওপর ওপর রাখলে ডুবে যায় এমনই ভাসাভাসি। সবাই বলাবলি করছে বান আসবে। বান কেমন জিনিস তা চিনিবাস দেখেনি। চিনিবাসের মা যখন ছোট ছিল তখন নাকি কাটোয়ার গঙ্গাতে বান এসেছিল।

চিনিবাসের মা নারকেলপাতা চেঁছে কাঠি বের করছিল। অন্তত দশটি নতুন ঝাঁটা বেঁধে দিতে হবে, নইলে আচার্যবাড়ির কাজ চলবে না।

'মা বান কেমন করে আসে গো?' চিনিবাসের কথা শুনে রূপসী বড় বিরক্ত হল বলল, 'দেখিস এখন।'

রূপসীর মা গাবগাছের আঠা দিয়ে বাঁশের মাছধরা পলো পালিশ করছিল, সে বলল, 'দেখবি রে দেখবি, বান হবে, মড়ি হবে, মানুষ নিয়ে শেয়াল-শকুন ছিঁড়ে খাবে।

'উ কি কথা মা?' রূপসী মৃদু ধমক দিল।

'নেয্য কথা লো নেয্য কথা! পিঁপড়ে পতঙ্গ ভেসে যাবে, হাতী-ঘোড়া জীয়ে থাকবে, এ হল শাস্তরের কথা।'

'তবে যে সবাই বলতেছে ই বানে কেউ মরবে না?' চিনিবাস আবার জিগ্যেস করল।

'ও গোরাপ্রেমের বানের কথা? উ আমি জানি না বাবু। আমি তো শুনলাম শান্তিপুর-কাটোয়ার জনমনিষ্যের আর আনকথা মুখে নাই। শুনে আমি হেসে বাঁচি না। হাটে যেতে দেখি সবাই এক কথা বলে। আমি যাকে শুধাই কথাটি কি গো? সেই বলে,

আ লো বাগদীবউ, কি যে কথা সে তো আমরা বুঝি না। শুধু শুনি গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী নাকি উঁচুকে নিচু আর নিচুকে উঁচু করবে বলে লেচে বেড়াচ্চে। শুনে তো আমি শুধাই, হ্যাঁ গো, তবে কি আমরা ঠাকুরদের পুকুরে জল সরব, উনাদের মত পালঙে শোব, খইমুড়ি যা মন হয় তাই খাব? তা যদি না হয় তবে আমি গোরাপ্রেমের বানে ভাসব কেন? আমায় সবে খুব মুখ নাড়লে, আমি বক্‌না বাছুরটা খুঁজে নিয়ে চলে এলাম। ই আবার কোন বান বাবা?'

'মা!' রূপসী গলা তুলল।

'আ লো দেখিস! অঙ্গ যে রসে গেল।'

'তুই তো মা গৌরাঙ্গ দেখিসনি?'

'দেখতে যাব কেন লো? গৌরাঙ্গ কি আমায় রাজা করবে?'

'তবে যা মাছ্ ধরগা যা!'

'আ লো, রূপের গোমর করিস না। মাছ্ ধরা আজ মন্দ কাজ হল। এই মাছ্ ধরে ধরে তোকে এত বড়টা করেছিলাম।'

চিনিবাস দেখল বাতাস বেগতিক। সে মনসাগাছ নেবে কি না জানবার জন্যে বাতাসের আগে আচার্যবাড়ি গেল।

পূর্বস্থলীর আচার্য পরিবার বড় ধার্মিক সচ্ছল গৃহস্থ। এই 1435 শকাব্দে কম গৃহস্থেরই ক্ষমতা আছে যে, নিত্য কাঙালী ভোজন করায়। কিন্তু বড় আচার্যের উঠোনে বেলা দুপুর পর্যন্ত এখনো একশতটি পাতা পড়ে। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর সংবাদ এখন বাতাসের আগে ধায়। এখন তিনি গৌড় থেকে শান্তিপুর গিয়ে মাতৃদর্শন করে আবার নীলাচলে চলেছেন। বড় আচার্যের ইচ্ছা যে এ পথ দিয়ে নিমাই গেলে তাঁর বাড়িতে দুটি দিন রাখবেন।

'আ গো কেন?' তাঁর আচার্যানী জানতে চেয়েছিলেন। বড় আচার্য তো সিরস্তদার, পোতদার, ধনীমানী মানুষ দেখলে তবে সম্মান করেন। যুবক সন্ন্যাসীকে এ সম্মান কেন?

'কেন! কেন কি গো? আমি দশজনকে ভাত দিই কেন?'

'পুণ্য কর।'

'পুণ্য কর! একে বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। দশজনকে ভাত দেও, কাপড় দেও মানুষ তোমায় মাথায় করে রাখবে।'

'গৌরাঙ্গকে সম্মান করো কেন?'

'ও গো, গৌরাঙ্গ এখন নতুন নতুন গো! মানুষ এখন গৌরাঙ্গের নামে সত্বর মজে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে তার এখন সমাজে সম্মান। শান্তিপুরের তাঁতি বেটারা অব্দি গৌরাঙ্গ যখন নগরে গেল, তখন কাঙালীরে কাপড় বিলিয়ে নাম করল। আমি যদি করি আমার ভাল হবে।'

'আ গো আপনি তো অধিক ব্যয় করতে ডরাও। তা গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী আসবে, তার চেলাচামুণ্ডা এতগুলি! ব্যয় হবে কত আমি সে কথাটি ভেবে মরি।'

'আরে স্ত্রী-বুদ্ধি! গৌরাঙ্গ এখন কৃষ্ণনামে মেতে রয়েছে। সে মানুষ একবার আসবে, একবার নয় ব্যয় করব। তুমি বোঝ না। এতে আমার নামডাক দশদিকে যাবে।'

'তিনি নাকি মানুষ ডেকে ডেকে আচণ্ডালে কোল দেয়? এ কথাটি জেনে আমি অবাক যাই গো!'

'কোল দিলে কি? কোল তো উনির সঙ্গে যাবে। উনি গেলে তবে চাঁড়াল বাগদী আবার যেমন ছিল তেমন রইবে। তোমার এত কথায় কাজ কি? যাও না, রান্নাপূজার কাজে যাও না!'

বড় আচার্যানী নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন। আচার্য তো বলেই খালাস। বসে বসে শত শত লোকের রান্না করেন, এখন কি তাঁর সেদিন আছে? সকলের রান্না সেরে ভাত খেতে খেতে সন্ধ্যে হয়। উনোনে রাতের ভাত-ডাল বসিয়ে দিয়ে তবে তিনি খেতে বসেন।

'কে রে?'

উঠোনের এক কোণে চিনিবাস এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমি চিনিবাস গো!'

'কে?'

'উপসী বাগদিনীব বেটা। আপনাদের কি মনসাগাছ এনে দেব মা, শুধোলে!'

বড় আচার্যানীর সর্ব-অঙ্গ জ্বলে গেল। কি অলক্ষণ কি অপয়া তাই দেখ! এখন ঠাকুরেব ভোগ দিতে যাবেন, এখনি বাগদীদের ছেলেটা মুখ দেখাল?

'এই এত বড় গাছ গো!'

চিনিবাস হাত দুটি তুলে দেখাল। রান্নাঘবের দোব দিয়ে গবম ভাতের গন্ধ আসছে। বামুন-মা ডালের হাঁড়িতে কতখানি করেই না ঘি ঢালে। দুধ দিয়ে সাদা ধপধপে লাউয়ের শুক্তো রাঁধে আব মূলো-বড়ি-নারকেলের ঘণ্ট। সব ঘি-চপচপে, সম্ববাব সুবাসে ম-ম। কতদিন চিনিবাস গরম ভাত খায়নি। কতদিন বামুনবাড়িতেও খায়নি।

'সে পরে বলব'খন, এখন বাড়ি যা।'

'বামুন-মা, রান্নাপুজো কবে গো?'

'সোমবার।'

'কচুশাক এনে দেব?'

'না বাপু তুই যা!'

এই ছেলে বামুন-মা বললে আচার্যানীর অঙ্গ জ্বলে। রূপসী বাগদিনীর মত গরীব এ পূর্বস্থলীতে কেউ নেই। খেতে পায় না, মাথার চুল জট বাঁধা, তবু রূপ মরে না ওর। ছেলেটাও চাঁদপানা। আচার্যানী ছেলে-ছেলে করে এত বার ব্রত পুজো কবে কালোজিরের মত কয়েকটি মেয়ে পেলেন বলেই না ছোট আচার্যানীকে আনলেন কর্তা!

'যেন চোখ দিয়ে গিলে খায়।'

আচার্যানী চোখ সরু করে দেখলেন চিনিবাস কোথায় দাঁড়িয়ে। উঠোনের কোণে ঐ আতাগাছটি হল লক্ষ্মণের গণ্ডী। বাগদী বল, জেলে বল, গেরস্ত সংসারে সকলেরই দরকার, তা, সবাই ঐ আতাগাছের ওপারে এসে কথা কয়ে কয়ে চলে যায়। চিনিবাস বুড়ো-আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

ছোট আচার্যানী ছেলে কোলে করে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে আবার টুপ করে ঘরে ঢুকে গেলেন। ছেলেটি বড় ভোগে। চিনিবাসের নজর লাগলে হয়তো আবার ভুগবে।

'ওরে এক পাই মুড়ি দেন গো!' ছোট আচার্যানী ঘর থেকে ডেকে বললেন। মুড়ি নিয়ে খুশি হয়ে চলে যা বাবা, আমার ছেলেটার দিকে তাকাস না। চিনিবাসের চোখ দুটো যেন সর্বদা খাই খাই। এত খিদে ওর কোত্থেকে আসে কে জানে!

'নে মুড়ি নিয়ে চলে যা'।

চিনিবাসের যে কি ভূত চাপল মাথায় কে জানে! ও হঠাৎ বড় আচার্যানীকে জিগ্যেস করে বসল, 'হ্যাঁ গো বামুন-মা, সোনার গৌরাঙ্গ এলে আমরা নাকি সকলের সঙ্গে এক দাওয়ায় বসে পেসাদ পাব?'

'কি বললি?'

বড় আচার্যানী এখন গলা তুলে চেঁচাতে শুরু করলেন। চেঁচামেচির মধ্যে অনেকখানি হল স্বামীর বিরুদ্ধে আক্ষেপ।

'আ গো, তিনি চাঁড়াল-বাগদী নিয়ে নাচতেছে, নাচুক গা! মনিষ্যি না দেবতা না তিনি কি বস্তু তা কি আমরা জানি? তিনি বান আনতেছে, বানের সঙ্গে ভেসে চলে যাবে গো! আমাদের এই গাঁয়ে জন্ম কাটাতে হবে। আমরা কেন নাচতে যাই?'

রূপসী বাগদীর বিরুদ্ধেও অনেক বিষোদ্গার ছিল। মেয়েটা মন্দ। ওর ছেলেটা মন্দ, গ্রামের কলঙ্ক একটা।

ছোট আচার্যানী তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল আর একখণ্ড মিশ্রী এনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণে অকারণে বড় আচার্যানী এইভাবেই চেঁচান। চেঁচাতে চেঁচাতে ওঁর মুখে থুথু উঠে যায়। তখন একখণ্ড মিশ্রী আর এক ঘটি জল খেলে উনি শান্ত হন।

চিনিবাস তো কোঁচড়ে মুড়ি কটা নিয়ে দৌড় দিল। ছুটতে ছুটতে শেষ অব্দি খালের ধারে পৌঁছে গেল। খালে জল টুবুটুবু। এত জলে মাছ ধরা যায় না। কিন্তু গেঁড়ি-গুগলি বিস্তর। চিনিবাসের দিদিমার বুঝি নারকেল পাতা চাঁছা হয়ে গিয়েছে তাই গুগলি তুলতে এসেছে। বুড়ি বসে থাকতে জানে না।

'গুগলি তুলে কি হবে আয়ী?'

চিনিবাস আশায়-আশায় জিগ্যেস করল। কবিরাজ মশায়ের শ্বশুরের চোখে ছানি পড়ছে। গুগলির ঝোল খেলে চোখ ভাল থাকে বলে কবিরাজ-গিন্নী মাঝে মাঝে বাবার জন্যে গুগলি রাখেন। কখনো চারটি চাল দেন, অথবা একটা কুমড়ো। দিদিমা নাতির কথা শুনে বললে, 'এমনি রে এমনি! কেউ নিলে তো নিলে। নইলে গুগলির শাঁস আর কচুশাক দিয়ে ঘণ্ট রাঁধব। তোকে মুড়ি কে দিলে? আচাজ্জি বউ?'

'হ্যাঁ।' চিনিবাস তাড়াতাড়ি মুড়ি গালে ফেলতে ব্যস্ত।

রূপসীর মা, চিনিবাসের দিদিমা এখন কার উদ্দেশ্যে যেন মুখ বাঁকা করে গাল দিল। বলল, 'তখন তো কত কথা, হ্যানো দেব, ত্যানো দেব, কাপড় দেব, সব্বস্ব ভার নেব এখন কি সব ভুলে গেল?'

'কে আয়ী ?

'তোর শত্তুর, তোর মায়ের শত্তুর!'

চিনিবাস দিদিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গুগলি তুলল, যতক্ষণ না হাত-পা জলে ভিজে ভিজে অসাড় হয়। তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে চিনিবাস বলল, 'এ বন্যে নয়, সেই বানের কথা বল আয়ী!'

'পেলয় বান!' বুড়ি তখনি মাথা নাড়লে।

'কি রকম ?'

'তোর মা তখন সোমত্ত মেয়ে। রূপে রঙ্গ ভেসে যায়। সকালবেলা থেকেই গুঁড়ো-গুঁড়ো বিষ্টি, যেন বাতাসে তুঁষ উড়তেছে। আর বাতাসের কি ডাক মা!'

'তা বাদে ?'

'বান আসতে আমরা সব যেয়ে বড় আচাজ্জির দালানে উঠলাম। কতজন গাছে চেপে রইল, কতজনা ভেসে গেল। মানুষ পোকামাকড়ের মত মরে দেখে বামুনরা সকলকে দালানে-উঠোনে ঠাঁই দিলে।'

'তা বাদে ?'

গল্পের এই জায়গাটি চিনিবাসের বড় প্রিয়। বারবার ও এই গল্পটা শুনতে পারে শুধু এই কথাগুলো শুনবে বলে। রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য সব কথা। বানের সময়ে মানুষরা সব দেবতা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, নইলে এমন কাণ্ড করবে কেন ?

'অন্ন বিনা প্রাণী মরে যায় দেখে, বামুনরা ধামা ধামা চিড়ে-মুড়ি-বাতাসা দিয়ে সব প্রাণ বাঁচালে মা! যারা রাঁধতে জায়গা পেলে তাদের চাল-ডাল দিলে।'

'আমর মা-কে ?'

'আগুকাপড় দিলে বামুনরা। পরনের কাপড় ত্যানা হয়ে যেয়েছিল।'

'তা বাদে ?'

'নতুন গোলঘরে (গোয়ালঘরে) মোদের ঠাঁই দিলে।'

'তা বাদে ?'

মাচা থেকে শুকনো কাঠ, চাল-ডাল-তেল-নুনের সিধে, আনাজপাতি, মাছ। জল নেমে গেলে, যে-যার ঘরে গেল কিন্তু রূপসী আর তার মা-র জন্যে বড় আচার্যের কি ভাবনা, কি ভাবনা! ওদের মত দুঃখী কে আছে? কে এমন গাঁয়ের একটেরেয় থাকে? কতদিন ধরে ওদের আগলে রাখলেন, তারপর নিজের মাহিন্দারের সঙ্গে রূপসীর বিয়ে দিলেন, বিয়ের পর বছর না পুরতে চিনিবাস হল। কিন্তু রূপসীর বরটা জ্বরে ভুগে মরে গেল।

'ও আয়ী, তা বাদে ?'

'তুই হতেও দয়া ছিল, মন ছিল। এখন যামন মুড়ি দিয়ে বিদেয় করে দেয় ত্যামন নিমায়া ছিল না।'

চিনিবাসের দিদিমা মাথা নেড়ে আরো কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। আর তখনি ওরা ঢাকের বোল শুনতে পেল। ঢোলমোহর দিয়ে বড় আচার্য সকলকে যেতে বলছেন ওঁর বাড়িতে। কীর্তন, ঠাকুর সেবা, প্রসাদ বিতরণ, আর গৌরাঙ্গ দর্শন হবে। সবাই যাবে। দিবাকর চক্রবর্তীর মত বামুন, চিনিবাসের মত বাগদী, সবাই।

বাবা গো! সত্যিই বামুনরা সবাইকে ডাকছে, সবাইকে খেতে দেবে? চিনিবাসের দিদিমা কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। এ বান-ও যে সেই গঙ্গার বানের মত মনে হচ্ছে? সবাই এক জায়গায় দাঁড়াবে বসবে, একসঙ্গে চিড়েমুড়ি ভাগ করে খাবে?

'চিড়েমুড়ি না রে আয়ী! ভাত হবে, পরমান্ন, ঘি সম্বরা ডাল, আর নারকেল ছাঁচিকুমড়োর বেন্নুন! গয়লাবউ খাসা দই পেতেছে, জানলি?'

'যা মা-কে যেয়ে বল্ গা, কাপড়-চোপড় যেন ক্ষারে সেদ্ধ করে। এট্টু তেল আনতে পারিস? মাথাটা যেন সন্ন্যাসীর জট মা! এমন মাথা নিয়ে যাব কেমন করে?'

চিনিবাস যেন হাওয়ার আগে উড়ে মা-কে খবর দিতে চলে গেল। রূপসী বারবার হাত যোড় করে কপালে ঠেকালে। একি একটা সোজা কথা? ওঃ, তিনি যদি তার চিনিবাসকে মাথায় হাত দেন, আর্শীবাদ করেন! তা হলে তো সবাই জানবে চিনিবাসও মানুষ; রূপসীও মানুষ। আরেকজন আছেন এ গাঁয়ে, অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে বেড়ান। রূপসীর খুব ইচ্ছে করে গৌরাঙ্গকে জিগ্যেস করে, কাউকে দিয়ে জিগ্যেস করায়, একটি অহঙ্কারী পুরুষের এক সন্তান বাগদী বলে চিরদিন গরীব হয়ে থাকবে, ঘরের ছেলেটির শত ভাগের এক ভাগও পাবে না, এ কেমন বিচার?

রূপসীর মনে হতে লাগল যেন গৌরাঙ্গ এসে গেছেন, যেন চিনিবাসকে বুকে টেনে নিয়েছেন। যেন যত দুঃখ, যত কষ্ট, সব ঘুচে গেছে রূপসীর।

কিন্তু গৌরাঙ্গ এলেন না।

শান্তিপুর-কাটোয়া হয়েই কুমারহট্টের পথ ধরতে হল। সন্ন্যাস নেবার ক'বছরের মধ্যে মানুষ যেন তাঁকে ঘিরে মৌমাছির মত জমতে থাকে। মানুষের মাথায়-মাথায় থই-থই। সবাই দেখতে চায়, সবাই একবার পা ছুঁতে চায়। কানা বলে আমায় ছুঁয়ে দাও, দিষ্টি হোক। খোঁড়া বলে পা-খানা ফিরে দাও ঠাকুর। কোলমরুনী ছেলে নিয়ে এসে পায়ে রাখতে চায়, ছেলে হয়ে বাঁচে না কেন তাই বলে দাও।

এমনি হাজার মানুষের হাজার বায়না। মানুষ শুধু আসতেই থাকল, আসতেই থাকল। অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ যাত্রায় উনি চিনিবাসের গ্রামের কাছাকাছিও আসতে পারলেন না।

মানুষরা আচার্যবাড়ির সামনে কতক্ষণ বসে রইল। শুধু তো গৌরাঙ্গদর্শন নয়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পেট ভরে খাবে বলে মা-ছেলে, বুড়োবুড়ি, কানা-খোঁড়া, অনাথ-আতুর সবাই এসে বসে রইল। আর তেমনি কি গুঁড়ি-গুঁড়ি বিষ্টি! আকাশকে কে যেন মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে 'জল ঢালো বাপু, তুমি মোটেই থেম না।'

ওই বিষ্টিতেই বান হয়, একটানা প্রহরের পর প্রহর ভিজতে ভিজতে কে যেন কাকে বললে। সবাই আশায় আশায় বসে রইল কোন-না-কোন সময়ে পেসাদ নিতে ডাক আসবে।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে মুড়ি-বাতাসার ধামা নিয়ে মাহিন্দাররা মানুষের ভিড়ে নেমে এল। চিনিবাসরা কেউ উঠোনে ওঠেনি বটে, কিন্তু মাহিন্দাররা মিষ্টি গলায় বললে, 'তিনি যদি আসত, তবে তোমরা উঠোনে উঠতে বাপ সকল, আমরা ডেকে এনে বসাতাম। তা, তিনি তো আসেনি, এখন আর উঠোনে উঠে জলকাদা করে কি হবে বল?'

'তা...মুড়ি বাতাসা দিচ্ছ কেন গো? পেসাদ পাব বলেছিলে না?'

'তিনি যদি আসত, তবে পেসাদ নিশ্চয় রান্না হত। ইদিকে কীত্তন হত, হতে হতে পেসাদ রান্না হত। তোমরা সবাই পেসাদ পেতে। যোগাড় ছিল, সরঞ্জাম ছিল, সবই ছিল গো! তা তিনি যখন এল না, তখন আর পেসাদ কেমন করে হয় বল?'

'কিন্তুক, আমরা খাব বলে আশা করে এসিছি গো!'

'এই দেখ! এয়েছিলে তো সন্নোসী দেখতে, খেতে এয়েছিলে?'

'হ্যাঁ গো।'

'নাও, তোমাদের সঙ্গে আমি বকতে পারিনি বাবু। ঠাকুব দর্শনের চেয়ে খাওয়াটা বড় হল? ঐ জন্যে তোমাদের দুস্কু ঘোচে না, জানলে বাছা? নাও, মুড়ি-বাতাসা নাও দিকি।'

কি রাঙা রাঙা মুড়ি, বড় বড় বাতাসা, কিন্তু চিনিবাসের চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। ও তো জানে, সকাল থেকে থোড়, মোচা, লাউ, শাক, দুধ, দই কত কি ভারে ভারে এসেছে। ভগবান জানেন কার জন্যে। এখন হঠাৎ চিনিবাসের ওর মা রূপসীর উপর রাগ হল।

'কেন এবার রান্নাপূজা করলি না রাক্কুসী? কেন, আমার পেট ভরে ভাত খেতে সাধ যায় না?'

মা-কে মেরে ধরে শেষ করে মুড়ি-বাতাসা ফেলে দিয়ে চিনিবাস পালিয়ে গেল।

অনেক, অনেকক্ষণ সময় গেল। সন্ধ্যের সময় চারিদিকে জোনাকি ফুটছে, ঘন অন্ধকার নেমে আসছে, চিনিবাসেব দিদিমা চিনিবাসকে খুঁজে পেল মাঠেব ধারে। জলে-ডোবা তালগাছটার ডগায় ও চুপ করে বসেছিল। কেঁদেকেটে অবসন্ন, ঘুম পাচ্ছে, ভূতেরও ভয় করছে।

'আয়ী আমার হাত ধর।'

দুজনে জল ছপছপ করতে করতে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে চিনিবাস বলল, 'গৌরাঙের বানেব চে' সে বান ভাল বে আয়ী! তেমন বান আর আসে না? সেই যে, যেমন বানে চিড়ে-মুড়ি-চাল দেয় এত? দুস্কু ঘুচে যায়? □

বিছন

কুরুডা ও হেসাডি গ্রামের উত্তরে জমি ঢেউখেলানো, একেবারে শুকনো রোদে জ্বলা। বৃষ্টির পরও এখানে ঘাস জন্মায় না। মাঝে মাঝে ফণীমনসার জঙ্গল ফণা তুলে থাকে, কয়েকটি নিমগাছ। এই দগ্ধ ও আন্দোলিত প্রান্তর, যেখানে মোষ চরতে দেখা যায় না, তারই মাঝামাঝি একটি ডোঙা-আকারের নাবাল জমি। জমিটি আধাবিঘা হবে। উঁচু পাড়ে উঠলে তবে জমিটি চোখে পড়ে এবং সবুজের সমারোহ দেখে ব্যাপারটি ভূতুড়ে লাগে।

আরো ভূতুড়ে লাগে, জমির মাঝে কাঠের খুঁটিব ওপর মাচা ও ছাউনি দেওয়া ঘর দেখে। এই জমিতে ঘর খুব অস্বস্তিকর। দর্শকের চোখে। কেননা এ রকম ঘর থাকে ফসল পাহারা দিতে। এ জমিতে শুধু আনারস গাছেব মত সকন্টক এলো গাছ। মোষেও খায় না। এলোর আঁশ থেকে পৃথিবীর অন্যত্র অত্যন্ত মজবুত দড়ি হয়। ভারতে এলো গাছ বুনো ঝোপ বলে গণ্য।

সব চেয়ে ভূতুড়ে দৃশ্যটি দেখা যায় সন্ধ্যার মুখে। কুরুডা গ্রামের দিক থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে একটি মানুষ এদিক পানে আসে। কাছে এলে দেখা যায় সে বুড়ো, চামড়া পাকানো-পাকানো, কোমরে কপ্‌নি, কোমর থেকে একটি কাঁথার বটুয়া ঝুলছে। হাতে ওর লাঠি থাকে ও এলো গাছের গায়ে এলোপাথাড়ি লাঠি মারতে মারতে ও মাচানের কাছে যায়। গাছের ডাল-কাটা, অত্যন্ত নড়বড়ে এক মই ধরে ও ওপরে ওঠে। চকমকি ঠুকে বিড়ি ধরায়, বসে থাকে মাচানে। প্রত্যহ। অন্ধকার ঘনালে কোনো এক সময়ে ও চাট্টি পেতে ঘুমিয়ে পড়ে প্রত্যহ।

প্রত্যহ কুরুডা গ্রামে দুলন গঞ্জুর বুড়ি স্ত্রী ওর উদ্দেশে গাল পাড়ে সে সময়ে। স্বাধিকারে। কেননা বুড়োর নাম দুলন গঞ্জু। এই গাল পাড়ার ব্যাপারটি ওর ছেলে-বউ-নাতি-নাতনীর পছন্দ নয়। কিন্তু কিছু করারও নেই ওদের। কিছু বললে বুড়ি ওদের গাল দেবে। আর ধাতুয়া কে মাইয়ার গাল দেবার, ঝগড়া করার ক্ষমতা তল্লাটে বিদিত। ঝগড়া কোঁদলে ওর দক্ষ ও পেশাদারী কোন্দল ক্ষমতাকে আহ্বান জানানো হয়। ও গিয়ে প্রতিপক্ষের ঊর্ধ্বস্তন সাতপুরুষের প্রথম পুরুষকে ধরে গাল দিতে শুরু করে। সাধারণত ও তৃতীয় পুরুষে পৌঁছলেই প্রতিপক্ষ রণে ভঙ্গ দেয়।

সবাই ওকে সমীহ করে। জরুরী অবস্থায় যখন তামাডিতে হাঙ্গামা বাধে, এ গ্রামেও পুলিস এসেছিল জিজ্ঞেসবাদ করতে। ধাতুয়ার মা পুলিসকে আগুন ছিটিয়ে গাল দিতে দিতে গ্রাম ছাড়িয়ে ছাড়ে। পুলিস যাদের খোঁজে এসেছিল তাদের একজন গোয়ালের মাচায় লুকিয়েছিল। ধাতুয়ার মা, 'আয়, সব ঘর দেখ, আয় মড়াখেকোরা' ব'লে এমন চেঁচায় যে চেঁচানিতেই প্রমাণ হয়, গ্রামটি একেবারে নিরাপদ।

তাতেও ক্ষান্ত হয় না ও, বলে, দেখ, এখন গ্রামে পাবি শুধু বুড়ো বুড়ি আর ছেলে। তাদের দেখবি? তাদের ধরবি?

পুলিস চলে গেলে পর ধাতুয়ার মা পলাতক ছেলেটিকে ধুইয়ে দেয় বাক্যবাণে, রোতোমি! চিরকাল তোর আড়বুঝো বুদ্ধি! একটা বুড়ি বকরির তোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে। সে রাজপুত মহাজনের পায়ে টাঙি মেরেছিস, বেশ করেছিস। গলায় মারলে পাপ বিদেয় হত। তা পালাবি তো বনে? জঙ্গলে পালিয়ে থাকবি তো? গ্রামে ফেরে কোন্ বোকাটা? যা বনে যা!

ধাতুয়ার ক্ষমতাও নেই, সে আর লাটুয়া মাকে বলে, বাপকে গাল পেড় না।

তাহলেই মা জ্বলে উঠবে। বুড়ো এখন ছেলেদের বড় ভালবাসার জন হয়েছে। মা বুড়ি বকরি, অকেজো। বাপের স্বরূপ জানবে ছেলেরা? মা জানে।

চার বছর বয়সে মায়ের বিয়ে হয়। চোদ্দয় পড়তে মা 'গওনা'য় ঘর করতে আসে। মা হাড়ে হাড়ে জানে ও বুড়োর স্বভাব। কাঁটাবুনো জমিব জমিদার যে রাজ্য পাহারা দেয় একা, তাকে সাপে কাটলে বা বাঘে খেলে বিধবা হবে কে? ধাতুয়া আর লাটুয়া? তাদের মুরোদ আছে, ওই অফলা জমি দেখিয়ে বছর বছর বিছন আনার? সরকারী সার এনে বেচে দেবার? পহানের হাল-ভঁৈষা দেখিয়ে বছর বছর হাল-বলদের টাকা বের করার?

ছেলেরা চুপ ক'রে যায়। মা ঘন ঘন হুঁকো টানে ও 'আমি না মবলে তোরা আমার দাম বুঝবি না,' এই মোক্ষম কথাটি ব'লে শুয়ে পড়ে। বউরা ফিসফিস ক'রে ছেলেদের বলে, যাক, একটা দিন কাটল।

মা অন্ধকাবকে উদ্দেশ ক'বে বলে, একদিন মরে থাকবে ওখানে। দেখতেও পাব না।

ছেলেরা জানে, এলো বন পাহারা দিতে মাচানে রাতে-থাকা ব্যাপারটি খুবই অবাস্তব, স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাবাকে ওরা স্বাভাবিক মানুষের হিসেবে ফেলে না। বাবা অত্যন্ত জটিল, অন্ধকার স্বভাবী, দুর্বোধ্য। গঞ্জুদের কাজ, মৃত পশুর চামড়া ছোলা। বাবা একবার, দুর্ধর্ষ রাজপুত মহাজন, দশটা বন্দুকেব মালিক লছমন সিংয়ের কয়েকটা মোষ মেরে ফেলে সেঁকো বিষ দিয়ে। লছমন সিংয়েব গ্রাম তামাড়িতে বসে। তারপব চামড়া ছুলে বেচে দিয়ে আসে। লছমন সিং স্বভাবতই নিজের শরিকী ভাই দৈতারি সিংকে সন্দেহ করে। ফলে যে গৃহযুদ্ধ লাগে, এখনো তা সম্পূর্ণ থামে নি।

তারপরেও বাবা টিকে আছে। তাতেই প্রমাণ হয়, বাবা অন্য মাপের মানুষ। বেঁচে থাকার কৌশল ভাবতে ভাবতে বাবা কোনোদিন ছেলে বা নাতির সঙ্গে কথা কইতে সময় পেল না।

মা-ও কম যায় না। মা'র হাড়পাকা শরীরে খাটবার ক্ষমতা এত বেশি, সাহস, জেদ, রাগ এত বেশি, যে মা-ও সাধারণ মাপের বাইরের মানুষ।

বাবা ও মাকে ওরা জীবনে বসে কথা কইতে দেখে নি। কিন্তু বাবা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, তখন মাকে ডেকে উঠোনে বসায়। হুঁকো ধরিয়ে দেয়, বলে, এ ধাতুয়াকে মা! একটা বুদ্ধি বাত্‌লা। তোর বুদ্ধি গ্রামে সবাই নেয়, পুলিস তোকে ভয় পায়।

—কি খচড়াই কথা ভাবছ? কাকে ধোঁকা দেবে না যখ্ দেবে?

মার কথায় চড়াসুর থাকে, ঝাঁজ থাকে না তখন। দুজনে নিচু গলায় সলা-পরামর্শ করে। এ রকম ঘটনা বছরে-দেড়বছরে একবার ঘটে।

অন্য সময়ে বাবা মায়ের সঙ্গেও কথা বলে না। মা বলে, এর চেয়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।

বাবা ধূর্ত হেসে আস্তে বাতাসকে বলে, হ্যাঁ। টুরা গ্রামে তোর বাবার মস্ত মকান।

মায়ের বাপ-মা-ভাই কেউ নেই। মা তা জানে। তবু বলে আর বাবাকে ধূর্ত হেসে টিপ্পনী কাটবার সুযোগ দেয়।

এররকম বাপ আর মা ধাতুয়া ও লাটুয়ার, কিছু করবার নেই। পাহাড়টা কেন পশ্চিমে, কুরুডা নদী কেন বয়ে চলে, তা নিয়েও কিছু করার নেই যেমন। শনিচরী বলে, তোর বাবা আর মা দুজনেই পাগলা। বাবা তোর পুরো পাগল। পাগল না হলে, যখন থেকে জমি পেল, পাহারা দিচ্ছে, অথচ ধান বোনে না?

কথায় বলে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। ও জমিটা পাওনা জমি, কিন্তু ওতে চোদ্দ পয়সার ফয়দাও ওঠার নয়।

জমিটি উক্ত লছমন সিংয়ের। বেশ কয়েক বছর আগে সর্বোদয় কর্মীরা অঞ্চলটিতে জমি মালিকদের দোরে দোরে ঘুরতে থাকেন। তাদের বেলাও শনিচরী বলত, বাবু জাতের পাগল এরা। জমি মালিকদের মনে এরা আফসোস আনবে। জমি মালিক আপনা হতে বলবে, ইশ! আমার এত জমি, আর এদের মোটে জমি নেই? তখন তারা জমি দিয়ে দেবে। যেদিন দেবে সেদিন আমি চৌকিতে বসব, মাট্‌ঠা মাখন খাবো, দুবেলা ভাত রাঁধব।

কিন্তু জমি মালিকরা তখন স্বশ্রেণীর জমি মালিকদের হুজিমত দেবার উদ্দেশ্যে নিষ্ফলা-পাথুরে-বন্ধ্যা জমি দিতে থাকল কিছু কিছু। পাঁচশো-সাতশো হাজার-দুহাজার বিঘা আবাদী জমি সকলেরই আছে। ধান-ভুট্টা-গম-মাড়োয়া-সর্ষে-অড়হর সবাই চাষ করে। চীনেবাদামের চাষ এখন খুব লাভজনক। কিছু অনাবাদী জমি দিয়ে দিলে এসে যায় না কিছু।

জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। জমি দেওয়া হল। সর্বোদয়ী নেতারা ও কর্মীরা ভারতভূমে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মুখ রইল। কুরুডা— বেলটের রাজপুত- কায়স্থ জোতদার-মহাজনরা কি জমি দিল না? তাহলে তাদের হৃদ-পরিবর্তন ঘটেছে? নিশ্চয়। ব্যস্। সর্বোদয়ী মিশন সার্থক। তারপরই তারা মধ্যপ্রদেশ ডাকাতদের হৃদ- পরিবর্তন ঘটাতে যান। জমিমালিক ও ডাকাত দু'শ্রেণীর হৃদয়ে অনুশোচনা না আসা পর্যন্ত তাদের মিশন সম্পূর্ণ হয় না।

জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। বাঁজা জমি বেরিয়ে গেল। গ্রহীতাদের কিনে রাখা গেল। সরকারের কাছে নিজেদের খুঁটি আরো শক্ত হল। শেষপাতে রসগোল্লার মত সর্বোপরি রইল নিজেকে করুণাময় জানার আনন্দ।

সে সময় দুলন গঞ্জু উক্ত জমিটি পায়। জমিটি সে নিতে চায়নি। কিন্তু লছমন সিংয়ের প্রতাপ অত্যন্ত বেশি। সে চোখ রাঙিয়ে বলল, একেই বলে ছোটলোক। আজ আমার মনে ভাল ভাব এসেছে দিচ্ছি। ব্যাটা কাল কি আর ভাল থাকব?

দুলন বলল— হুজুর মা-বাপ।

তবে? নাবাল জমি, বর্ষায় জল হুড়হুড়িয়ে নামে, যা চষবি তাই হবে।

বর্ষায় পাড়ধোয়া রাঙা জল নামে ও থিতোয়। কিন্তু চতুর্দিক যে বন্ধ্যা পাথর। সেই কাঁহা মুল্লুকে গিয়ে কে চষবে জমি? ফলনা জমি হলে লছমন সিং ফেলে রাখত? দুলন গিয়েছিল টাকা কর্জ করতে। জমি মালিক হয়ে ফিরে এল।

গ্রামের সবাই বলল— বড়লোকের বদখেয়াল! ঘিয়ের পরোটা খেয়ে খেয়ে ওর মাথা গরম হয়েছে। কাল ভুলে যাবে।

যদি না ভোলে?

আরে ফেলে রাখবে। আরা-ছাপরায় সর্বোদয়ীদের কথায় এমনি জমিই সব দিয়েছে। যারা নিয়েছে, তারা আবার মহাজনকে জমি বেচে দিয়েছে, বাঁধা দিয়েছে। তুমিও দেবে।

ও জমি নেবে কে? মহাজন তো নিজের নাম কিনছে, ওটা ঘাড় থেকে নামাচ্ছে।

দুলন আরো কথা বলত। পহান ওকে ভীষণ ধমক দিল। অনেক সমস্যা আছে ওদের। দুলনের ঘাড়ে ওই বিদঘুটে জমি চাপাবার সমস্যা তার কাছে কিছু নয়।

দুলন গজর গজর করল।

ওর বউ বলল, ওঃ! জমি থেকে ফয়দা ওঠাবে কি করে, তাই ভাবছে। মুখে কত নাকারা! কোনদিন কেউ হদিস পেল না ওর।

এই জমি থেকে ফয়দা?

শনিচরী পরদিন সব শুনেমেলে বলল— কেন? এ ধাতুয়াকে মাইয়া! জমি পেলে ধাতুয়ার বাপ চলে যাবে তোহরি! বিডিও আফিসে! জমি চাষের খরচ, বিছন স—ব দিবে সরকার!

একথা শুনে তবে দুলনের মুখে হাসি ফুটল। চোখ দুটি স্বপ্নে ধূসর হয়ে গেল ওর।

কোন কোন রূপকথায় গাই গাভীন না হয়েও দুধ দিয়ে চলে। দুলনের মত মানুষও বোঝেনি, আফলা জমিটি কিভাবে তার সংসার চালনায় সাহায্যে আসবে।

জমি একদিন দলিল-পত্তর হয়ে তার হাতে এল। গঞ্জুপাড়ায় দুটি টানা ঘর একই দালানের কোলে, সেই ঘরেই বাস, রান্নাবান্না, সব। এই ওর পৃথিবী। দালানের একপাশে আগড় দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ঘুমোয়। এ হেন নিঃসম্বলে লোক কোমরভাঙা হয়। চারদিকে ওর রাজপুত জোতদার ও মহাজন টাহাড়ের হনুমান মিশ্র ব্রাহ্মণ। তিনি এ অঞ্চলের বিশেষ প্রভাবী মানুষ। এ হেন জায়গায় বাস ক'রে, সর্বদা উচ্চ বর্ণের শাসনে থেকে, দুলনের কোমর ভেঙে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু বাঁচবার তাগিদে ও, জোর খাটিয়ে নয়, ফিচলেমি করে সর্বদা প্রতি পরিস্থিতি থেকে ফায়দা তুলে নেয়। বলে নয়, কৌশলে ও ছলে ওকে প্রবল সব প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে চলতে হয় বলে ঘাঁৎ-ঘোঁৎ ওর নখদর্পণে।

ধাতুয়ার মা বলল, খুব বড় জমি, খুব ফল্না জমি, ফসল রাখতে গোলা করতে বল বাপকে, অ ধাতুয়া। লাটুয়া রে, তেরা বাপ জমিদার বন্ গেইল, জমিদার!

এ সব কথা বলল বটে, কিন্তু গ্রামের লোকেরা এবং ও, দু-দলই অপেক্ষা করতে থাকল দুলন কি করে তা দেখার জন্যে।

দুলনের একক এবং সুকৌশলী লড়াই গ্রামের লোকেরা খুব তারিফের চোখে দেখে।

লছমন সিংয়ের মোষের মামলা সবাই জানত, কেউ ব'লে দেয়নি। দৈতারি সিংয়ের বাড়িতে একটা কুমড়ো বেচে ও একবার দৈতারির বউ, একবার দৈতারির মার কাছে দাম নেয়। লছমন সিংয়ের বাড়ি থেকে যখন ছট্ পরবের কলা-মুলো-সবজি-ফল গরুর গাড়িতে চাপিয়ে কুরুণ্ডা নদীর পারে আনা হয়, ও পাশে গিয়ে নিজেই সঙ্গে হাঁটে ও কাল্পনিক পাখি তাড়ায় চেঁচিয়ে এবং সমানে কিছু কিছু সরায়। গ্রামের লোককে ও জীবনেও কিছু দেয় না। তবু গ্রামবাসী ওকে খাতির করে। ওরা যা পারে না, ও তা পারে।

জমি পেতেই দুলন লছমন সিংয়ের হাঁটু ছুঁয়ে বলল, মালিক পরোয়ার! জমি দিলে তো চাষ করি কি করে? বি. ডি. আপিস থেকে কিছু পাব না। আহাহা, অমন জমি, পেয়েও কাজে লাগবে না।

কেন? বি. ডি. অফিস তোকে সব দেবে।

না হুজুর। ছোট জাত।

ছোট জাত তো একশোবার। মনে থাকে না তোদের, তাতেই জুতো-লাথি খাস। সে তো আছিসই। কিন্তু আমি যাকে জমি দিচ্ছি, তাকে মদত দেবে না? কে বি. ডি. বাবু?

কায়স্থ হুজুর। বলে রাজপুতরা গাঁওয়ার, মূর্খ। খুব রেডিও শোনে আর বাঁ হাতে ধরে জল খায়, চা খায়।

রাম রাম! ছি ছি ছি।

দেখে এলাম হুজুর।

আমি লিখে দিচ্ছি।

লছমন সিং লেখাপড়ায় মহাপণ্ডিত। ভকিল রাখে ও। ভকিল দুলনের হাল বলদ কেনার দফা-দফা ঋণ, সার ও বিছন পাবার ন্যায্যতা বিষয়ে কায়েথী হিন্দিতে অত্যন্ত জবরদস্ত এক আর্জি লিখে দিল। বি. ডি. ও. তোহরিতে থাকতে পারেন,— তোহরি, লছমনের গ্রাম তামাডি থেকে দূরেও বটে, কিন্তু তাঁর ধড়ে মাথা একটি। লছমনের সঙ্গে ও হনুমান মিশ্রের সঙ্গে কোন ঠোকাঠুকি না করতে তাঁকে বলেছেন স্বয়ং এস. ডি. ও.।

তখনি তিনি মেনে নিলেন সব। নেংটি পরা দুলনকে অত্যন্ত নরম গলায় বোঝালেন, বিছন দুলন পাবে, সারও পাবে। হাল-বলদের টাকা একবারে পাবে না। খানিক টাকা বায়না করে হাল বলদ এনে দেখাতে পারলে বাকি টাকা পাবে।

দুলন গ্রামে এসে পহানকে বলল, সরকার কানুন করে, কিন্তু বুঝে না কিছু। হাল-বলদ লোকে টাকা দিয়ে কেনে। দফায় দফায় টাকা নিয়ে বেচে কে? তোমার হাল বলদ দাও।

সেই হাল বলদ দেখিয়ে দুলন টাকা নিয়েছে। এক বছর অন্তর অন্তর। যেবার টাকা নেয়, সেবারই বলে মরে গেল হুজুর।

টাকা নেয়। সার নিয়ে তোহরিতেই বেচে দিয়ে আসে। বিছনের বোরা কাঁধে বয়ে আনে।

বিছন ও খায়।

বিছনের ধান সিজিয়ে চাল করা চারটিখানি কথা নয়। তাই করে ও। প্রথমবারই বউ বলেছিল, এত বিছন! কত জমি তোমার?

সে জমি মাপলে মাপা যায় না।

সে কি?

আমাদের পেট। খিদের কি মাপ হয়? পেটের জমিন বাড়তে থাকে! হুই আঁদলা জমিতে যেয়ে ধান বুনব? পাগল তুই?

কি করবে?

সিজা, ভান, খাব।

বিছন খেয়ে মরবে?

এততে মরলাম না। আকালে ইঁদুর খেলাম কত? বিছন খেয়ে মরব? মরলে জানব, ধানের ভাত খেয়ে মরেছি। স্বর্গে যাব।

একবার বিছনের ভাত খেতেই ধাতুয়ার মা বুঝল, এর চেয়ে মিষ্টি জিনিস সে জীবনে খায়নি।

সুখাদ্যটির কথা সে গ্রামে সগর্বে বলে বেড়াল। কে এমন সধবা আছে গ্রামে, যে বলতে পারে তার মরদ কত বুদ্ধি ধরে, কত কৌশলে গোর্‌মেনকে বোকা বানিয়ে বিছনের ধানের ভাত খাওয়ায় পরিবারকে?

গ্রামের সবাই খুব খুশি হল। গোর্‌মেন্ তাদের কোনদিন কোন দেখভাল করে না। গোর্‌মেনের বি. ডি. ও. তাদের কোনকালে চাষে মদত দেয় না। গোর্‌মেনের বুনিয়াদী স্কুলে তাদের ছেলেরা কখনো ঢুকতে পায় না। লছমন সিং বা দৈতারি সিং ওদেব দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পেট-ভাতায় বা চার আনা রোজে ফসল কাটিয়ে নেয়। এ নিয়ে যথেষ্ট টেন্‌শন চলছে। কেননা পাশের ব্লকের গঞ্জু-দুসাদ-ধোবিরা লাথ ও ভাত দুই পাচ্ছে আট আনা রোজ। পঁচিশ পয়সা বাড়াবার জন্যে গ্রামবাসীরা খুব আগ্রহী। সব জেনেও হাঙ্গামা বাধলে এস.ডি. ও. পুলিস নিয়ে এসে কিষাণদেরই ধরে নিয়ে যান। লছমন সিং বা দৈতারিকে কিছু বলেন না।

গোর্‌মেন্ লছমন সিংয়ের। গোর্‌মেন লছমন সিং দৈতারি সিং হনুমান মিশ্রের। এ হেন গোর্‌মেনকে বোকা বানায় যে, সে যদি দুলন গঞ্জু হয়, তাহলে তাকে গ্রামের লোকে তারিফ করবে বইকি।

জমিটি কামধেনুর মত দুলনকে বছরে শ'ছয়েক টাকা দিতে থাকল। কিন্তু তখনো দুলন ঘরেই ঘুমোত। দাওয়ার কোণে, মাচানে, ধাতুয়ার মার পাশে। ধাতুয়ার মার কাশি ও হাঁপানি আছে। মাচানের নিচে রামছাগল বেঁধে রেখে ঘুমোয়। দুটো ঘরে দু' ছেলে। বউ ছেলেপুলে নিয়ে। গম-মাড়োয়া-ভুট্টার বোরা, হাঁড়ি-কলসি, জ্বালানি কাঠ, সবই দুই ঘরে। ও জমির আয়ে সব সময়টা চলে না। তখন বাপ ও দুই ছেলে জন খাটে বনে যায় মেটে আলুর খোঁজে, তোহরি গিয়ে মাল টানে। মিশ্রজীর ফলবাগিচায় যায়। সবার মত।

এরই মধ্যে চলে এল তামাডির করণ দুসাদ। বহোৎ শানদার আদমি। লছমনের খেতে মজুরি খাটত। মালিক পরোয়ারের সঙ্গে মজুরির লড়াই করকে য়ো জেহেল চলা গিয়া। জেলে, হাজারীবাগ জেলে ও বিহারের আরো আরো বন্দীদের সঙ্গ পায়।

তারা ওকে "দুসাদ" বলে ঘেন্না করে নি। সম্মান করেছে লড়াকু বলে। অবাক হয়ে জেনেছে, কোন সংগঠনের মদতে নয়, অসাগর শোষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওরা দুশো কিষাণ, দুর্ধর্ষ লছমন সিংয়ের পাকা গম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারা ওকে বোঝায়, এইভাবে লড়াই

গড়ে ওঠাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। লড়াইয়ের প্রয়োজনে লড়াই গঠন। সেজন্যে নিজের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে লড়াই করা।

যারা বলে, তারা নির্যাতিত হত, মাঝে মাঝে অনশন করত। তখন কর্তৃপক্ষ তাদের পেটাত। মেরে-মেরে মেরে ফেলত কতজনকে। তবু, তারপরেও ওরা করণকে বলত লড়াকু, ঠিক কাজ করেছ তুমি, কখনো লড়তে ভুল না।

ফলে করণ দুসাদের মনের স্তরে প্রচুর ভাঙচুর হয়। যে করণ, লছমন সিং অবস্থা মরিয়া ক'রে তুললে তবে লড়াইয়ের কথা ভেবেছিল সেই করণ, বেরিয়ে আসার পর সকলকে বলল, লড়াইয়ের পরিস্থিতি আজও আছে। ও অবস্থা সঙিন করবে, তখন রুখে দাঁড়াব, তখন গুলি খাব, তখন জেলে যাব কেন? আগে থেকেই জোট বাঁধব। সব বলে কয়ে নেব ওর সঙ্গে। ফসল কাটার সময়ে পুলিসকে থাকতে বলব। আমাদের দাবি তো খুব সামান্য। আমরা হরিজন আর আদিবাসী। এই জংলা জায়গায় আমরা ভাল মজুরি পাব না। আট আনার লড়াইটাই করব। মেয়ে-মরদ-ছোট ছেলেমেয়ে সকলকে আট আনা ক'রে দাও। চার আনা ও দিচ্ছে। বাড়তি চার আনার জন্যে এ আমাদের "পঁচিশ পয়সার লড়াই।"

খবরটি শুনেই দুলন করণকে কুরুডায় ডাকে। সন্দেহী মন ওর। কথা বলে লোকজন থেকে দূরে ওর সেই জমির পাড়ে বসে। করণ দুসাদ বয়সে প্রৌঢ়, রোগা, ছোটখাট মানুষ। হাজারীবাগে বন্দীদের সঙ্গে দু বছর থাকার ফলে নতুন-অর্জিত ব্যক্তিত্ব তার।

জাত-পাঁত সব ঝুটা। বরামভন ঔর বড়া আদমি কো বনা হুয়া যো ছুতাছুত।

এ কথা ব'লেই ও দুলনকে ঘাবড়ে দেয়। দুলন মনে মনে পলকের জন্যে ঘাবড়ায়। তারপর, ঘাগু লোক তো! বলে, ও তো লিখাই-পড়াই বাবুরা বলেই থাকে। এখন কাজের কথা শোন। ও লছমন সিং আর বি.ডি. ও. আর এস. ডি. ও. আর দারোগা চার গেলাসের ইয়ার। আগে তুই তোহরির আদিবাসী দফতর আর হরিজন সেবা সঙ্ঘে যা। ওদের জানিয়ে রাখ। ওরাও তোর সঙ্গে থানা-এস. ডি. ও. করুক।

কেন? আমরা কি কমজোরী?

বহোৎ কমজোরী করণ। ভুল করিস না। সরকারী সবাই লছমনকে মদৎ দেবে। সে বন্দুক ফুটালে দেখবে না, তোরা লাঠি উঠালে ধরবে। হরিজন সেবা সঙ্ঘে মদনলালজী আছে। সাচাই আদমি। সবাই চেনে। সঙ্গে রাখ।

করণ কথাটি মানে। মদনলালের ভোটের পুল বেজায় জোরদার। অতএব এস. ডি. ও. এবং দারোগা আগে লছমনের সঙ্গে গোপন বৈঠক সারেন। পরে মদনলালের কথায় রাজী হন।

অত্যন্ত নির্বিঘ্নে ভুট্টা কাটা ও তোলা হল। আট আনা মজুরি মেলে। করণ দুসাদ হিরো বনে যায়। রূপকথা সত্যি হয়।

তারপর লছমন হঠাৎ দুলনকে বলে, কাল জমিতে থাকবি। কেউ যদি জানে আমি এ কথা বলেছি, লাশ ফেলে দেব তোর।

উক্ত কাল যখন রাত পোহালে আজ হয় সেদিন এস.ডি. ও. যান রাঁচি, দারোগা যান ডাকাত ধরতে সুদূর পুরুডিহা।

বিকেল না ফুরোতে, অস্ত রবির রশ্মি আভায় লছমন সিং অন্যান্য রাজপুত জ্ঞাতিভাইদের নিয়ে তামাডির দুসাদ পাড়া আক্রমণ করে।

আগুন জ্বলে, মানুষ পোড়ে, ঘর ভাঙে।

রাতে দুলনের সামনে নবোদিত চন্দ্রমা এক অপার্থিব, নীরব চলচ্চিত্র মেলে ধরে। ঘোড়ার পিঠে লছমন সিং। দুটি ঘোড়া পাশাপাশি রেখে, পিঠে মাচান ফেলে একাধিক লাশ। দশ জন অনুচর লছমনের।

করণ ও তার নির্বিরোধী ভাই বুলাকির লাশ, লছমনের বন্দুকের নির্দেশে দুলন জমিতে পোঁতে। সভয়ে, মাথা নিচু ক'রে কোদালে কুপিয়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে। লছমন পাড়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করে ও পান চিবোয়। তারপর বলে, একটা কথা বলবি তো কুত্তা, করণ দুসাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। শিয়াল লাকড়াকে বিশ্বাস নেই, লাশ উঠাবে। কালই এখানে মাচা বাঁধবি। রাতে থাকবি। করণ যে আগুন জ্বালিয়েছে, আমি রাজপুতের বাচ্চা, এখন থেকে লাশ পড়বে। দুলন মাথা নাড়ে। বেঁচে থাকার তাগিদে ও বলে, তাই হবে।

পরদিন পুলিস আসে। খুবই হইচই হয়। শেষে জানা যায়, ঘটনাকালে করণ ছিল না ওখানে রিপোর্টাররা কিছুতেই ''এ ট্রু হরিজন স্টোরি'' লিখতে সক্ষম হন না। লছমনের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলে না। অগ্নিসংযোগের জন্যে লছমনের এক অনুচরের কিছুদিন জেল হয়। সরকার থেকে গৃহহারা পরিবারগুলির গৃহনির্মাণে যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য আসে।

সেই থেকে দুলন জমিতে থাকে। প্রথমে এটি খ্যাপামি বলে গণ্য হয় ও ছেলেরা ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে। কোনো কথাই, এই স্টেজে দুলনের কানে যায় না। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলে ও রক্ত চোখে চেয়ে থাকে ঠোঁট এঁটে। তারপর মাথা নেড়ে হাতের খেঁটে তুলে বলে, বাত না উঠাস ধাতুয়া! মাথা ভেঙে দেব তোর।

বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে ওর মনের স্তরে ধস্ নামে, স্তরবদল ঘটে যায়। সোজা, এত সোজা সব লছমনদের কাছে? দুলন জানত, মানুষের জন্য যেমন বহু আচারে-নিয়মে জড়িত, মৃত্যুও তাই। কিন্তু লছমন সিং এই সব প্রাচীন ও সম্মানী রীতিনীতি কত নগণ্য, তাই প্রমাণ ক'রে দিল। কত সোজা! ঘোড়ার পিঠে দুটি লাশ, এবং নিশ্চয় তামাডির নাকের ডগা দিয়ে অসীম ঔদ্ধত্যে লাশ আনা হয়। লছমন জানে, লাশ আনার ব্যাপার লুকোবার দরকার নেই। যারা দেখল, তারা কিছুই বলবে না। তারা লছমনের নীরব ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরোয়ানা পড়েছে, যো মু খোলে গা, য়ো ভি লাশ বনে গা। এরকম আগেও ঘটেছে। আবারও ঘটবে। আকাশে আগুন ও আর্ত মরণোন্মুখদের চীৎকার ছুঁড়ে দিয়ে মাঝে মাঝে হরিজন বা অছুতদের বুঝিয়ে দিতে হয় সরকারী কানুন—অফিসার নিয়োগ ও সংবিধানে ঘোষণা কিছু নয়। রাজপুত রাজপুতই থাকে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকে, দুসাদ-চামারা-গঞ্জু-ধোবি, এরা থাকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-রাজপুত-ভুঁইহার-কুর্মিদের নিচে। রাজপুত বা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা ভুঁইহার বা যাদব বা কুর্মি, স্থানবিশেষে হরিজনদের মতই, হরিজনদের চেয়েও গরীব হতে পারে। কিন্তু জাতের কারণে তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয় না। খাণ্ডবকানন দহনে কিছু অরণ্যবাসী ব্রাত্য কৃষ্ণাঙ্গকে ভক্ষণ থেকে অগ্নিদেব অছুত নরমাংসে আজও আসক্ত।

সমগ্র ব্যাপারটি দুলনের মনে বিপর্যয় ঘটায়। এর আগে ওর ছিল সারফেস্ ধূর্তামি।

টিকে থাকার জন্য! এখন ওকে মনের নিচে দুটি শবদেহ লুকিয়ে রাখতে হয়। শবদেহগুলি মনের নিচে পচতে থাকে। জমিতে মাটির নিচে প্রোথিত করণ ও বুলাকি মাংসের ওজন হারিয়ে ক্রমে নির্ভার হয়। দুলনের মনোজগতে মৃতদেহের ওজন বাড়ে। দুলনের চেহারা বিবর্ণ হয়, মুখের কথা আরো কমে। কাউকে বলতে পারে না ও। গুরুভার বহন করছে নিয়ত। বেঁধে মার খেতে হয়। মুখ খুললে কুরুডার দুসাদপট্টিতেও আগুন জ্বলবে, বাতাসে ছাই উড়বে, পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ।

ক্রমে দিন যায়। করণ ও বুলাকি, দুটি মানুষ যে নিখোঁজ হয়ে গেল, তা সবাই বাধ্য হয়ে ভুলে যায়। তোহরি থেকে এদিকে বরুডিহা, ওদিকে ফুলঝর অবধি রেলপথ বসে। আদিবাসী ও হরিজন বিষয়ে অত্যাচার ঘটলে সে বিষয়ে তখনি তদন্ত ও ব্যবস্থা করার জন্য, কেস তৈরি ক'রে আদালতে পেশ করার জন্য থানা ও এস. ডি. ও.-কে অঞ্চল বুঝে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ঢাই গ্রামে পঞ্চায়েতী কুয়ো খোঁড়া হয়। ঢাই নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী গ্রাম। অঞ্চলটি এইভাবে আধুনিক সময়ের কাছে আসতে চেষ্টা করে খোঁড়া পায়ে।

ফলে লছমন সিংহের প্রতাপ আরো বাড়ে। সরকারি নির্দেশ উড়িয়ে দিয়ে সে খেতমজদুরদের চল্লিশ পয়সা মজুরি দেয়, হনুমান মিশ্রের মন্দিরে শিবের মাথার সোনার গোখরো সাপ গড়িয়ে দেয়। বি.ডি.ও. কে স্কুটার, দারোগাকে ট্রানজিস্টার কিনে দেয় এবং করণ ও বুলাকির নিজস্ব দেড় বিঘা জমি পুরনো ঋণের দায়ে দখল করে।

এ ব্যবস্থায় সবাই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু সহসা খেতমজদুর বিষয়ে সরকারী সার্কুলার আসে এবং আসেন জনৈক নতুন এস. ডি. ও.। ইনি বামপন্থী ব'লে অভিযুক্ত এবং এঁকে অন্তিম বাঁশ দিয়ে সাস্‌পেন্‌ড করাই যেহেতু প্রশাসনের শুভেচ্ছা, সেহেতু এঁকে ফসল কাটার দেড় মাস আগে তোহরিতে বদলী করা হয়।

তোহরি অঞ্চলটির কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী হরিজন ও আদিবাসী। জমি মালিক জোতদার ও মহাজন উচ্চবর্ণ। অঞ্চলটির বিশেষ সমস্যা হল মালিক বিষয়ে ক্ষেতমজদুরদের গভীর অবিশ্বাস। সেই কারণেই কৃষিতে প্রার্থিত উন্নতি ঘটছে না এবং মাথাপিছু আয় বাড়ছে না। আয়-ব্যয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা সমাজচেতনা সবই থেকে যাচ্ছে সাব-নর্মাল স্তরে। এখানে প্রয়োজন আলোকপ্রাপ্ত, দরদী, মানবিক হৃদয় অফিসার।

এস. ডি. ও. বোঝেন, এভাবে তাঁকে বাম্বু দেওয়া হল। তিনি শ্বশুরকে বলেন, আপনার জিত হল। ব্যাঙ্কের কাজটা দেখুন। এগ্রো-ইকনমিক্‌সের ছাত্র, পেয়ে যেতে পারি। নইলে যেখানে পাঠাচ্ছে, সেখানে থাকলে আপনার একমাত্র মেয়ে বিধবা হবেই হবে।

বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে আসেন বলেই এস. ডি. ও. অত্যুৎসাহে খেতমজদুরদের জানান, তোমরা পাঁচ টাকা আশি পয়সা মজুরি পাবার অধিকারী। উক্ত মর্মে তিনি জোতদারদেরও জানান। লছমন সিংয়ের জমি-ফসল ও খেতমজদুর, সুবিস্তৃত তামাড়ি-বুরুডিহা-কুরুড়া-হেসাড়ি-চামা-চাই সকল গ্রামে। বুরুডিহার গ্রাম-মোড়লের ছেলে, আসরফি মাহাতো বলে, করণের কথা মনে আছে। তিন বছরেও ভুলি নাই। কিন্তু এস. ডি. ও. এখন ভাল লোক। তবে কেন মোরা চল্লিশ পয়সা পেট-ভাতায় ফসল কাটি? পাঁচ টাকা আশি পয়সা! পেটভাতা চাই না, পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সা দিয়ে পুরা মজুরি দিক।

একদা করণকে যেমন, আজ আসরফিকেও তেমনি যত্নে বোঝায় দুলন। বলে, করণ চেঁচাল বিস্তর। তাতে তামাডির দুসাদপট্টি জ্বলে গেল।

করণ কোথা? বুলাকি কোথা?

কে জানে?

বেঁচে নাই।

এ কথা বলিস কেন?

মেরে জঙ্গলে গাড়ায় ফেলে দিয়েছে।

জানি না। তবে হাকিম সামনে রেখে কাজ করিস।

করব।

হাকিম যেন পরের মদতটা দেয়। সেবার মজুরি দিল। পরে আগুন জ্বালাল।

বলব।

প্রতি অঞ্চলের প্রতি সংঘর্ষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্যাটার্নিস্টিক। লছমন সিং বলে, অত দেব না। দু টাকা নাও, জল খাই।

মজুরি দিন হুজুর পরোয়ার।

দেব?

লছমন সিংয়ের চোখ অত্যন্ত নরম ও দরদী হয়ে উঠল। সে বলল, ভেবে দেখি! তোমরাও ভাব। দেওয়াটা যে উচিত, তা তো গাধাতেও বোঝে। তবে কি জান? তুমি তো এস. ডি. ও.-র কথা বলছ? তাঁকে বোল, এ তল্লাটে মখখন সিং, দৈতারি সিং, রামলগন সিং, হুজুরী প্রসাদ মাহাতো কেউ দিচ্ছে না। আমি একা মার খাব? আসরফি ভীরু অথচ জেদী হেসে বলল, মার খাবেন হুজুর? গম পেষাই কল আপনার, আপনার মকান কত দূর থেকে দেখা যায়, আপনি মার খাবেন?

হাসিটিকে লছমন সিং ধরে নিল উদ্ধত তাচ্ছিল্য বলে এবং বলল যে দু'টাকার কথা বললাম ত আমরা বলে-কয়ে নিয়েছি। জমি রেখে আমরা সরকারের কাছে চোরদায়ে ধরা পড়েছি যেন। তোমাদের যার যেটুকু জমি আছে, সরকারী মদত পাও। আমার জমি দিয়েছি দুলনকে। ও হারামী চাষ করে না, অথচ বছর বছর বিছন নেয়। জানবর! বিছন খায়। সে খাক্ গে। আমরা কোন মদত পাই, সার-বিছন-ফসলের পোকামারা ওষুধ, সব কিনতে হয়। আমার কথা এস. ডি. ও. কে বোল।

দুলনকে আসরফি বলে—সাবধান! ও হারামী জানে চাচা, যে তুমি জমি চষ না, ফসল উঠাও না।

দুলনের মনে শবদেহের ভার আরো ভারি হয়। লছমন সিং তাকে বলেছে ও জমিতে বিছন ফেলে বছর কয়েক চাষ করিস না দুলন।

দুলন অত্যন্ত দুঃখে আসরফির জন্যে আন্তরিক উদ্বেগে বলে, উসিকো বিশোয়াস মৎ যাইও বেটা। তোহার বাবা হামানি কো ধাতুয়া-লাটুয়াকো জনম-কাম কি থ।

—নায় চাচা।

আসরফি যথেষ্ট ঘুরচক্কর মারতে থাকে এস. ডি. ও. এবং লছমনের মাঝখানে। দুলন

আরোই বিষণ্ণ হয় ও কোন দুর্যোগ আশঙ্কা করে ছেলেদের খিঁচিয়ে বলে ছোটলোকের ছেলে ছোটলোকই থেকে যায়। জমি ভাঙিয়ে বুড়ো বাপ যা আনছে তাই খাচ্ছে। অন্য কোন ছেলে হলে কাছাকাছি কোন কলিয়ারিতেও চলে যেত। কেন মাটি কামড়ে পড়ে আছিস?

ধাতুয়া ভাসা ভাসা শান্ত চোখ তুলে সবিস্ময়ে বলে, এবার আমরা ডবল মজুরি পাচ্ছি বাবা।

দুলন আর কিছু বলে না। তোহরি চলে যায়, ব্লক আপিসে, বলে —এবার ফসল তুলে রবি দেব। মদত চাই।

বি. ডি. ও. সম্ভবত যে জমি চষা হবে না তার জন্যে বিছন দিয়ে চলার অকাট্য কারণ জেনেছেন। তিনিও এই চক্রান্তে লছমন ও দুলনের দলে চলে আসেন ও দেঁতো হেসে বলেন, দেখব।

দুলন দেখে ওঁর বাড়িতে সুউচ্চ গাছ। এত উঁচু পেঁপে গাছ দেখা যায় না।

সে বলে, য়ো পাপিতা গাছ এত্তা উঁচা কৈসে হইল? হাঁ বাবু?

বি.ডি. ও. গভীর আত্মপ্রসাদে হাসেন। বলেন, ও জায়গাটা পরে আপিসের কম্পাউণ্ডে পেয়েছি। গরমের সময়ে পাগলা কুকুর মেরে ওখানে গর্তে ফেলত। পচা হাড় মাংসের সার পেয়েছে, বড় হবে না গাছ?

—সে সার ভাল?

—খুব ভাল। মুসলমান গরিব লোকের কাঁচা গোরের উপর ফুল গাছ কেমন ঝাঁপালো হয়?

কথাগুলি দুলনের মনে শবদেহ-ভার কিঞ্চিৎ লঘু করে। গ্রামে ফিরে দুলন ভরদুপুরে জমি দেখতে যায়। হ্যাঁ সত্যিই তো। করণ ও বুলাকি তাহলে ঐ পুটুস ঝোপ ও এলো গাছগুলি! চোখ ফেটে জল আসে ওর। করণ, তুই মরেও মরলি না। কিন্তু পুটুস গাছ, এলো গাছ তো কারো কাজে লাগে না, মোষ-ছাগলে খায় না। আমাদের হক নিয়ে লড়তে গেলি। গম হয়ে, ভুট্টা হয়ে রইলি না কেন? নিদেন পক্ষে চীনা ঘাস? চীনা ঘাসের দানা সিজিয়ে ঘাটো রেঁধে খেতাম।

সুগভীর দুঃখে ও তামাডিতে গেল ও লছমন সিংয়ের সবজি বাগানে কেউ নেই দেখে মাঠের দিকের বেড়া ও তার উপড়ে ফেলে দিল। হর্-হর্-হর্ শব্দ করে কয়েকটি মোষকে ঢুকিয়ে দিল খেতে। তারপর ঘুর পথে এসে সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকে লছমন সিংকে বলল, মালিক পরোয়ার। এক খৎ লিখ দিয়া যায়। হাসপাতালে ভর্তি হব। খাঁসি আর বুকে ব্যথা।

—ফসল কাটা হয়ে গেলে খৎ দেব।

—বহোৎ আচ্ছা জী পরোয়ার।

আবার দুলনের বুকে শবদেহ গুরুভার হল। নিজের মনের অতলকে চিন্তার খন্তায় খুঁড়তে খুঁড়তে ফিরল। করণ ও বুলাকিকে সরে জায়গা ছেড়ে দিতে বলল।

—ফসল কাটা হয়ে গেল! তবে করণ ও বুলাকির সেথো হয়ে আসছে কেউ?

ধান কাটা চলছে চলছে। বহু বিতর্কের পর আড়াই টাকা রোজ ও জলখাই। ঘোড়ায় চড়ে স্বয়ং লছমন তদারক করছে। পুলিস আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়িয়ে দেখে গেল শান্তিপূর্ণভাবে ধান কাটা হচ্ছে। সাতদিনের দিন মজুরি মিলল সবাকার।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এস. ডি. ও. পুলিস নিয়ে ফিরে গেলেন।

আট দিনের দিন ঝড় উঠল। বাইরের মজুর নিয়ে ধান কাটাচ্ছে লছমন সিং। আসরফি ও অন্যরা বিপন্ন, ভয়ে ও জেদে রুক্ষ।

—এ আপনি করতে পারেন না।

—কে বলে পারি না? পারছি তো। কুত্তার বাচ্চারা দেখে নে পারছি।

—কিন্তু—

—দিয়েছি ফসল কাটতে, দিয়েছি মজুরি! বাস্— খেল খতম!

মারমুখী আসরফিদের দেখে বাইরের মজুররা কাস্তে নামায় ও এক জায়গায় জড়ো হয়। গুলির শব্দ। বাইরের মজুররা পালাচ্ছে, পালাল।

গুলির শব্দ।

গুলিতে কটা লাশ পড়েছিল তার হিসেব নেই। দুলনদের হিসেবে এগারোটি। লছমন সিং ও পুলিসের হিসেবে সাতটি। আসরফির বাপ একবারে নিস্পুত্র হল। দু ছেলে, মোহর ও আসরফি নিখোঁজ। খোঁজ মিলল নো চামা গ্রামের বহুবন কৈরি ও বুরুডিহার পারশ ধোবির। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। এস. ডি. ও. আসতে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে নিহত ও নিখোঁজদের বাপ মা-বউ-ছেলেমেয়ে। এস. ডি.ও-র মুখে পাথর পাথর কাঠিন্য। লছমন সিংয়ের নামে পুলিস কেস করবেন বলে গ্রামবাসীদের কথা দিচ্ছেন। রিপোর্টারদের সব বলছেন, ঘুরে দেখাচ্ছেন। ওয়ারেন্ট বের করে না আনা পর্যন্ত লছমন সিং ইজ নট টু লীভ হোম।

এবং জ্যোৎস্না রাতে, হিমেল বাতাসে মধুময় পরিবেশে লছমন সিং আসে। এ অঞ্চলের সবই প্যাটার্নিস্টিক, এবং মহত্তম পশু চতুষ্পদ ঘোড়া, চারটি ঘোড়া চারটি লাশ আনে। এবার দুলনের সঙ্গে লছমনের অনুচররাও হাত লাগায়। গভীর গভীর গর্ত দরকার। জমি বর্ষার জলে ও শরতের হিমে সরস। চারটি লাশ পড়ে ঝপাঝপ। দুলনের অন্তরে গুরুভার গুরুতরো হয়।

আরো আজীব মানুষ হয়ে যায় দুলন। বি. ডি. আপিস থেকে ঝগড়া করে আরো বেশি বিছন আনে। হাল-বলদের টাকা। তারপর এক মাস যেতে না যেতে কয়েকটি এলো গাছকে দেখে সান্ত্বনা পায়। অনেক সতেজ, অনেক সবুজ কয়েকটি এলো ও পুটুস গাছ ভারতের জরুরী অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব বিহারের অনাদৃত অঞ্চলে খেতমজদুর কাম হরিজন হত্যার নীরব দলিল হয়ে প্রত্যহের সূর্যের প্রণাম নেয়। লছমন বেকসুর খালাস পায়। জরুরী অবস্থা। এস. ডি. ও. ডিমোটেড হন মালিক-ক্ষেতমজদুর এর শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে উস্কানি দিয়ে খেতমজদুরদের প্ররোচনা দেবার জন্য। লছমন ও অন্যান্য জোতদার-মহাজন হনুমান মিশ্রের মন্দিরে বর্বর ধুমধামে পূজো দেয়, রুপোর বিল্বপত্র একশো আটটি এবং ঘোষণা করে, যে টাকা-টাকা মজুরিতে, বিনা জলখাই, ফসল কাটাবে, সেই কুত্তার বাচ্চা ও কুত্তীর বাচ্চি যেন আসে। অন্যথায় বাইরের কিষাণ আসবে। জরুরী অবস্থায় সর্বত্র হাহাকার। কাংগ্রেসী মস্তান লোগ বাইরের কিষাণ আনার ঠিকাদারী নিয়েছে। এবার খেলা আরো দুরন্ত মজার। প্রত্যেকের মজুরি থেকে উক্ত ঠিকাদারকে চার আনা দিন দিন দিতে হবে। ঠিকাদারের লোক

হও বা না হও। উক্ত মস্তানরা কথা দিয়েছে, বন্দুক হাতে ওরা ফসল কাটিয়ে নেবে এবং যে ট্যাঁ-ফোঁ করবে, তার চামড়ায় পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে এ অঞ্চলে বদমায়েশি চিরতরে ঘোচাবে।

দুলন মনে গুরুভার নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এবং ধাতুয়া-লাটুয়ার মুখের দিকে চেয়ে ভাবে ছেলেদের নিয়ে পালাবে না কি? কোথায় যাবে? মাতৃভূমি দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে কোথায় দুলন গঞ্জু নিরাপদ?

কোথায় বহিরাগত লছমন সিং নেই?

হোলির দিনে ও কান পেতে গানও শোনে না। কিন্তু হঠাৎ হোলির উল্লাস থেমে যায় কোনো আশ্চর্য গান শুনে। মৌয়ামাতাল ধাতুয়া টুইলা বাজিয়ে চোখ বুজে গাইছে:

কোথা গেল করণ?
বুলাকি কোথায়?
কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন?
তারা পুলিশের খাতায় হারিয়ে গেছে।
কোথায় আসরফি হাজাম?
তার ভাই মোহর?
মহুবন আর পারশ কোথায়?
কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন?
তারা পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে।
করণ লড়েছিল পঁচিশ পয়সার লড়াই
আসরফি লড়েছিল পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সার লড়াই
বুলাকি আর মোহর
দাদাদের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল।
মহুবন জানত নেশা ধরানো মৌয়া বানাতে
পারশ জানত হোলির দিনে নাচতে,
ওরা সবাই পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।'

গান শেষ হল। সবাই নিশ্চুপ। হোলির রং খাক্ হয়ে গেল, হোলির নেশা কেটে গেল। দুলন উঠে দাঁড়াল।

—কে এই গান বাঁধল?

—বাবা, আমি।

দুলান হোহো করে কেঁদে উঠল। বলল, ভুলে যা ও গান। তুইও খোয়ে যাবি পুলিসের খাতায়।

দুলন চলে এল ওর জমিতে। নেমে গেল জমির মাঝখানে। অসম্ভব ফিস্‌ফিসে গলায় বলল, তোরা গান বনে গেলি। শুনতে পাচ্ছিস? গান বনে গেলি। আমার ছেলে ধাতুয়ার বাঁধা গান বনে গেলি। গান ব'নে গেলি, গান ব'নে গেলি, ধান বনলি না, বনলি না চীনা ঘাস—এখন আমার কলিজা হতে নেমে যা রে, আমি আর পারি না!

দোল পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় এলোগাছের সতেজ পাতা ও পুটুস ফুলের গুচ্ছ হেসে লুটোপুটি খেল। এমন হাসির কথা ওরা কখনো শোনে নি। দুলনের বুকের নিচে ধাতুয়ার জন্যে অজানা ভয়। মাচানে উঠতেই ও ধাতুয়ার গানটি শুনতে পেল। এখন সবাই গাইছে। কিন্তু পুলিসের খাতায় হারিয়ে যায় নি ওরা। দুলন কোনোদিন সব কথা বলতে পারবে না। লছমন সিংয়ের থাবা।

একদিন জরুরী অবস্থার অবসান হয়।

একদিন ভারতের মুক্তিসূর্য মজা দেখতে গদি ছেড়ে নিচে নামেন ও কিছুকাল দম নিয়ে পুনর্বার গদিতে ওঠার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করেন। একদিন আবার লছমনের ফসল পাকে।

দু'বছর অকাল-খরা-শস্যহানির পর এ বছর ধান ঢেলে দেয় মাটি। আদিগন্ত ধানখেতে মাচান বসে সার সার। পাখ-পাখালি রাতেদিনে পাকা ধানে এসে পড়ছে।

দু'বছর আগে যে ছিল কাংগ্রেসীএবং মাস্তান এবং খেতমজুর যোগাবার ঠিকাদার—সেই এবার নাম থেকে ''কাংগ্রেসী ও মস্তান'' ডক্টরেট দুটি বাদ দিয়ে ক্ষেতমজদুর যোগাবার ঠিকাদার হয়ে দেখা দেয়। তার সঙ্গে তারই মত টেরিক্লথশোভিত, কালো চশমা পরিহিত বন্দুক-উঁচানো সঙ্গী চতুষ্টয়। অমিতাভ বাচ্চনের গলায় এই মার্সেনারি লছমনকে বলে আপনাদের দিন খতম এখন। স্ট্রাইক ভাঙা, খেতমজদুর যোগান দেওয়া ও ফসল কাটানো, সবই পেশাদারদের হাতে চলে এসেছে। সাউথ-ইস্টার্ন বিহারে আমি মার্সেনারি সার্ভিস দিই। আপনি না চাইলেও আমিই দেব। পাঁচ হাজার টাকা। আগাম।

—পাঁচ হাজার?

—তা হলে সরকারী মজুরি দিন।

—না না।

—সরকারী মজুরী না দিয়ে নাফা করবেন আশি হাজার। পাঁচ হাজার দেবেন না?

—দেব।

—ব্যস্। গ্রামের নাম মজদুরদের নাম দিন। কোই হাংগামা উঠানেবালা হ্যায়?

—না।

—ঠিক আছে। আমাকে মখ্খন সিং আর রামলগন সিংকেও সার্ভিস দিতে হবে। ঠিক সময়ে চলে আসব আমি। আর হাঁ ওদের মজুরি দেবেন পাঁচ সিকা। আমার বাট্টা চার আনা।

—টাকা-টাকা।

—পাঁচ সিকা। আমি, অমরনাথ মিশ্র, বেশি কথা বলি না।

—টাহাড়ের মিশ্রজীর আপনি কে লাগেন?

—ভাতিজা। আমার সার্ভিসের প্রথম ক্যাপিটাল চাচাজীই দিয়েছেন। এইভাবে সব কথা হয়ে যায়। পরে হনুমান মিশ্র লছমন সিংকে বলেন, হাঁ হাঁ, আমারই ভাতিজা। ছেলেদের সারফেস কলিয়ারি কিনে দিলাম, বললাম তোকেও দিই? না, ও নাখারা কাম ও করবে না। খুব এলেমদার ছেলে। ওর সার্ভিস ইলেকশনের ক্যাণ্ডিডেট নেয় হরতালী কারখানার মালিক নয়। সারফেস কলিয়ারিতে লেবার যোগায় ও। খুব এলেমদার! তিনটে বিয়ে করেছে।

তিন টাউনে তিনজনকে রেখেছে। সকলকে মকান্ ক'রে দিয়েছে। আগেকার সরকারে ওর খুব কদর ছিল। আমার একটা ছেলেও ওর মত এলেমদার হল না।

লছমন সিং খুব বর্বর রাজপুত। স্বরাজ্যে সঞ্জয়। কিন্তু লছমনও বোঝে, ভাড়াটে মার্সেনারি যখন নিজের সার্ভিস চাপিয়ে দেয়, তখন তাকেও মেনে নিতে হবে। না দিলে লছমন, মখখন ও রামলগনের কাছে বোকা বনবে।

ধান কাটা শুরু হয়। বাইরের মজুর নয়, নিজেরাই কাটছে ধাতুয়ারা। পাঁচ সিকা রোজের ওপর জলখাই মকাইয়ের ছাতু-লঙ্কা-লবণ। ধাতুয়ার মা দুই ছেলের জন্যে বুনো করমচার আচার দিয়ে দেয় সঙ্গে।

দুলন মাচানে বসে থাকে। বসে থাকে কিসের প্রতীক্ষায়। ধানকাটা চলছে, চলছে। গান গেয়ে ধান কাটছে মেয়েরা, দূর থেকে ওদের গান একঘেয়ে ঘুমপাড়ানী গানের মত শোনায়। কিন্তু দুলনের ঘুম আসে না।

'কে কেড়ে নিয়েছে দুলনের ঘুম?

ঘুম পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে।'

ধাতুয়া ও লাটুয়া ফেরা অব্দি দুলন বাড়িতে থাকে। তারপর আসে জমিতে। বৃষ্টিতে পাড়ধোয়া জল পেয়ে শরতের হিমে ভিজে সরস মাটিতে এলো গাছগুলি বন্য ও উদ্ধত। পুটুস ফুলে গাছ ফেটে পড়ছে। দুলনের চোখে ঘুম আসে না।

প্রত্যাশিত গণ্ডগোল বাধে মজুরি মেটাবার দিনে। অমরনাথ সেদিন তার বাট্টা দাবি করে। লছমন বলে, কোন খুনজখম করবে না। আমার সঙ্গে বাট্টা কেটে নেবার কথা নেই। ওদের সঙ্গে ফয়সালা কর।

—কতজনের সঙ্গে? অমরনাথ হায়নার মত হাসে, আপনি দিয়ে দিন।

সব চেয়ে রুখে ওঠে ধাতুয়া, দুলনের ছেলে। সেইজন্যই লছমন সিং বাট্টার ব্যাপারে ঢুকতে চায় না। ও অছুতকে বন্দুক তুলে জব্দ করতে জানে শুধু। এই একজনকে ও গুলি করতে চায় না। দুলন ওর কাছে প্রয়োজনীয়।

অমরনাথ বলে, কুত্তাদের সঙ্গে আমি বলব কথা? পাঁচশো লোকের পাঁচ সিকা থেকে রোজ এক সিকে হিসাবে পনের দিনে হয় আঠার শো পঁচাত্তর টাকা। দিয়ে দিন।

—না হুজুর! আমরা দেব না। ধাতুয়া চেঁচিয়ে ওঠে। লছমন নিশ্বাস ফেলে। আবার প্যাটার্নিস্টিক হতে হবে ওকে। আবার বন্দুক তুলতে হবে। করণ যায়, আসরফি আসে, আসরফি গেল, ধাতুয়া।

—পনেরো দিনের পনেরো টাকা নিয়ে ঘরে যাব? আঠারো টাকা বারো আনা পাব না? সে কথা হয়নি? দিন তো বেশি টানিনি আমরা?

—ধাতুয়া বুঝে কথা বলিস।

টাকা দেয় অমরনাথকে লছমন সিং। তারপর বলে, কথা বলিস না ধাতুয়া। চলে যা।

করণ ছিল দাবি জানাবার লোক, আসরফি ছিল রুক্ষ। ধাতুয়া কোনদিন জানে নি ওদের মজুরি কেটে অমরনাথকে বাট্টা দেবার ব্যাপারে ও এরকম জেদের সঙ্গে দাবি জানাতে পারবে। বেরিয়ে এসে ও বলে, তোরা যা। আমি ফয়সালা করে তবে আসব।

আবার ও লছমন সিংয়ের সামনে আসে। বলে, ঐ পঁচিশ পয়সার হিসাব চুকিয়ে না দিলে আমরা কাল থেকে ধান কাটব না। ভাল খেতগুলো বাকি আছে। নিজেরা কাটব না আর কাউকে কাটতে দেব না।

—পুলিস তার বাট্টা নিতে এসেছে বলে এখন বেঁচে গেলি ধাতুয়া।

—পুলিসকে আপনি ডরান ?

ধাতুয়া চলে যায় কিন্তু ওর শেষ কথাটি লছমনকে জ্বালিয়ে রেখে যায়। তবু ধাতুয়া দুলনের ছেলে বলে এবং দুলন লছমনের অত্যন্ত গোপন করবার মতো কাজের সহায়ক বলে লছমন একটা দিন ছোটলোকেদের সময় দেয়।

পরদিন সবাই আসে এবং কেউ কাজ করে না। লছমন ব্যর্থ ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। মার্সেনিদের পাওয়া যাবে না। তারা মখ্‌খন সিং ও রামলগন সিংয়ের কাছে মদত দিতে গেছে। নিমেষে বাইরের লেবার মেলাও সহজ নয়। বিকেলের আলো ঢলে পড়তে লছমন তার সঙ্গীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। তরসালে কাজ হয় যদি, গোলিও মৎ চালাও। পাকা ধানের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চড়ে লছমনের অনুচররা যায়। চম্বলের দস্যুদলের সিনেমা দেখে দেখে ওরাও পরে খাকি সবুজ য়ুনিফর্ম। ওরা এগিয়ে আসে। এরা উঠে দাঁড়ায় এবং অপেক্ষা করে।

—কুত্তার বাচ্চারা কুত্তীর বাচ্চিরা শোন।

—তু হো কুত্তাকে বাচ্চা !

কে চেঁচিয়ে বলে। ওরা বন্দুক তোলে। এরা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ঢুকে পড়ে খেতে। ধানের আড়ালে অদেখা হয়। কিছুক্ষণ চলে কথার মিসাইল। তারপর অনিবার্য গুলি। একাধিক। ধান খাওয়া ছেড়ে পাখির ঝাঁক আকাশে ওড়ে। খেতের ভেতর হয় কার গলায় রক্ত গার্গলের শব্দ। চেনা শব্দ।

তারপর ঘোড়ার পায়ে বসে যায় বসতে থাকে ধারাল কাস্তে ও হেঁসো ঘোড়া ছোটে সওয়ার নিয়ে। ওরা বেরিয়ে ছুটে পালায়। লাটুয়া ও পরম ছোটে তোহরির দিকে।

ভীষণ, ভীষণ কষ্টকর অপেক্ষা করে দুলন। সন্ধে পেরিয়ে রাত করে আসে লাটুয়া।

—ধাতুয়া কোথায় ?

—আমি তো দেখিনি। আসেনি দাদা ? আমি তো থানায় গেলাম।

—ধাতুয়া কোথায় ?

—পুলিস নিয়ে এলাম আমরা। পুলিস এখানেও আসবে। সেই এস. ডি. ও. বাবা। সে আবার এসেছে। ও ভি আয়েগা।

—ধাতুয়া !

দুলনের অন্তরে অন্তরে শবদেহগুলি নড়ছে কেন ? কাকে জায়গা করে দিচ্ছে ? কাকে ? দুলন সব বোঝে ও উঠে দাঁড়ায়।

—কোথায় যাও ?

জমিতে।

—ছেলেটা এল না, তুমি, তুমি, তুমি কি পাগল না পিশাচ ?

—চুপ কর হারামজাদী।

দুলন বেরোয়, ছুটতে থাকে। ধাতুয়ার গান, ধাতুয়ার গান,

'কোথায় গেল করণ?

বুলাকি কোথায়?

তারা পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে।'

ভাসা-ভাসা চোখ। হাতে জরুল। তু মৎ খো যাইও ধাতুয়া, মৎ খো যাইও। এলো গাছ, পুটুস গাছ, তোমরা হেসো না আজ রাতে।

ধাতুয়া আছে, ধাতুয়া আছে।

লছমন সিং। একটি লোক। লোকটির মুখ চোখ রক্তাক্ত। লছমন তাকে মারছে। লাথি মারে। লোকটি পড়ে যায়।

ওরা দুজন, ঘোড়া তিনটে।

লছমন ওর দিকে তাকায়। কাছে আসে, বলে,

—দুলন?

—ধাতুয়া?

—আফসোস, আফসোস দুলন, মানা কী তো য়ে জানবর গোলি চালায়।

লছমন আবার লোকটাকে লাথি মারে। বলে,গোলি চলানেবালা মস্তান!

—ধাতুয়া?

—জমিনে।

—কৌন ডালা?

—ওহি জানবর।

—ও?

—হ্যাঁ কিন্তু জবান্ খুলবি না দুলন। তোর বউ, বেটা, বেটার বউ, নাতি কেউ থাকবে না। ঔর, ঔর টাকা নিয়ে যাবি। পুলিস ডেকেছে তোর ছেলে। পুলিসকে আমি জরুর কিনে নেব। কিন্তু জানিস, তোর ছেলে বলেই লাটুয়াকে ছেড়ে দিয়েছি। আমার বন্দুকের একটা গুলিও তো আজ খরচ করি নি। লাটুয়াকে একটা গুলিতে ফেলে দিতে পারতাম। দিই নি।

ওরা চলে যায়। সাতটি শব নিয়ে দুলন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পড়ে যায় পাড়ে। গড়িয়ে পড়ে জমিতে। বন্য ও হিংস্র এলো পাতার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে-হতে, গড়াতে-গড়াতে থামে এক সময়ে।

যথারীতি এবারকার তদন্ত শেষ হয় না। এস. ডি. ও. হস্তক্ষেপ করেন। গোলি চালানেবালা মস্তান ও অমরনাথ জেলে যায়।

ধাতুয়া আর ফেরে না।

দুলন শুধু ভাবে আর ভাবে। অবশেষে পাগল হবার সিদ্ধান্তই নেয় ও। কেন না বৈশাখী বৃষ্টি পেতেই জমি থেকে এলো ও পুটস নিশ্চিহ্ন করতে থাকে।

—কোথায় গেল? ভর দুপুরে? শুধোয় ওর বউ। লাটুয়ার বউ বলে, কাস্তে আর খন্তা নিয়ে জমিতে গেল শ্বশুর।

—মানা করলি না?

আমি কথা বলি?

ছুটে যায় বউ শোকতাপ ভুলে। পাড়ে উঠে চেঁচায়, হ্যাঁ তুমি পাগল হলে? ওহ জঙ্গল সাফ করতে নেমেছ?

—ঘর যা।

—ঘর যাব কি?

—ঘর যা।

—বউ কাঁদতে কাঁদতে পহানের কাছে যায়। পহান চলে আসে। বলে, ধাতুয়া আসবে দুলন। পাগলামি করিস না ছেলের শোকে। তাত লাগবে।

দুলন বলে, ঘর যাও পহান। তোমার ছেলে নিখোঁজ হয়েছে, না আমার?

—তোর।

—এ জমি তোমার, না আমার?

—তোর।

—তবে? পাগল হলে হয়েছি, না হলে না হয়েছি। শালার জমিকে দেখছি আমি।

—লাটুয়াকে ডেকে নে তবে।

—না আমি একা সব করব।

চাষ-কাজ ও করে না, কিন্তু করলে ওর হাত খুবই ভাল, তা মনে পড়ে পহানের। পহান দুলনের বউকে বলে, চল ঘরে চল। যা মনে নেয় করুক ও। তোকে তো তোহরি যেতে হবে।

দুলনের বউ লাটুয়ার সঙ্গে বার বার তোহরি যায় ও থানায় ধাতুয়ার বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়।

কয়েকদিন জঙ্গল সাফ করে দুলন। জমি তৈরি করে। তারপর বিছন এনে বলে, এ বিছনে ভাত হবে না জমিতে রুইব।

—ওই জমিতে!

—হ্যাঁ।

বিছন ছেটাতে ছেটাতে দুলন মন্ত্রের মত বলে চলে, তোমাদের এলো আর পুটুস করে রাখব না। ধান বনিয়ে দিব। ধাতুয়া? ধান বনিয়ে দিব।

চারা যখন ওঠে, সবাই দল বেঁধে দেখতে আসে। কোথায় লাগে লছমন, মখ্খন আর রামলগনের সারালো মাটির চারা। এ চারাগুলি যেমন সতেজ, তেমনি পুষ্ট।

—পোড়ো জমি, নতুন চারা। সবাই বলে। দুলন অত্যন্ত বিরক্ত হয়। সকলকে তাড়িয়ে দেয়। ও একা চষবে, একা রুইবে, একা চারার সবুজ লাবণ্য দেখবে।

পহান বলে, লছমন সিং দেখলে হিংসেয় মরে যেত।

—কে? দুলন নিস্পৃহ।

—লছমন সিং।

—কোথায় সে?

—গয়া গিয়ে বসে আছে। শ্বশুরালে।

—ও!

তারপর ধানগাছ বড় হয়। উঁচু, সুপুষ্ট, সতেজ গাছ। ঝেঁপে ধান হয়। ধান পাকে। এবার দুলনের চূড়ান্ত পাগলামি প্রকাশ পায়।

ও বলে, ধান কাটব না।

—কাটবে না? এই বর্ষা গেল, কত কষ্টে পাড় কেটে জমা জল বের করলে, রাতেদিনে ওখানে রইলে, ঘর থেকে ঘাটো আর জল বয়ে বয়ে আমি মরলাম, ধান কাটবে না?

—না। আর তোরাও কেউ জমিনে আসবি না। আমার কাজ আছে।

—কি কাজ? বসে থাকা?

—হ্যাঁ, বসে থাকা।

যে জন্যে বসে থাকা তা হল। ফসল কাটার সময়ে লছমন ফিরল। দুলনের ধান চাষের কথা ওর কানে গেল। ধাতুয়ার খুনের পরে এক বছর কেটেছে। আবর লছমন আত্মস্থ।

লছমন দুলনের কাছে এল। দুলন জানত, ও আসবে। দুলন জানত।

—দুলন!

—মালিক পরোয়ার?

—উঠে আয় এখানে।

—এ কি, আপনি একা?

—বাজে কথা রাখ। এ কি?

—কি?

—জমিনে ধান কেন?

—চাষ করেছি।

—কি কথা ছিল?

—আপনি বলুন।

—কুত্তার বাচ্চা, জমিনে তুমি ধান চাষ করবে সেই কথা ছিল? বনঝোপ থাকবে...

দুলন নিচে, লছমন ঘোড়ার পিঠে। দুলন লছমনের পা ধরে হঠাৎ ভীষণ জোরে টানল। পড়ে গেল লছমন। বন্দুক ছিটকে গেল। দুলনের হাতে বন্দুক। লছমন কিছু বোঝার আগেই ওর মাথায় বন্দুকের বাঁট পড়ল। লছমন চেঁচিয়ে উঠল। দুলন বন্দুকের বাঁট কলার বোনে মারল। খটাস শব্দ।

—কুত্তার বাচ্চা, জানবর... লছমন সভয়ে দেখল দুলনের সামনে ও কাঁদছে। ওর চোখে যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে জল। সে, লছমন সিং মাটিতে, দুলন গঞ্জু দাঁড়িয়ে? দুলনকে পা চেপে ধরতে গেল, ও ককিয়ে উঠল। দুলন ওর হাতে পাথর মেরেছে। লছমন বুঝল, ডান হাত বহুদিনের মত অকেজো হল।

—জানবর! কুত্তা!

—কি কথা ছিল মালিক? চাষ করব না। কেন করব না? তুমি লাশ পুঁতবে, আমি হব লাশের জিম্মাদার। কেন হবে? নইলে তুমি গ্রাম জ্বালাবে, আমাকে নির্বংশ করবে।

খুব ভাল। কিন্তু মালিক সাত-সাতটা ছেলে। শুধু বন-ঝোপ-কাঁটাগাছ হবে তাদের গোরে? তাই ধান বুনেছি, জান? সবাই বলে পাগল, আমি পাগলই হয়েছি। আজ আর তোমায় যেতে দিব না মালিক, আর ফসল কাটাতে দিব না। গুলি চালাতে, ঘর জ্বালাতে, মানুষ জ্বালাতে আর দিব না। অনেক ফসল কাটলে তুমি।

তোকে পুলিস ছেড়ে দেবে?

না দিলে না দিবে। তোমার লোকজন? তারাও হয়তো মারবে। মারে নি কবে মালিক? পুলিস বা কবে মারে নি? আবার মারলে এবার মরতে হলে মরব। একবার তো সবাই মরে। ধাতুয়া কি আগে মরেছিল?

এ সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় জেনে লছমনের মনে মৃত্যুভয় হল। মৃত্যুভয় হলেও রাজপুত কখনো দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে অন্ত্যজ জাতির কাছে নত হতে পারে না। যদি পারত, তবুও অন্ত্যজ জাতি রাজপুতকে সব সময়ে প্রাণদান করতে পারে না। দুলন পারল না।

লছমন উঠতে গেল সর্বশক্তিতে, চেঁচাতে গেল, বাঁ হাতে পাথর নিতে গেল, দুলন বলল, কা আফসোস মালিক! গঞ্জুর হাতে মরলে!

পাথর দিয়ে ছেঁচতে থাকল ও লছমনের মাথা। ছেঁচে চলল। লছমন হত্যায় অভ্যস্ত, গুলির দাম জানে, হত্যা ওর ভেতরকে বিচলিত করে না। ও হলে এক গুলিতে দুলনকে মারত।

দুলন হত্যায় অভ্যস্ত নয়, পাথরের কোনো দাম নেই, এই হত্যা ওর দীর্ঘদিনের অন্তঃসংগ্রামের পরিণাম! ও পাথর ছেঁচে চলল।

এক সময়ে আর পাথর ছেঁচার দরকার থাকল না। উঠে দাঁড়াল দুলন। একে একে কাজ সারতে হবে। ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে পাছায় লাঠি মেরে ও ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। যেখানে ইচ্ছে যাক। তারপর বন্দুক সমেত লছমনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে বহুদূর গেল। একটি খানায় ফেলল ওকে। তারপর পাথরের পর পাথর গড়াতে থাকল। পাথরের পর পাথর। ভেতর থেকে হাসি উঠে আসছে। ঘৃণ্য ওঁরাও-মুণ্ডা হয়ে গেলে মালিক পরোয়ার? পাথরে চাপা পড়লে? পাথরের সমাধি হল?

পাথুরে পাড়ে কাঁকরমাটিতে কোনো দাগ থাকার কথা নয়। কিন্তু পাড়ের পুটুস গাছের সপত্র ডাল ভেঙে ও ধস্তাধস্তির জায়গাটি ঝাড়ু দিল। তারপর মাচানে উঠল।

লছমনের খোঁজ কয়েকদিন ধরে চলে। যেহেতু সে কারো সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিত না, সেহেতু সে দুলনের কাছে আসার কথা কারুকেই বলেনি। না বলাই স্বাভাবিক, কেননা দুলনের ওপর ও যেজন্য নির্ভর করত, তা গোপন রাখার ব্যাপার। ওর শাগরেদদের যারা যারা জানত, তারাও চেপে গেল। মালিক পরোয়ার স্বয়ং যখন নিখোঁজ, ঘোড়া যখন দৈতারির ধানখেতে চরছিল, তখন খুঁচিয়ে ঘা করে লাভ কি? লছমনের চাকর বলল, রোজকার মত দুধ-মিছরি খেয়ে ঘোড়ায় বেড়াতে গেলেন। কোথায় গেলেন, কি করে বলব?

খুবই অবাক কাণ্ড, হায়েনাদের চেঁচামেচি শুনে তবে লোকজনের টনক নড়ে। সেও পাঁচ দিন বাদে। পাঁচ দিন ধরে মাংসাশী পশুগুলি পাথরের ফাঁকে মাংসের গন্ধ পেয়ে চেঁচিয়েছে ও অশেষ চেষ্টায় কিছু পাথর সরিয়ে ওরা মুখটি শুধু খেতে পেরেছে। মৃতদেহ লুকোবার

কৌশলী ধূর্তামি+ধান খেতে ঘোড়া ইত্যাদি কারণে দৈতারি সিংয়ের ওপর সন্দেহ বর্তায়। লছমনের ছেলে তাতে মদত দেয় এবং প্রচীন দ্বন্দ্বের ইতিহাস থাকার ফলে দৈতারি কিছুদিন নাজেহাল হয়। প্রমাণাভাবে পুলিস ভঙ্গ দেয় এবং দৈতারি ও লছমন-পুত্র প্রাচীন বিবাদের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলে। কোন পর্যায়েই দুলনে সন্দেহ বর্তায় না। বর্তানো স্বাভাবিক নয়। কোন অবস্থাতেই দুলন লছমনকে মারবে, তা ভাবা যায় না।

ওদিকে লছমনকে নিয়ে খোঁজ তল্লাস চলতে থাকে, এদিকে মাচান থেকে নেমে আসে এক প্রসন্ন, নতুন দুলন। পহানকে কি বলে সে, ফলে একদিন বিকেলে পহানেব আঙিনায় কুরুডার সবাই সমবেত হয়। দুলন বলে, কোনদিন কিছু দিই নাই হাতে তুলে কারুকে।

সকলে বিস্মিত হয়।

দুলন বলে, আমার ধান দেখে তোমরা সবে ভাল বললে। সেই ধান কাটলাম না, সবে বললে পাগল আমি। সে চাষ করার কালেও বলেছ। পাগলকে পাগল বলেছ। তা এই পাগলের কথাটা রাখ।

বল!

লছমনের মৃত্যুতে সবাই এক ধরনের স্বস্তি পাচ্ছে। তাব ছেলে বাপের ভূমিকায় নামবে কি না, আজই ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

আমার ধান তোমাদেব লেগে বিছন। এই বিছন নাও।

দিয়ে দিচ্ছ?

হ্যাঁ নাও, কেটে নাও। কেন এমন হল, সে অনেক কথা—

সার দিয়েছ?

হ্যাঁ সার, খুব দামী সার। দুলনের গলাটা যেন ঘুড়ি কাটা সুতোর মত হারিয়ে যায়। তারপর গলা সাফ করে দুলন বলে, তোমরা কাট। আমাকেও চাবটি দিও। আবার রুইব, আবার।

সময় এলে ওরা খেতে নামবে, ধান কাটবে, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে দুলন তার জমির দিকে ফেরে। আশ্চর্য লঘু আজ মন আশ্চর্য! পাড়ে দাঁড়িয়ে ও ধানগুলি দেখে।

করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংসমজ্জার সারে পুষ্ট পাকা ধানে আশ্চর্য প্রসন্নতা। বিছন হবে বলে। বিছন মানে বেঁচে থাকা। দুলন আস্তে আস্তে মাচানে ওঠে। মনের মধ্যে একটা সুর। অবাধ্য। ফিরে ফিরে আসছে। ধাতুয়া গানটা বেঁধেছিল। 'ধাতুয়া'—বলতে গিয়ে দুলনের গলা কেঁপে গেল। ধাতুয়া তোদের হম বিছন বনা দিয়া। □

দ্রৌপদী

নাম দোপ্‌দি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান্, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা.....

দুই তকমাধারী য়ুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ।

এক তকমাধারী : সাঁওতালীর নাম দোপ্‌দি, ক্যান ? আমি যে নামের লিস্টি লইয়া আসছি তাতে ত এমুন নাম নাই ? লিস্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে ?

দুই তকমাধারী : দ্রৌপদী মেঝেন। ওর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর (নিহত) বাড়িতে ধানভানারী ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।

এক তকমাধারী : অহনকার অপিচাররা জানে ক্যাবল ফশফশাইয়া ইংরাজী লিখতে। হেয়ার নামে এত লিখছে কি ?

দুই তকমাধারী : মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওআন্টেড ইন মেনি.....

ড্যাসিয়ের : দুলন্ ও দোপ্‌দি দাওয়ালী কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। 1971 সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজনও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিসের হাতে সারেণ্ডার না করাতে এবং অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট ক্যাপটেন অর্জন সিং প্রভাতে লাশ গণনা করতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীকে না পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্লাডসুগারে আক্রান্ত হয়ে পুনর্বার প্রমাণ করে বহুমূত্র সত্যই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগেব ব্যাধিও বটে। বহুমূত্র বারোভাতারী। তার এক ভাতার অ্যাংজাইটি।

দুলন্ ও দোপ্‌দি দীর্ঘদিন নিয়ান্ডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং বিশেষ বাহিনী সে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে বিদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দাওয়ালী সাঁওতাল সাঁওতালনীকে তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে যেতে বাধ্য করে। ভারতের সংবিধানে জাত-ধম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষই পবিত্র,তা সত্ত্বেও এহেন অঘটন ঘটে যায়। কারণ দ্বিবিধ : এক—নিখোঁজ দম্পতির আত্মগুপ্তিতে অসামান্য দক্ষতা। দুই—বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল কেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক চেহারা মনে হওয়া।

বস্তুত বাঁকড়াঝাড় থানার আণ্ডারে (এ ভারতে কোনোটিও কোনো না কোনো থানার আণ্ডারে) অবস্থিত কুখ্যাত ঝাড়খানী জঙ্গলের চতুষ্পার্শে, এমন কি অগ্নি ও নৈঋত কোণেও, থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ (যেহেতু ছেন্‌তাইপার্টি নির্বিশেষে সুশিক্ষিত নয় সেহেতু বন্দুকের বদলে তারা "চেম্বারটা দিয়ে দিন" ও বলে)—গোলদার-জোতদার-মহাজন-শান্তিরক্ষক-

কাগুজে বাবু ও খোঁচোড় হত্যাদিতে অপরাধী বলে যাদের সন্দেহ করা হয়,তাদের সম্পর্কে সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীয় বিবরণীতে জানা যায় বহু পিলে চমকানো কথা। দুই কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী ঘটনার আগে সাইরেন চীৎকারে ''কুলকুলি'' দিয়েছে। কতকগুলি অসভ্য, সাঁওতালীদের কাছেও দুর্বোধ্য ভাষায় তারা নিহতদের ঘিরে উল্লাস সংগীত গেয়েছে। যথা :—

''সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে''

এবং

''হেন্‌দে রাম্‌ব্রা কেচে কেচে
পুনডি রাম্‌ব্রা কেচে কেচে।''

এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় এরাই ক্যাপটেন অর্জন সিংয়ের বহুমূত্রের কারণ। প্রশাসনিক কার্যরীতি সাংখ্যের পুরুষ, বা মাকড়া দর্শকের চোখে আন্তোনিওনির আগেকার ফিলিমের মতই দুর্বোধ্য বলে প্রশাসন পুনর্বার অর্জন সিংকেই অপারেশন ফরেস্ট ঝাড়খানীতে পাঠায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি দপ্তরের কাছে উক্ত কুলকুলে ও নৃত্যশীল দম্পতিই যে পলাতক লাশদ্বয় তা জেনে অর্জন সিং কিছুক্ষণ ''জোম্‌বি' অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষে তার এমন অহেতুক ভীতি জন্মায়, যে নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে ''জান লে লি'' বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়। কি য়ুনিফর্ম কি গ্রন্থসাহেব, কেউই তাকে এ অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তারপর প্রিম্যাচিওর ফোর্সড রিটায়ারমেন্টের জুজু দেখিয়ে তবে তাকে বাঙালি প্রৌঢ় সমর ও বামপন্থী উগ্র রাজনীতি স্পেশালিস্ট সেনানায়কের টেবিলে হাজির করা যায়। সেনানায়ক প্রতিপক্ষের কাণ্ডবাণ্ড ও এলেমের দৌড় প্রতিপক্ষের চেয়েও ভাল জানেন। তাই তিনি অর্জন সিংকে প্রথমে শিখ জাতির সমর প্রতিভা সম্পর্কে স্তুতি জানান। পরে বুঝিয়ে দেন, শুধু কি প্রতিপক্ষের বেলাই বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস? অর্জন সিংয়ের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল অর্গান থেকে বেরোয়। হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে ''পঞ্চ ক'' অব্দি বিকল ও ব্যর্থ। এ সকল বক্তিমে তিনি অন্যদের কাছেও করেন, ফলে যুধ্যমান বাহিনীর মনে পুনর্বার ''আর্মি হ্যান্ড বুক'' কেতাবে আস্থা ফেরে। কেতাবটি সাধারণের জন্য লয়কো। তাতে লেখা আছে, আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সব চেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শন মাত্রে নিধন হল সেনামাত্রের পবিত্র কর্তব্য। দোপ্‌দি ও দুল্‌না উক্ত যোদ্ধাদের ক্যাটেগরিতেই পড়ে, কেন না তারাও টাঙি-হেঁসো-তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে নিধনকার্য চালায়। বস্তুত তাদের আক্ষেটি-ক্ষমতা বাবুদের চেয়ে বেশি। সকল বাবু চেম্বার স্ফোটনে বিশারদ হয় না, তারা ভাবে বন্দুক ধরলেই ক্ষমতা আপ্‌সে বেরোবে। কিন্তু দুল্‌না ও দোপ্‌দি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করেছে জন্ম পরম্পরায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই সেনানায়ককে প্রতিপক্ষ তুচ্ছ মনে করে বটে, কিন্তু এ সামান্যি মানুষ নয়। ইনি প্র্যাকটিসে যাই করুন, থিওরিতে প্রতিপক্ষের আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন। এই জন্য শ্রদ্ধা করেন যে, ও কিস্‌সু নয়,চেংড়ারা বন্দুক লইয়া খেলো মনোভাব নিয়ে এগোলে ওদের বোঝা যাবে না ও বিনাশ করা যাবে না। ইন্ অর্ডার টু ডেস্‌ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তাই তিনি ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন। এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালিখির বাসনা রাখেন। তখন (সেই লেখায়) বাবুদের ডিমোলিশ

করে দাওয়ালীদের বক্তব্যটিকে হাইলাইট করবেন, এও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর মনের এ সকল প্রসেসকে আপাতজটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি খুবই সরল এবং কাউঠার মাংস খেয়ে তাঁর সেজ ঠাকুরদার মতই তিনিও আনন্দ পান। আসলে তিনি জানেন, প্রাচীন গণনাট্যগীতির মত করভটে বদল হোগা জমানা। এবং সকল জমানাতেই তাঁর সসম্মানে টেকার মত টিকিটপত্তর চাই। দরকার হলে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিয়ে দেবেন তিনিই ব্যাপারটি কত ঠিক পারস্পেকটিভে বুঝেছিলেন। আজ যা যা করছেন তা ভবিষ্যতের মানুষ ভুলে যাবে তাতে তাঁর তিলেক সন্দেহ নেই এবং জমানা হতে জমানায় সবার রঙে রং মেশাতে পারলে তিনি সংশ্লিষ্ট জমানার প্রতিনিধি হতে পারবেন এও তিনি জানেন। আজকে "অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড এলিমিনেশন" করে তিনি তরুণদের নিকেশ করছেন বটে কিন্তু মানুষ রক্তের স্মৃতি ও শিক্ষা অচিরে ভুলবে এ তিনি জানেন। এবং একই সঙ্গে তিনিও শেক্স্পীয়ারের মত তরুণের হাতে পৃথিবীর লিগেসি তুলে দেওয়াতে বিশ্বাসী। তিনিও প্রস্পেরো।

যা হোক, এরপর জানা যায় বহু যুবক-যুবতী ব্যাচ বাই ব্যাচ জীপগাড়ি আরোহণে থানার পর থানা হানা দিয়ে অঞ্চলটিকে যুগপৎ সন্ত্রস্ত ও উল্লসিত করে ঝাড়খানীর জঙ্গলে বিলীন হয়। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হবার পর থেকে দোপ্‌দি ও দুলনা প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে, সেহেতু তারা হন্তব্যদের বিষয়ে হন্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল। অবশেষে দুর্ভেদ্য ঝাড়খানী জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও রণভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝর্ণা ও কুণ্ডীগুলি পাহারা দেয় আড়ালে থেকে, আজও দিচ্ছে, আজও খুঁজছে। তেমনি এক তল্লাসকালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ·303র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দু হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে "মহো" বলে সফেন রক্ত উদ্‌গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত দুলন্ মাঝি।

এই "মহো" শব্দটির মানে কি? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী স্লোগান? এর মানে কি তা ভেবে শান্তিরক্ষক-দপ্তর বহু চিন্তা করেও হালে পানি পান না। আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হয় এবং তাঁরা হফম্যান জেফার—গোল্‌ডেন-পামার প্রমুখ মহাশয়দের রচিত অভিধান নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হতে থাকেন। অবশেষে সর্বজ্ঞ সেনানায়ক চমরুকে ডাকেন। ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু দুই বিশেষজ্ঞকে দেখে ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। তা হেথা কোন্ বেটা "মহো" বলল বেটে? মালদ' হতে কেউ এল?

সমস্যা ফরসা হয়। তারপর দুলনের শবদেহ উক্ত পাথরে ফেলে রেখে সেনারা সবুজ উর্দির কামোফ্লাজে গাছে গাছে চড়ে দেবতা প্যানের মত গাছের সপত্র ডাল আলিঙ্গনে বেঁধে

অসভ্য জায়গায় কাঠপিঁপড়ের সন্ধানী কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করে। দেখে মৃতদেহ নিতে কেউ আসে কি না। এটি শিকার পদ্ধতি যেমন, যুদ্ধের পদ্ধতি তেমন নয়। কিন্তু সেনানায়ক জানেন, কোন চেনা-জানা পদ্ধতিতেই এ খচড়াদের নিকেশ করা যাবে না। তাই তিনি মড়ির টোপ দেখিয়ে শিকারকে টেনে আনতে বলেন। তিনি বলেন সব ফরসা হয়ে যাবে। যে সব গান গেয়েছে দোপ্দি তার মানেও বের করে ফেললাম বলে।

তাঁর কথা শিরোধার্য করে সেনারা তৎপর হয়। কিন্তু দুলনের মৃতদেহ নিতে কেউ আসে না। উপরন্তু রাতের আঁধারে খচরমেচর শুনে সেনারা গুলি ছুঁড়ে নেমে এসে দেখে তারা শুকনো পাতার বিছানায় সঙ্গমরত শজারু দম্পতিকে মেরেছে। জঙ্গলে সেনাদের পথ চেনাবার খোঁজিয়াল দখীরাম ঘড়ারী অসংসাবীর মত দুলন্-সংশ্লিষ্ট বকশিশ না নিয়েই কার যেন হেঁসোতে গলা দেয়। দুলনের লাশ বয়ে আনতে আনতে সেনাবা লাশভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত কাঠপিঁপড়েদের কামড়ে আশীবিষের যন্ত্রণা পায়। লাশ নিতে ''কোই ন আয়া'' শুনে সেনানায়ক পেপারব্যাকের আন্টিফাসিস্ত্ ''ডেপুটি'' কেতাবটি চাপড়ে ''হোআট'' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং তখনই একজন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসের মত ন্যাংটো ও শুভ্র আনন্দে ছুটে এসে বলে ওঠেন, সার! ওই হেন্দে বামব্রা কথাগুলোব মানে বেব করে ফেলেছি। ওগুলো মুণ্ডারী ল্যাংগোয়েজ।

অতএব দোপ্দির খোঁজ চলতে থাকে। ঝাড়খানী জঙ্গল বেল্টে অপারেশন চলেছে—চলছে—চলবে। ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোড়া। সিদ্ধ মলমে সারবাব নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়। প্রথম ফেজে পলাতকরা জঙ্গলের টোপোগ্রাফি না জানায় পটাপট ধরা পড়ে ও সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদেব শরীরে করদাতার খরচের শ্রাদ্ধ করে গুলি বেঁধানো হয়। সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরে চক্ষুগোলক-পৌষ্টিকনালী-পাকস্থলী-হৃৎপিণ্ড-জনন স্থান প্রভৃতি শেয়াল-শকুন-হায়েনা-বনবিড়াল-পিঁপড়ে ও কৃমির খাদ্য হয় এবং নির্মাংস শুভ্র কঙ্কাল নিয়ে ডোমরা সানন্দে বেচতে যায়।

পরবর্তী ফেজে তারা সম্মুখ সংঘর্ষে ধরা দেয় না। তাতে এখন মনে হচ্ছে তারা কোনো একজন নিশ্বস্ত ক্যুরিয়ারকে পেয়েছে। সে যে দোপ্দি, সে সম্ভাবনা টাকায় নব্বই পয়সা। দোপ্দি দুলনকে রক্তাধিক ভালবাসত। এখন সেই ওদের বাঁচাচ্ছে নিশ্চয়।

''ওদের'' কথাটিও হাইপোথেসিস্।

কেন?

ওরিজিনালি কতজন গিয়েছিল?

উত্তর নীরবতা। সে বিষয়ে বহু গল্প উড্ডীয়মান, বহু কেতাব যন্ত্রস্থ। সব কথা বিশ্বাস না করাই ভাল।

ছয় বছরে কতজন সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত?

উত্তর নীরবতা।

সম্মুখ সংঘর্ষের পর কঙ্কালসমূহের হাত ভাঙা বা কাটা কেন? নুলোরা কি সম্মুখ সংঘর্ষ করতে পারে? কণ্ঠাস্থি লটরপটর পা ও পাঁজরের অস্থি চূর্ণিত কেন?

উত্তর দুরকম। নীরবতা। চোখে অভিমানী তিরস্কার, ছিঃ! এসব কথা কি কইতে আছে? যা হবার তা তো...

এখন কতজন জঙ্গলে আছে?

উত্তর নীরবতা।

তারা কি এক লিজিয়ন? তাদের কারণে করদাতাদের খরচে একটি বড় বাহিনী হামেহাল ওই জঙ্গলের বন্য পরিবেশে মোতায়েন রাখা কি জাস্‌টিফায়েড?

উত্তর: অবজেকশন। ''বন্য পরিবেশ'' কথাটি ঠিক নয়। মোতায়েন বাহিনী সুষম খাদ্য-চিকিৎসা ব্যবস্থা যথাধর্ম মতে অনুষ্ঠানের সুবিধা, বিবিধ ভারতী শোনা ও ''ইয়ে হ্যায় জিন্দগী'' ফিল্‌মে সঞ্জীব কুমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দেখাব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। না! পরিবেশ ''বন্য'' নয়।

কতজন আছে?

উত্তর নীরবতা।

কতজন আছে? অ্যাট অল কেউ আছে কি?

উত্তর দীর্ঘ।

যথা: ওয়েল, অ্যাকশন হচ্ছে। মহাজন-জোতদার গোলদার শুঁড়ি-বেশ্যালয়ের বেনামী মালিক-অতীতেব খোঁচড়, এরা আজও সন্ত্রস্ত। নিরন্ন নেংটেবা আজও উদ্ধত ও অনমনীয়। দাওয়ালবা কোনো কোনো পকেটে বেটাব ওয়েজ পাচ্ছে। পলাতকদের প্রতি সহানুভূতিশীল গ্রামগুলি আজও নীরব ও বিদ্বেষী। এইসব ঘটনাবলী থেকে মনে করার কারণ আছে....

এ ছবিতে দোপ্‌দি মেঝেন্ কোথায় বসে?

সে নিশ্চয় পলাতকদেব সঙ্গে শামিল আছে। ভয়েব কথা অন্যত্র। যারা আছে, তারা দীর্ঘদিন জঙ্গলের আদিম জগতে আছে। সাহচর্য করছে দরিদ্র দাওয়াল ও আদিবাসীদের সঙ্গে। এই সাহচর্যের ফলে তারা নিশ্চয়ই কেতাবী শিক্ষা ভুলে মেরে দিয়েছে। যে মাটিতে থাকছে, তার সঙ্গে হয়তো কেতাবী শিক্ষা ওরিয়েন্টেশন করে নতুন করে সংগ্রাম পদ্ধতি ও বাঁচবার নিয়ম শিখছে। বাইরের কেতাবী শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এইমাত্র যাদেব সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে। হাতেকলমে কাজ করছে যারা, তারা অত সহজে নিকেশ হবার নয়।

অতএব অপারেশন ঝাড়খানী ফরেস্ট থামতে পারে না। কারণ, আর্মি হ্যান্ড বুকের সাবধান বাণী।

দুই

দোপ্‌দি মেঝেনকে ধর। সে ওদের ধরিয়ে দেবে।

দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বেঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। মুসাই টুডুর বউ ভাত রেঁধে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেয়। ভাত জুড়োলে দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বাঁধে ও ধীরে ধীরে চলে।

চলতে চলতে ও মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ডাঙর বের করে মারছিল। একটু কেরোসিন পেলে মাথায় ঘষে দিলে উকুন নিকেশ হয়। তারপর সোডা দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলা যায়। কিন্তু হারামিরা ঝর্ণার বাঁকে বাঁকে খেপ মারে। জলে কেরোসিনের বাস পেলে ওরা গন্ধে গন্ধে চলে আসবে।

দোপ্‌দি !

দোপ্‌দি সাড়া দিল না। স্বনামে ডাকলে কখনোই সাড়া দেয না ও ! ওব নামে বখশিশ ঘোষণার কাগজটা আজই পঞ্চায়েত আপিসে দেখে এসেছে। মুসাই টুডুর বউ বলছিল, উ কি দেখিস ? কুথাকার কে দোপ্‌দি মেঝান ! তারে ধরা করালে টাকা !

কত টাকা ?

দু—শো !

হাই গ !

বেরিয়ে এসে মুসায়েব বউ বলল। ইবার সাজসাজন্ খুব। স—ব লতুন পুলুস !

হাঁ।

তু আসিস না আর।

কেনে ?

মুসাইয়ের বউ চোখ নামিয়ে বলল। টুডু বলে সি সাহেবটো আবার এসেছে। তোবে ধরলে গাঁ-বসত...

আবার জ্বালাই দিবে।

হঁ। আর দুখীরামের কথাটো....

সাহেব জেনেছে ?

সোমাই আর বধুনা হারামি করল।

তারা কুথা ?

টেন চেপে পলাল।

দোপ্‌দি কি ভেবে নিল। তারপর বলল, ঘর যা। কি হবে জানি না, মোরে ধরলে তুরা মোরে চিনবি না।

তু পলাতে পারিস না ?

নাঃ। কতবার পলাব বল ? ধরলে বা কি করবে বল ? কাঁউটার করে দিবে, দিক।

মুসাইয়ের বউ বলল, মোদের আর কুথা যাবার নাই।

দোপ্‌দি আস্তে বলল, কাবো নাম বলব না।

দোপ্‌দি জানে, এতদিনে শুনে শুনে শিখেছে, কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মুকাবিলা করা যায়। যদি নির্যাতনে নির্যাতনে শরীর ও মন ভেঙে পড়ে তখন দোপ্‌দি নিজের জিভ দাঁতে কেটে ফেলবে। সেই ছেলেটা কেটে ফেলেছিল নিজের জিভ। তাকে কাঁউটার করে দিল। কাঁউটার করে দিলে তোমার হাত থাকে পেছনে বাঁধা। শরীরের প্রতিটি হাড় থাকে চূর্ণ, যৌনাঙ্গে ভীষণ ক্ষত। কিল্‌ড বাই পোলিস ইন অ্যান এনকাউন্টার... আননোন্ মেল .. এজ টুয়েন্টি টু...

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে দোপ্‌দি শুনল কে তাকে ডাকছে, দোপ্‌দি !

সাড়া দিল না ও। স্বনামে ডাকলে ও সাড়া দেয় না। এখানে ওর নাম উপী মেঝেন। কিন্তু কে ডাকে ?

ওর মনে নিরন্তর সন্দেহের কাঁটা গুটিয়ে থাকে। ''দোপ্‌দি'' শুনে সন্দেহের ধারাল

কাঁটা শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ও মনে মনে চেনা মুখের ফিল্ম রোল খুলে চলল। কে? সোম্‌রা নয়, সোমরা পলাতক। সোমাই আর বুধনা পলাতক, অন্য কারণে। গোলক নয়, সে বাকুলিতে আছে। এ বাকুলির কেউ? বাকুলি ছেড়ে বেরোবার পর থেকে তার ও দুলনার নাম হয়েছিল উপী মেঝেন, মাতং মাঝি। এখানে এক মুসাই আর তার বউ ছাড়া আসল নাম কেউ জানে না। বাবু ছেলেদের মধ্যে আগেকার ব্যাচের সবাই জানত না।

সে সময়টা বড় গোলমেলে। দোপ্‌দির ভাবতে গেলে গোলমাল লাগে। বাকুলিতে অপারেশন বাকুলি। সূর্য সাউ বিড্ডিবাবুর সঙ্গে ষড় করে দু বছরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবয়েল বসাল, কুয়ো খুঁড়ল তিনটে। কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল, কাকের চোখের মত নির্মল।

কানাল টেক্সো দিয়ে জল লাও, স্থলে গেল সব।

টেক্সোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কি লাভ?

স্থলে গেল সব।

যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতী বদমাসি আমি মানি না। জল নিয়ে চাষ বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান বাড়ি দাও, টাকা দাও, যাঃ তোদের তরে ভাল কাজ করে আমার শিক্ষা হয়েছে।

কি ভাল কাজ করলা তুমি?

জল দিই নাই গ্রামকে?

ভগুনাল বিয়াইকে দিয়েছ।

তোরা জল পাস না?

নাঃ। ডোম চাঁড়াল জল পায় না।

এই কথা থেকে ঝগড়া। খরায় মানুষের ধৈর্যসহ্য সহজে স্থলে। গ্রামের সতীশ-যুগল-সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল, জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।

সূর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও। সূর্য সাউ বন্দুক বের করেছিল। গরুর দড়িতে পাছমোড়া বাঁধা সূর্য। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। দুল্‌না বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই।

দোপ্‌দি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।

সূর্য সাউ। তারপর সিউড়ি থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজ। স্পেশাল ট্রেন। আর্মি। জীপ বাকুলি অব্দি আসেনি। মার্চ-মার্চ-মার্চ। নালপরা বুটের নিচে কাঁকরের ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ। কর্ডন আপ। মাইকে আদেশ। যুগল মণ্ডল-সতীশ মণ্ডল-রানা অ্যালায়াস-প্রবীর অ্যালায়াস দীপক-দুল্‌না মাঝি-দোপ্‌দি মেঝেন সারেণ্ডার, সারেণ্ডার। নো সারেণ্ডার সারেণ্ডার। মো—মো—মো ডাউন দি ভিলেজ। খটাখট—খটখট—বাতাসে কর্ডাইট—খটখট—রাউণ্ড দি ক্লক—খটখট। ফ্লেম থ্রোআর। বাকুলি জ্বলছে। মোর মেন অ্যান্ড উইমেন, চিল্‌ড্রেন

... ফায়ার —ফায়ার। ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ। ওভার-ওভার-ওভার বাই নাইটফল। দোপ্দি আর দুল্না বুকে হেঁটে পালিয়েছিল।

বাকুলির পর পল্তাকুড়িতে ওরা পৌঁছতে পারত না। ভূপতি আর তপা নিয়ে যায়। তারপর ঠিক হয় দোপ্দি ও দুল্না ঝাড়খানী বেল্টের আশে পাশে কাজ করবে। দুল্না দোপ্দিকে বুঝিয়েছিল, এই ভাল রে! এতে আমাদের ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে হবে না! কে বলতে পারে একদিন জোতদার-মহাজন-পুলিস সব নিশ্চিহ্ন হবে না?

কিন্তু আজকে ওকে পিছন থেকে কে ডাকল?

দোপ্দি হাঁটতে থাকল। গ্রাম-প্রান্তর-ঝোপঝাড় ও খোয়াই-পি. ডব্ল্যু. ডির খাম্বা—পেছনে ছুটে আসার শব্দ। একজনই আসছে। ঝাড়খানীর জঙ্গল এখনো ক্রোশখানেক। এখন ওর মনে হল জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচে। ওদের বলতে হবে পুলিস আবাব তার নামে লুটিস দিয়েছে। বলতে হবে সেই হারামি সাহেব আবার এসেছে। হাইড-আউট পালটাতে হবে। তা ছাড়া সান্দারাতে খেতমজুরদের টাকা দেওয়া নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়, তারপব সেখানে লক্ষ্মী বেরা, নারাণ বেরাকে সূর্য সাউ করে দেবার প্ল্যানও নাকচ করতে হবে। সোমাই ও বুধনা সবই জানত। দোপ্দির বুকের নিচে ভীষণ বিপদেব আর্জেন্সি। ওর এখন মনে হল সোমাই ও বুধনা যে হারামি করবে তাতে সাঁওতাল হয়ে ওব লজ্জাব কিছু নেই। দোপ্দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপ্দির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস্ রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। শব্দ ও দোপ্দির মাঝে ব্যবধান এক থাকছে। কোঁচড়ে ভাত, কসিতে গোঁজা তামাক পাতা। অরিজিত, মালিনী, শামু, মন্টু কেউ বিড়ি সিগাবেট চা খায় না। তামাক পাতা ও চুন। কসিতে কাগজের মোড়ক গোঁজা আলকুলির বীজ থেঁতো। বিছে কামড়ালে অব্যর্থ ওষুধ। কিছুই দেওয়া যাবে না।

দোপ্দি বাঁ দিকে ঘুরল। এদিকে ক্যাম্প। দু মাইল দূরে। বনের পথ নয় এটা। কিন্তু পেছনে খোঁচোড় নিয়ে দোপ্দি বনে যাবে না।

জান কসম। জা—হান্ কসম দুল্না, জান ক—সম। কিছুই বলা হবে না।

পায়ের শব্দ বাঁ দিকে ঘুরল। দোপ্দি কোমরে হাত দিল। হাতের তেলোয় বাঁকা চাঁদেব আশ্বাস। হেঁসোর বাচ্চা। ঝাড়খানীর কামাররা গড়ে ভাল। এমন শা—হান দিয়ে দিব উপী, যে শত দুখীরামরে—। দোপ্দি ভাগ্যে বাবু হতে যায় নি। বরঞ্চ ওরাই বুঝেছে সব চেয়ে ভালো কাস্তে-হেঁসো-টাঙি-ছুরি। নীরবে কাজ সারে। দূরে ক্যামপের আলো। দোপ্দি সেদিকে বা যাচ্ছে কেন? দাঁড়া তুই, ফিন বাঁক ঘুর‍্যে যায়। আঃ—হা! রাতভোর আমি চক্ষু মুদে ঘুর‍্যে বুলতে পারি। জঙ্গলে যাব না, পথ হারাব না। দম ছুটবে না। তুই শালো খোঁচোড়, জাহানের মায়ায় মরিস, তু ঘুরবি? দম ছুট্যোয়ে তোবে গাড়ায় ফেলে নিকাশ করে দিব।

কিছুই বলা হবে না। নতুন ক্যাম্প দেখে এসেছে দোপ্দি বাস স্টেশনে বসে গল্প করে

বিড়ি টেনে জেনে এসেছে কত কনভয় পুলিস এল, কটা ওয়্যারলেস ভ্যান। ডিংলা চার, পিঁয়াজ সাত, লঙ্কা পঞ্চাশ সিধা হিসাব। কিছুই জানানো যাবে না। ওরা নিশ্চয় বুঝে নেবে দোপ্‌দি মেঝান কাঁউটার হয়ে খেলছে। তখন পলাবে। অরিজিতের গলা, যদি কেউ ধরা পড়ে, টাইম বুঝে অন্যরা হাইড-আউট চেনজ করবে। কমরেড দোপ্‌দি যদি দেরি করে আসে, আমরা এখানে থাকছি না। কোথায় যাচ্ছি, নিশানী থাকছে। কোনো কমরেড নিজের জন্যে অন্যদের ডেসট্রয়েড হতে দেবে না।

অরিজিতের গলা। জলের কুলকুল শব্দ। পাথর তুলে নিচে রাখা কাঠের টুকরোর তীর ফলা-মুখ যেদিকে, সেদিকের হাইড আউটে যাওয়া হয়েছে।

এটা দোপ্‌দির পছন্দ, বোধায়ত্ত।। দুল্‌না মরে গেল, কারুকে মেরে মরেনি বাবা। প্রথম থেকে এ সব মাথায় জারায়নি বলে এ ওর জন্যে হামলাতে গিয়ে কাঁউটার হতিস। এখন অনেক নির্মম নিয়ম, সহজ ও বোধ্য। দোপ্‌দি ফিরল, ভালো, ফিরল না, ব্যাড। চেইনজ হাইড-আউট। নিশানী এমন হবে, অপোজিশন দেখতে পাবে না, দেখলে বুঝবে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। দোপ্‌দি আবার ঘুরল। এই সাড়ে তিন মাইল বিস্তীর্ণ ডাঙা ও খোয়াই জঙ্গলে ঢোকার প্রকৃষ্ট পথ। দোপ্‌দি সে পথ পেছনে রেখে এসেছে। সামনে খানিকটা সমতল। তারপর আবার খোয়াই। এত উঁচুনিচুতে কখনো আর্মি ক্যাম্প ফেলেনি। এদিকটা নির্জন। ভুলভুলাইয়া। বাঘাগুগগুলি ইটা বেটে, সকল ঢিবা সকল ঢিবার মত দেখতে। ঠিক আছে দোপ্‌দি ফেউটাকে শোঁসানে নিয়ে তুলবে। সারান্দার পতিতপাবনকে তো শ্মশানকালীর নামে বলি দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাপ্রিহেন্ড!

ঢিবাগুলির একটা উঠে দাঁড়াল। আরেকটা। আরেকটা। প্রৌঢ় সেনানায়ক যুগপৎ আনন্দিত ও নিরাশ। ইফ ইউ ওয়াণ্ট টু ডেস্ট্রয় দি এনিমি, বিকাম ওয়ান। তিনি তা হয়েছিলেন। ছ বছর আগেও উনি ওদের প্রতিটি মুভ অ্যানটিসিপেট করতে পারতেন, এখনও পারছেন, আনন্দ। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখার ফলে ''কার্স্‌টি ব্লাড'' পড়ে তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজের সমর্থন দেখেছেন।

দোপ্‌দি তাঁকে ধাপ্পা দিতে পারল না, দুঃখ ও নিরাশা। কারণ দ্বিবিধ। ছ বছর আগে মস্তিষ্ক-কোষে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তিনি প্রমাণ রেখেছেন, তিনি এ সংগ্রামের সমর্থক, দাওয়ালীদের পরিপ্রেক্ষিতে। দোপ্‌দি দাওয়ালী। ভেটেরান ফাইটার। সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয়। দোপ্‌দি মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হতে চলেছে। ডেস্ট্রয়েড হবে। দুঃখ।

হল্ট!

দোপ্‌দি থমকে দাঁড়াল। পেছনের পদশব্দ ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল। দোপ্‌দির বুকের নিচে কানালের বাঁধ ভাঙল। সর্বনাশ। সূর্য সাহুর ভাই রোতোনী সাহু। সামনের ঢিবা দুটি এগোল। সোমাই ও বুধনা। ওরা ট্রেনে পালায়নি।

অরিজিতের গলা, যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।

দোপ্‌দি এখন দু হাত ছড়িয়ে আকাশপানে মুখ তুলে জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে সর্ব সত্তার শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিল। একবার, দুবার, তিনবার। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানী জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল। কুলকুলির প্রতিধ্বনি বহুদূর যায়।

তিন

সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড হয়। ওকে নিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে লাগে একঘণ্টা। ঠিক একঘণ্টা জেরা চলে। কেউই তার গায়ে হাত দেয় না এবং তাকে ক্যাম্বিসের টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং ''ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল'' বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু হাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে ''জল'' বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতে নিচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পাবে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?

ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত—তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।

পাশে চোখ ফিরিয়ে ও সাদা কি যেন দেখে। ওরই কাপড়। আর কিছু দেখে না। সহসা দৈবকৃপা আশা করে ও। সম্ভবত ওকে ফেলে গেছে ওরা। শেয়াল ছিঁড়ে খাবে বলে। কিন্তু ওর কানে আসে পায়ের ঘষটানি। ঘাড় ঘোরায় ও বেয়নেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সান্ত্রী ওকে দেখে ও হাসে। চোখ বোজে দ্রৌপদী। অপেক্ষা করতে হয় না বেশীক্ষণ। আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।

তারপর সকাল হয়।

তারপর দ্রৌপদী মেঝেনকে তাঁবুতে আনা হয় ও খড়ের ওপর ফেলা হয়। গায়ের ওপর কাপড়টা ফেলে দেওয়া হয়।

তারপর ব্রেকফাস্ট, কাগজ পাঠ, রেডিও মেসেজ ''দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড'' খবর পাঠানো ইত্যাদি হয়ে গেলে দ্রৌপদী মেঝেনকে নিয়ে আসার হুকুম যায়।

কিন্তু এখন হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু হয়।

''চল্‌'' বলতেই উঠে বসে দ্রৌপদী ও জিজ্ঞাসা করে, কুথাক্ যেতে বলছিস?

বড় সাহেবের তাঁবুতে।

তাঁবু কুথাক্?

হুই।

দ্রৌপদী লাল চোখ ঘোঁচ করে অদূরে তাঁবু দেখে। বলে, চল্, যেছি আমি।

সান্ত্রী জলের ঘটি এগিয়ে দেয়।

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়। জলের ঘটি মাটিতে ঢালে উপুড় করে। কাপড়টি দাঁতে ধরে টেনে টেনে ছেঁড়ে। সান্ত্রী এবম্বিধ আচরণ দেখে বাউরা হো গিয়া—বলে ছুটে হুকুম আনতে যায়। সে নিয়ে যেতে পারে কয়েদীকে, কিন্তু কয়েদী দুর্বোধ্য আচরণ করলে কি করবে তা সে জানে না। তাই ওপরওলাকে শুধোতে যায়।

জেলে পাগলা ঘণ্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তাঁর দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত সান্ত্রীরা তার কিছু তফাতে।

এ কি? বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান।

দ্রৌপদী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। দুটি স্তন দুটি ক্ষত।

এ কি? তিনি ধমকাতে যান।

দ্রৌপদী আরো কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাঁধানের মানুষ, দোপ্‌দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?

কাপড় কই ওর, কাপড়?—

পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।—

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে। দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্—?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়। □

রং নাম্বার

রাত একটা। তীর্থবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। টেলিফোন বাজছে। মাঝরাতে টেলিফোন বাজলে কেন এত ভয় করে?

'হ্যালো। শুনুন..হাসপাতাল থেকে বলছি..আপনাদের পেশেন্ট এইমাত্র মারা গেলেন। হ্যালো।'

'আমাদের পেশেন্ট? হাসপাতালে আমাদের কোনো পেশেন্ট নেই।'

'আপানার নম্বর?'

'রং নম্বর! ছেড়ে দিন।'

'রং নাম্বারে ফোন করেন কেন? রং নাম্বারে?'

তীর্থবাবু ফোনটা নামিয়ে রাখেন। ভয় করে। ভীষণ ভয় করে।

'হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে কেন? কেন এত রং নাম্বার হয়?'

সবিতা জিজ্ঞেস করেন।

আজ অনেকদিন হয়ে গেল সবিতা বা তীর্থবাবু কেউ অনেক রাত অবধি ঘুমোন না। ঠিক বারোটায় তীর্থবাবু একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নেন। খেয়ে চোখ বুজে শুয়ে মনটা চিন্তাশূন্য করে ফেলতে চেষ্টা করেন।

পারেন না। কিছুতে পারেন না তীর্থবাবু। তাঁর চেতনা আর অবচেতনা, প্রথম স্তরের চেতনা আর অতল স্তরের চেতনা, প্রত্যেকটির মাঝ দিয়ে খাড়া খাড়া দেওয়াল উঠে যায়। দেয়ালগুলোর গায়ে পোস্টার আঁটা থাকে।

দীপঙ্করের ছবি। শৈশবের দীপঙ্কর, মাথা ন্যাড়া, ন্যালাভোলা চেহারা। ম্যাট্রিক পাশ করা দীপঙ্কর। গ্রাজুয়েট দীপঙ্কর। লম্বা একহারা, ভাবুক আর শান্ত চেহারা।

দীপঙ্কর! তীর্থবাবুর একমাত্র ছেলে। সন্তান, সন্তান, মানুষ সন্তান কেন চায়? কেন ভালবাসে সন্তানকে? তীর্থবাবু রোজ এই প্রশ্নটা নিজেকে করেন।

তারপর ঘুম আসে। গাঢ়, অথচ অস্বস্তিতে আতঙ্কে বিপর্যস্ত ঘুম। সবিতা বোধ হয় তখনও ঘুমোন না। তাই তিনি জিগ্যেস করেন, 'কার ফোন?'

'রং নাম্বার।'

'কোত্থেকে?'

'হাসপাতাল থেকে।'

'হাসপাতাল থেকে? ওগো আমাদের ফোন যদি হয়?'

'পাগলামি কোরো না সবু। দীপু নীরেনের কাছে আছে তুমি তো জান। ওখান থেকে নীরেন ওকে দিল্লিতে ভর্তি করে দিতে চেষ্টা করছে। সব জেনেও পাগলামি কর কেন?'

'নীরেনের কাছে যদি থাকবে, তবে দীপু চিঠি লেখে না কেন? নীরেন কেন চিঠি লেখে না আমায়? তোমরা কী ভেবেছ আমি কান্নাকাটি করব? ছুটে যাব নীরেনের কাছে?'

'সবু, অস্থির হয়ো না।'

'আমার যে মনে হয় দীপু নীরেনের কাছে নেই? নীরেন ইচ্ছে করে আমায় কিছু বলছে না?'

'চুপ করো সবু, কেঁদো না। সব ঠিক আছে। তুমি তো জান দীপুর পালিয়ে থাকবার কোনো কারণ নেই।'

'তবে ও আসে না কেন?'

'সবু, অসুখে অসুখে তুমি অবুঝ হয়ে গেছ। দিনকাল খারাপ, এ অঞ্চলটাও ভালো নয় তাই ও আসে না।'

সবিতা এই সময় কাঁদতে শুরু করেন। আস্তে আস্তে, গুমরে গুমরে।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় সবিতা ঘুমিয়ে পড়েন। তীর্থবাবুর ঘুম আসতে দেরি হয়। কী হয়ে গেল দেশের অবস্থা। আচ্ছা, রুগী যদি মারা যায়, তবে টু-থ্রি এক্সচেঞ্জের নম্বর দিলে ফোর-সেভেনে ফোন করবি তোরা? রং নাম্বার। যাদের রুগী, তাদের মনের কী অবস্থা হয়?

কিংবা হয়ত কোনো অবস্থাই হয় না। আজকাল নাকি সবাই কুরুক্ষেত্রের অর্জুন, চূড়ান্ত নির্বেদে মৃত্যুকে গ্রহণ করে। লাশ নাকি বিছানাতেই পড়ে থাকে। খরচ বাঁচাবার জন্যে আত্মীয়রা চলে যায়, আর আসে না। নাকি পড়েই থাকে ঠাণ্ডা গুদামে। কেউ দেখতে আসে না পর্যন্ত।

তীর্থবাবুর ভয় করে, খালি খালি ভয় করে। এ একটা অন্য কলকাতায় বাস করছেন তিনি, অন্য পশ্চিমবঙ্গে। দেখতে মনে হয় সেই শহর। সেই গড়ের মাঠ- মনুমেন্ট- ভবানীপুর-আলিপুর-চড়কডাঙ্গার মোড়! সেই আষাঢ়ে রথের মেলা—চৈত্রে কালীঘাটে গাজন—মাঘে বড়দিনের আলোকসজ্জা।

সে শহর নয়। এ একটা ভুল শহর। রং সিটি। ভুল ট্রেনে চড়ে ভুল শহরে এসেছেন তীর্থবাবু।

নইলে, সবিতাকে বলা সবগুলো স্তোকের কথা ভুলে গিয়ে তীর্থবাবু ভাবেন, নইলে দীপঙ্কর চিঠি লেখে না কেন? কেন নীরেন খবর দেয় না দীপঙ্করের?

কেন, কেন সন্তান চায় মানুষ, কেন ভালবাসে আত্মজকে, আত্মজাকে? মৃত্যুতে মুখাগ্নি করবে বলে? রং আন্‌সার। যতদিন জীবিত আছেন ততদিনই সন্তানকে চান তীর্থবাবু। কাছে থাক তুই, পাশে থাক। আমার জ্বালা যন্ত্রণা নে, ভাগ নে। আমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে শেখ্।

রং হোপ!

কোথায় একটা এক্সচেঞ্জ আছে যেন, এই শহরে কোথায় আছে একটা এক্সচেঞ্জ? কে সেখানে বসে তীর্থবাবুকে শুধু বলছে রং নাম্বার। রং সিটি। রং হোপ!

কে সে? কোথায় সেই অদৃশ্য অপারেটর? অপারেটরদের দেখা যায় না কেন?

ভাবতে ভাবতে তীর্থবাবু টুপ করে ঘুমের ভেতর ডুবে যান। এই রকমই চলে দিন থেকে রাত, সোম থেকে রবি, সকাল থেকে সন্ধ্যা। রাতগুলোকে ভয় করে তীর্থবাবুর, কেননা ঘুমের মধ্যে শুধু সারি সারি দেওয়াল দেখতে পান তিনি।

দেওয়ালে দীপঙ্করের মুখ আঁকা থাকে। ঘুমের মধ্যেই তীর্থবাবু ভাবতে থাকেন তবে কি মনোজের কাছে যাবেন? মনোজ ওর বন্ধু, মনের রোগের ডাক্তার। তীর্থবাবুর নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে। তোমার অসুখ হয়েছে তীর্থ।

মনোজ রায় দিল। তীর্থবাবুর শুকনো মুখ, কাতর চাহনি আর বারবার কপাল থেকে ঘাম মোছার চেষ্টা ও লক্ষ করছিল।

'কী অসুখ?'

'নার্ভের।'

'নার্ভ তো আমার ভালোই মনোজ!'

'তোমার চিন্তাগুলো অলীক।'

'অলীক!'

'তুমি কী বলেছ তুমি নিজেই শোন।'

মনোজ টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিল। মনোজ রোগীদের স্বীকারোক্তি টেপ করে নেয়। তারপর বিচার করে। রায় দেয়। তীর্থবাবু টেপরেকর্ডারটা দেখে মনে মনে টাকার অঙ্ক হিসেব করছিলেন। এখন হঠাৎ একটা ক্লান্ত, নিচুগলা শুনতে পেলেন।

'আমার মনে হয় বাড়িটা আমার নয়। কড়া নাড়লে কেউ দরজা খুলবে না—কেননা আমি রং অ্যাড্রেসে এসেছি। পথে ঘাটে চলতে চলতে আমার শুধু মনে হয় কলকাতা এখন কলকাতায় নেই। বাইরের বাড়ি-ঘর-দোর গড়ের মাঠ মনুমেন্ট সব অন্য একটা শহরকে ধরে দিয়ে কলকাতা উধাও হয়ে গেছে। মনে হয় ইট্‌স এ রং সিটি! কোনো প্রয়োজন নেই তবু এটা যে সেই কলকাতাই তা নিজেকে বিশ্বাস করাবার জন্যে সেদিন ক্যাওড়াতলা গিয়েছিলাম। দেওয়ালের লেখাগুলো পড়েই বুঝতে পারলাম আমি ভুল জায়গায় এসেছি। সেদিন আমি স্বপ্ন দেখেছি...'

টেপ রেকর্ডার থামিয়ে দিল মনোজ। তীর্থবাবুর দিকে চাইল। বলল—

'কী স্বপ্ন দেখেছ তীর্থ?'

'আমি বলতে পারব না।'

'কী স্বপ্ন?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না মনোজ, আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। স্বপ্নটা আমি মাঝে মাঝেই দেখি।'

'সেইজন্যেই আমার জানা দরকার।'

'না মনোজ।'

'তুমি অসুস্থ তীর্থ। স্বাভাবিক, অসুস্থ হওয়া স্বাভাবিক...'

'কেন? আমার পক্ষে অসুস্থ হওয়া স্বাভাবিক কেন?'

'তোমার ছেলে তো.....'

'আমার ছেলে কী?

'বাড়িতে নেই।'

'মনোজ, আমি জানি না কে তোমায় কী বলেছে। আমার ছেলে দীপঙ্কর। কাজিন নীরেনের কাছে আছে লক্ষ্ণৌতে। ওখান থেকে দিল্লিতে পড়বে দীপঙ্কর।'

'গড!'

মনোজ যেন যন্ত্রণায় আর দুঃখে কথাটা বলল। ভেতর থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে এল একটা। তীর্থ, ওদের সময়ের সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার ভালো ছেলেটা এ রকম হয়ে গেল?

'গড!' মনোজ খসখস করে ওষুধের নাম লিখল। কাগজ ছিঁড়ে ফেলল, তারপর একটা ওষুধের শিশি দিল তীর্থবাবুকে।

বলল—

'রাতে এটা খেয়ো তীর্থ। ঘুম হবে।'

'দাও।'

তীর্থবাবু ওষুধের শিশিটা নিলেন। বেরিয়ে এলেন। মনোজ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। তারপর বলল—

'বোস তোমার কাছে আর যায়নি তো?'

'না, কেন?'

'আমি ওকে বারণ করেছি।'

'ও এলে আমি ঢুকতে দেব ভেবেছ বাড়িতে? সবিতাকে সব আজেবাজে কথা বলে চলে যায় শুধু!' তীর্থবাবু বেরিয়ে এলেন, এখন সন্ধ্যা হয়েছে।

না কি সকাল? রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক।

নাকি জনশূন্য পথ?

নির্জন পথ—মেঘাবৃতা রজনী...ঝড় ঝঞ্ঝা—জয়সিংহ ছুরিতে শাণ দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ঐ বর্ণনাটা তীর্থবাবুর খুব ভাল লাগত।

দীপঙ্করের পাঠ্য ছিল 'রাজর্ষি'।

তীর্থবাবু বুঝতে পারলেন তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপটপ করে।

সন্তানরা এখন ঘাতক, ঘাতক ওরা। পিতামাতাদেব নিয়ত হত্যা করে থাকে। তীর্থবাবু ওষুধের শিশিটা যত্ন করে নিয়ে যেতে লাগলেন। যেন অলিম্পিকের পবিত্র অগ্নিশিখা নিয়ে যাচ্ছেন।

আজ রাতে শুয়ে শুয়ে তীর্থবাবু সেই স্বপ্নটা আবার দেখলেন। শুয়ে দেখলেন চৌরঙ্গী রোডটার দু'পাশে লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাই নিশ্চল। পথের দুপাশে বড়ো বড়ো শাদা উজ্জ্বল আলো। পথের মাঝখানটা রক্তাক্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি প্রৌঢ়া রমণী আলুলায়িত চুলে বুকে হাত চাপড়ে প্রবীর! প্রবীর! প্রবীর! বলে বিলাপ করছে। মেয়েটিকে দেখেই তীর্থবাবু বুঝতে পারলেন ও পুরাণের সেই জনা।

দূরে—দূবে—ভীষণ প্রান্তবে
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান।
দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,
পর্বত-শিখরে চল।

চল পাপ রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল পুত্র-শোকাতুরা—

রমণীটি আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। এই সময়—ড্রপ ফেলে দাও। ঘন্টা বাজাও! বলে কারা চেঁচিয়ে উঠল। কে বলল এটা মাহিষ্মতীপুর নয়। চলে যাও।

তৎক্ষণাৎ তীর্থবাবু বলতে গেলেন শী ইজ্ ইন্ দি রং সিটি! কিন্তু ঘন্টা বাজতে শুরু করে দিল।

ঘন্টা বাজছে। ফোন বাজছে।

তীর্থবাবু উঠে বসলেন। টেলিফোন মানুষ রাখে কেন? ভাড়া দিতে জিভ বেরিয়ে যায়, নাভিশ্বাস উঠে যায় যখন?

তীর্থবাবু রিসিভার তুললেন।

'ফোর সেভেন....নাইন?'

ঠিক ঐ নাম্বারটাই তীর্থবাবুর সামনের টেলিফোনটার গায়ে লেখা আছে। তীর্থবাবু বললেন, 'নো'।

'এটা তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জির বাড়ি নয়?'

'নো।'

'তীর্থবাবু, আমি! বোস। হ্যাঁ সেদিন যা বলেছিলাম। ...দূরে রেল লাইনের পাশের বডিটা, হ্যাঁ দীপঙ্করের। ডায়েড অফ ইনজিওরিস। আপনি তো এলেন না। বডি হ্যাজ বীন ক্রিমেটেড। হ্যালো। শুনতে পাচ্ছেন?'

'না।'

'এটা তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জির বাড়ি নয়!'

না।'

'এটা ফোর সেভেন...নাইন নয়?

'না, রং নাম্বার।'

তীর্থবাবু ফোন নামিয়ে রাখলেন। কী ভেবে রিসিভারটাই নামিয়ে রাখলেন। তারপর বিছানায় ফিরে গেলেন। স্বপ্নটা আবার দেখতে হবে। যেমন করে হোক আরেকবার দেখতে হবে। স্বপ্ন দেখে তবে তীর্থবাবু জানতে পারবেন কেমন করে উন্মাদিনী জনা রং সিটি থেকে পালিয়ে গেল। স্বপ্ন ছাড়া তীর্থবাবুর হাতে আর কিছুই নেই আজ। জেগে জেগে কলকাতার পথ ঘুরলে একটাও বেরোবার পথ দেখতে পান না তীর্থবাবু। এখন তাঁকে জনার পেছন পেছন যেতে হবে। প্রবীরের মৃত্যুর পর প্রবীরের বাপ থেকে সবাই যখন ঘাতকদের নিয়ে বিজয়োৎসব করছিল, একা জনা পালিয়ে গিয়েছিল।

তীর্থবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। □

শিকার

জায়গাটি গোমো—ডালটনগঞ্জ লাইনে পড়ে। স্টেশনটিতে একদা ট্রেন দাঁড়াত। সম্ভবত ট্রেন দাঁড়াবার খরচ পোষায় না। তাই স্টেশন ঘর, থাকার কোয়ার্টার ও কুলী বস্তির ঘরে দেখা যায় গরু ও ছাগল মাঝে মাঝে। 'কুরুডা আউটস্টেশন, অ্যাবান্ডনড্' লেখা বোর্ড। এখানে এসে ট্রেনের গতি মন্থর হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনটি ওপরে ওঠে। অল্প অল্প করে এখান থেকেই ট্রেনটি ওঠে কুরুডা পাহাড়ে। ঢালু পাহাড়। কিছুদূর উঠে ট্রেনটি ঢোকে একটি গিরিখাতে। আধ মাইল লম্বা গিরিখাতের দুপাশে ব্লাস্ট করা পাথর। পাহাড়ের ওপরে বাঁশবন, এবং মাঝে মাঝে বাতাসে বাঁশগাছ নুয়ে পড়ে ট্রেনের ছাদে ঝাপট মারে। তারপর ট্রেনটি নামে ও তার গতিবেগ বাড়ে। এবার স্টেশন তোহ্‌রি। এ অঞ্চলের ব্যস্ততম স্টেশন। বন্ধ বাস বাস্তাব জংশন। তোহ্‌বি কোল্‌হল্টও বটে। ট্রেনে কয়লা ওঠে। চর্তুদিকে সারফেস্ কোলিযারি। এ অঞ্চলে মাটিব প্রায় ওপবেই নিম্নমানের কয়লা মেলে। তবে তোহ্‌বির আসল লক্ষ্মী কাঠের ঠিকাদারবা। শাল অঞ্চল। ট্রাকে বাতদিন শাল-গুঁড়ি আসে। কাঠ-কারখানায় চেরাই হয় ও দিকে দিকে চলে যায। কুরুডার নৈঃশব্দ্যের পর তোহ্‌রির সবগরম একটা অভিজ্ঞতা।

দূর-দূবান্তের গ্রাম থেকে পাহাড়েব মাথা দিয়ে ট্রেন চলার দৃশ্যটি একটা অভিজ্ঞতা। বোজ দেখে গ্রামবাসীবা, তবু বিস্ময় ফুরোয় না। ট্রেনটা যাচ্ছে, যাচ্ছে, ইঞ্জিনটা হাঁপাচ্ছে; এবাব খাতটা ট্রেনটাকে গিলে ফেলল। দৌড়ে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে কোথায় ট্রেনটাকে উগবে দিল। পাহাড়ের মাথায় একদিন কয়েকটা হাতিও দেখা গিযেছিল। বাঁশগাছ খেতে খেতে হাতিগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে। দূব থেকে তাদেব পুতুল হাতিব মতো দেখাচ্ছিল। ট্রেনটি চলে যেতে তারা শুঁড় তুলে চেঁচিযে দৌড় মারে।

কুরুডা গ্রামটি স্টেশনের অনেক পিছনে। দুটি পাহাড়, একটি প্রান্তব পেরিযে। আবেকটু কাছে হলে হয়তো গ্রামেব মানুষেবাই এসে ওই পবিত্যক্ত পাকা বাড়িতে থেকে যেত।

কুরুডা গ্রামের মতো গ্রামে যাবা থাকে, তাদেব জীবনে বাৎসবিক পূজাপার্বণ ছাড়া বৈচিত্র্য খুবই কম। সেইজন্যই কুরুডা পাহাড়ের ওপরের দৃশ্যগুলি এমন কবে তাদেব চোখ ভোলায়।

মেরী ওঁরাও যখন এসে দাঁড়ায়, তখন সে যেমন ট্রেনটিকে দেখে, যাত্রীরাও চোখ পড়লে তাকে দেখে। বয়স আঠারো, দীর্ঘাঙ্গী, চ্যাপ্টা মুখ-নাক, রং তামাটে ফর্সা। সাধাবণত ও ছাপা শাড়ি পরে। দূর থেকে ওকে খুব মোহনীয় দেখায় কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, ওর চোখের ভাষায় খুব কঠিন প্রত্যাখ্যান আছে।

ওকে দেখলে কেউ আদিবাসী বলবে না। কিন্তু ও আদিবাসী। এক সময়ে কুরুডায় সায়েবদের টিম্বার-প্লান্টেশন ছিল। স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে সায়েবরা চলে যায়। ডিক্সনদের বাংলো ও বাড়ি দেখাশোনা করত মেরীর মা। ডিক্সনের ছেলে 1959-এ এসে বাড়ি, জঙ্গল সব বেচে দিয়ে চলে যায়। যাবার আগে ভিক্‌নির গর্ভে মেরীকে দিয়ে যায়। সে যায় অস্ট্রেলিয়া। মেরীর নাম রাখেন গির্জার পাদরী। তখনও ভিক্‌নি ক্রীশ্চান ছিল। তারপর রাঁচির প্রসাদজী

যখন ডিক্সন-বাংলোয় থাকতে এলেন ভিক্নিকে কাজে বহাল করতে অরাজী হলেন, ভিক্নি আবার ক্রীশ্চান ধর্ম ছেড়ে দিল। মেরী প্রসাদদের গাই-মোষ চরায়। ও অত্যন্ত দক্ষ গাই-চরাই। তাছাড়া ফলের পাইকারী খদ্দের কুঞ্জরাদের কাছে ও অসম্ভব দর কষে প্রসাদদের ফলবাগিচার সরিফা ও আমরুদ বেচে। ক্ষেতের সবজি নিয়ে চলে যায় ট্রেনে চেপে তোহ্রি।

সবাই বলে, প্রসাদজী খুব ভাগ্যমন্ত। ভিক্নির সঙ্গে ওঁর মাইনের বন্দোবস্ত, মেরীর সঙ্গে খাওয়া-থাকা কাপড়ালত্তার কড়ার। ডিক্সনবাংলো সায়েবদের থাকার জন্যে তৈরি। সায়েবরা, ভিক্নির কথা, বারোজন আয়া নোকর-জমাদার রাখত। এখন প্রসাদজীর আমলে বিশাল বাংলোটি মেরীই পরিষ্কার রাখে।

তোহ্রি বাজারে মেরীর ভক্তবৃন্দ অগণ্য। স্টেশনে নামে ও রানীর মতো। বাজারে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে স্বাধিকারে। অন্যান্য বাজারিয়াদের কাছে বিড়ি নেয়, ওদের পয়সায় চা-পান খায়, কিন্তু কারুকে আমল দেয় না। বাজারিয়াদের নেতা, মস্তান ছেলে জালিম ওর প্রণয়ী। জালিম অথবা ও, একজনের পয়সা জমে একশো টাকা হলেই ওরা বিয়ে করবে।

বিয়ে করবে, এই কথার ভিত্তিতেই ও জালিমকে কাছে আসতে দিয়েছে। ওঁরাও মায়ের মেয়ে, দেখতে অন্যরকম, লম্বাও বেশি। তাই স্বজাতে ওর জন্যে ছেলে মেলেনি। আদিবাসী যুবকদের কাছে মেরীর গায়ের রং একটা প্রতিরোধের দেওয়াল। ছেলে দেখেছিলেন প্রসাদ গিন্নী। ওদের মালীর ছেলে। বলেছিলেন, এখানেই থাকবি।

ভিক্নি বর্তে যায়। মেরী বলে, 'না। মা জী বলেছে, তার কাজের লোক বাঁধা থাকবে বলে।'

ঘর দেবে।

ঝোপড়ি।

ছেলেটা ভালো।

না। ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল-সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, অমন জীবন আমি চাই না।

মেরী রাজী হয়নি। গ্রাম-সমাজে ও স্বীকৃত। মেয়েরা ওর বন্ধু, পাল:-পার্বণে নাচতে ও অদ্বিতীয়। তাই বলে ওদের জীবন কাটাতে ও চায় না।

প্রণয়ী হতে চেয়েছে বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে দেখিয়েছে। তারা বাইরের মানুষ। ভিক্নির মতো, তাকেও পেটে বাচ্চা দিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতে পারে?

ওকে নিয়ে একবার তো তোহ্রি বাজারে দাঙ্গা বেধে যায়। টিম্বার লরীর ড্রাইভার রতন সিং, মদ খেয়ে ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। তখনই জালিম এসে বাধা দেয় এবং রতন সিংয়ের সঙ্গে তার মারামারি হয়। তারপরেই দেখা গেল মেরী জালিমের পাশে বসে সবজি বা চীনেবাদাম বা ভুট্টা বেচছে। কোনদিন ও জালিমের ঘরে যায়নি। না, বিয়ে হোক আগে। জালিম তাতে খুবই সশ্রদ্ধ। হ্যাঁ, মেরীর মধ্যে সাচাই আছে, অস্ট্রেলিয়ান রক্তের তেজ।

মেরীর মধ্যে কোথাও আছে অবিশ্বাস। জালিমকেও ও পুরো বিশ্বাস করে না। একশো টাকা জমলেই ওরা বিয়ে করবে, এ তোহ্রির বাজারিয়ারাও জানে। সে একশো টাকা,

জালিমের বক্তব্য, সে-ই জমাবে। মেরী কিছু আনতে পারলে ভালো। তাই জালিমের ওপরেই ও ছেড়ে রেখেছে টাকা জমাবার দায়িত্ব। জালিমের পক্ষে কাজটি সহজ নয়। গ্রামে ওর মা-বাবা, ভাই-বোন আছে। এখানে ঘর ভাড়া করতে হবে, বাসনকোসন কিনতে হবে। সব খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবে না। তারপর মেরীকে কাপড়টা, জামাটা, সাবানটা দিতে ইচ্ছে যায়।

মেরী ওকে অবশ্য প্রথম উপহারটি দেয়। রঙিন সুতোর গেঞ্জী।

তুমি দেত্‌ল ? জালিম খুব খুশি।

নায়। তোহ্‌রা ভৌজী ভেজ্‌ল।

এরপর জালিম ওকে এটা সেটা দিয়েছে। যে সব শাড়ি-জামা মেরী পরে না। বিয়ের পর পরবে।

মেরী বোঝে, জালিম যথেষ্ট কষ্ট করছে টাকা জমাবার জন্যে। বুঝেও কিছু বলে না, একশো না হোক, বিরানব্বই টাকা ওর জমানো আছে।

টাকাটি ওর উপার্জন। প্রসাদ বাড়িতে। সরকারী কানুন হল, জঙ্গল-অঞ্চলে, কারো বাড়িতেই যদি মহুয়া গাছ থাকে, তাতে যে তুলবে তার অধিকার মহুয়া ফলে। মহুয়া ক্যাশ ফল। মহুয়া থেকে মদ হয়, মহুয়া ফলের কালো বিচির তেল হল কাল্‌চে কাপড়কাচা সাবান তৈরির উপাদান। প্রসাদ বাড়ির চারিটি মহুয়া গাছের ফলই মেরী কুড়োয়। গ্রামের অন্য কেউ, মস্করা করেও সে ফলে হাত দিতে পারেনি। তখনই মেরী দা তুলেছে। এ তার হকের জিনিস। এর জন্যেই ও প্রসাদ বাড়িতে বিনে মাইনেয় এত খাটে।

প্রসাদ-গিন্নীর ব্যাপারটি খুব পছন্দ নয়, কিন্তু লছমন প্রসাদ বলেন, 'ওদিকে চেও না। কে এমন করে বাড়ি সাফ করবে, গাই চরাবে? তোহ্‌রি গিয়ে ফল, সবজি, বাদাম বেচে আসবে লাভ রেখে?'

মেরী ভূতের মতো খাটে, কিন্তু প্রসাদজীর কাছ থেকে ও কোন অন্তরঙ্গতা বরদাস্ত করে না।

কি রে মেরী, মৌয়া বেচে কত টাকা হল ?

অপনার দরকার ?

মহাজনী কারবার খুলে দে।

হ্যাঁ, তাই খুলব।

দেখ আমি বলেই তোকে মৌয়া তুলতে দিই। নইলে সরকারী হক্‌। নোকর লাগিয়ে তুলে দিতে তো পারতাম ? নিই না তো ?

নোকররা এসেই দেখুক। দা আছে না। খুব রুক্ষ ও গম্ভীর গলা মেরীর।

প্রসাদজী বলেন, হবে না ? সাহেবী রক্ত।

প্রসাদ-গিন্নি মেরীকে দিয়ে তেল ডলিয়ে, গা দাবিয়ে নেন। চর্বিসর্বস্ব শরীরে মেরীর নিটোল ও কঠিন শরীরটি দেখেন। বলেন, 'কি রে, সাদীর কদ্দূর ? জালিম কি বলে ?'

গরীব মানুষের কথা শুনে আপনি কি করবেন ? আপনি সাদী দিয়ে দেবেন ?

রাম রাম ! মুসলমানের সঙ্গে ? আমি সাদী দেব ?

কেন ? মুসলমান তো সাদী করবে বলছে। আপনার ভাই তো রাখতে চেয়েছিল।

মুখের মতন জুতোটি খেয়ে গিন্নি চুপ করেন। যে মেয়ে ভূতগত খাটে, আধমণী বস্তা পিঠে নিয়ে চলে যায় ট্রেনে চেপে, আধঘন্টায় পুরো বাড়ি সাফ করে, তার মুখের কথা সইতে হবে বই কি।

মেরীকে সবাই ভয় করে। মেরী তার অটুট স্বাস্থ্য, অসীম কর্মক্ষমতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়ে ঘর সাফ করে, গাই চরায়। চরাতে-চরাতে ভাজা মকাই দিয়ে লাঞ্চ সেরে নেয়। দাড়িয়ে থেকে ফল পাড়ে ও পাড়ায়। নিজে ওজন করে দেয় কুঞ্জরাদের। পাখি ও বাদুড়ে খাওয়া ফল বোরায় তুলে নিয়ে যায়, ওর মায়ের পোষা মুরগীদের খাওয়ায়। বর্ষা সমাগমে বীজ থেকে গজিয়ে ওঠা চারা নেড়ে নেড়ে বসায়। সমস্ত দিকে কড়া নজর ওর। প্রসাদদের প্রয়োজনীয় চাল-তেল-ঘি-মসলা তোহ্‌রি বাজার থেকে কিনে আনে। নিজেই বলে, 'যত পয়সা বাঁচাই আপনাদের, আর নাফা করে দিই, তাতে আপনার কত টাকা জমে বছরে মা জী ? কেন সস্তার শাড়ি নেব ? ভালো কাপড় পরব, তেল-সাবান মাখব, সব দেবেন।'

প্রসাদ-গিন্নি অগত্যা ওকে ভালো কাপড় পরান।

মাঝে মাঝে ও গ্রামে যায় আড্ডা মারতে। অবরে-সবরে। সেখানে গিয়ে পেটে কাপড় বেঁধে প্রসাদ-গিন্নি হয়, এক পা খুঁড়িয়ে প্রসাদজী হয়, সকলকে হাসায়। সেখানে ও খুবই সহজ। যুবক ছেলেরা যখন বলে, 'মুসলমানী বিবি এখানে যে ?'

তোরা কেউ বিয়ে করলি ?

তুই করলি ?

আমার মতো লম্বা হয়ে, এত গোরা হয়ে এলি না কেন ?

তুই তো সাহেবের মেয়ে।

'বড় সাহেব ! ঔরতের পেটে বাচ্চা দিয়ে চুহার মতো ভেগে যায়। আমার মা হল বদমাশ। যখন দেখলি গোরা মেয়ে, তখনই তো মেরে ফেলবি ? তাহলে কি এত ল্যাঠা হত ?'

মেরে ফেললে তোর কি হত ?

আমি থাকতামই না।

ছেঁড়া কথা রাখ্‌। মুসলমানী হবি তো হবি। হবার আগে আমাদের একদিন.....

কি ?

ভাত-মুরগী-খাসী আর মদ ?

খাওয়াব। খু—ব খাওয়াব। কবে খাওয়াইনি ? বল্‌ তোরা ?

তা খাওয়াস বটে।

যে মেরী, প্রসাদজীর মুনাফা রাখতে মণ-মণ বোঝা টানে, ফল বেচে কুঞ্জরাদের সঙ্গে লড়াই করে, চীনেবাদাম একটা কারুক্কে দেয় না, সেই মেরীই ও বাড়ি থেকে চুরি করে আনে বাদাম তেল, আটা, গুড়। লবণ আর মসলা।

টোলীতে যে কোন ওঁরাও বাড়িতে বসে ও মাটির চাটুতে আটার পিঠে ভাজে, সকলের সঙ্গে খায়। জালিমকে বিয়ে করবে তা যেমন জানে, এও জানে, ও-যে কোন ওঁরাও মেয়ের মতো দেখতে হলে—ওর পিতা সোম্‌রা বা বুধনা বা মংলা ওঁরাও হলে—এ বিয়ে ওঁরাওরা

হতে দিত না। শ্বেতাঙ্গ পিতার জারজ মেয়ে বলে ওকে ওঁরাওরা রক্তের রক্ত মনে করে না এবং স্বয়ং স্ব-সমাজের কঠোর রীতিনীতি ওর ওপর আরোপ করে না।

করলে ও বিদ্রোহ করত। করে না বলে ওর দুঃখ হয়। ওর অন্তরের অন্তরে কোথায় যেন ওঁরাও সমাজেব একজন হবার আকাঙ্ক্ষা আছে। খুব খুশি হত ও। ওর তের-চোদ্দ বছর বয়সে যদি কোন সাহসী ওঁরাও ছেলে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করত। মেরী তোহ্‌রিতে দু-তিনটি হিন্দী ছবি দেখেছে। আমন উঠলে তোহ্‌রিতে ভ্রাম্যমাণ ফিল্ম দল আসে। খোলা মাঠে সিনেমা দেখায়। কুরুডা গ্রামের মেয়েরা কেন, ছেলেরাই বলতে গেলে কেউ সিনেমা দেখেনি। সিনেমা দেখেনি, ভালো কাপড় পরে নি, পেট ভরে খায়নি। এদের পরে মেরীর এক রকম মমতাও আছে।

এই রকম করেই চলতে থাকে মেরীর জীবন। একদিন হঠাৎ, ট্রেন থামিয়ে প্রসাদজীর ছেলের সঙ্গে নেমে পড়ে ঠিকাদার তশীলদাব সিং, এবং মেরীর জীবন বিপর্যস্ত হয়, কুরুডার শান্ত ও দরিদ্র অস্তিত্বে ঝড় ওঠে।

দুই

প্রসাদজীর বাংলোর সংলগ্ন জমি পঁচাত্তর একর বা দুশো পঁচিশ বিঘা। এ অঞ্চলে সিলিং কেউ মানে না, দূরে দূরে একদা টিম্বার-প্লান্টারদের যে সব বাংলো আছে, সবগুলির সঙ্গেই অসাগর জমি। ডিক্সন সাহেব পঞ্চাশ একরে শাল গাছ লাগান। ও অঞ্চলের বামন শাল নয়, জায়েণ্ট শাল। কালে গাছগুলি মহীরুহ হয়েছে। ফেলিংএর জন্যে প্রস্তুত। শালগাছ না থাকলে প্রসাদজী এ জমিতে কি কি ফলাতে পারতেন, তা নিয়ে আক্ষেপ করতেন। এখন শাল গাছের দাম জেনে থেকে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, উচ্চতম দামে গাছ বেচা। এ হেন প্রস্তাবে লালচাঁদ এবং মূলনিজী, অঞ্চলের আরো দুই জঙ্গল মালিকও খুশি হন। প্রসাদের ছেলে বনোয়ারী সচেষ্ট হয় ও ডাল্টনগঞ্জ ছিপাডোর চষতে থাকে। ফলশ্রুতি তশীলদার সিং।

তশীলদার সিং এসেই প্রথমে বধ্য গাছগুলি দেখে। তারপর দাঁও কষাকষি চলে। প্রসাদ বললেন, 'এ রকম শাল কাঠ! এই দামে বেচা যায়?'

বেচবেন কেন? যেখানে নাফা মিলবে, সেখানে বেচবেন?

একটা দামের মত দাম বলুন।

প্রসাদজী! বনোয়ারী আমার চিক্কে দোস্ত। ছিপাডোরে ও সার্ভিস করে, আমি ঠিকাদারী। মিছে বলব না, ম্যাচিওর গাছ, কাঠ ভি পাক্কা।

সাহেবরা লাগিয়ে গেছে।

হ্যাঁ। তবে এখানে গাছ কাটাব, টুকরা হবে! ট্রাক এখানে আসবে না। সাহেবদের দিন নেই যে হাঁথি আনব ফরেস্ ডিপার্ট্ থেকে আর তোহ্‌রি অব্দি টানাব কাঠ। আমাকে মুরহাই অবধি নিতে হবে। কাঁচা রাস্তায় ট্রাকের টায়ার ফাঁসবে। তার আগে গাছ কাটাব, কত খরচা আমার হবে বলুন?

নাফা তো হবে?

জরুর। বিনা নাফা কোই কাম করে? তবুও নাফা আপনার বেশি। জলের দরে বাংলা কিনলেন, তৈরি শাল ফরেস্ পেলেন! যা পাবেন, সবই নাফা। কেঁও কি, এর জন্যে তো আপনার কিছু ইন্‌ভেস্ না হ্যায়। মকাই নয় যে ভৈঁষা লাঙল টেনেছে, নৌকর কেটেছে। সরিফা বা আমরুদ নয়, যে পাখি বাদুড় তাড়িয়েছেন। ফরেস্ এরিয়া, শাল এরিয়া, গাছ আছে বেচে দিবেন ফটাফট্!

লালচাঁদ আর মুল্‌নিও বললেন, 'ইত্‌না তকরার না করো ভৈয়া। ও চলে গেলে কি করব? শাল গাছে যখন বাতাস চলে, দরিয়া গর্জায়, ওহি শুনেগা? ফুল হয়, ফল হয় না। ওহি দেখেগা? কিনতে চায়, বেচে দেব।'

ঠিকাদারও তাই চায়। সাহেবরা কি সব গাছ লাগিয়ে গেছে। আকাশ ফুঁড়ে মাথা উঠেছে, গুঁড়ি রেল ইঞ্জিনের মতো মোটা। শুধু প্রসাদজীর গাছ কিনবে কেন? এ অঞ্চলের সব গাছ ও কিনবে।

প্রতি পাঁচ-সাত বছরে কিছু কিছু গাছ তৈরি হবে, ও আমিই কিনব। ফটাফট! য়ে আভিতক্ ভার্জিন এরিয়া হ্যায়, হাম্‌হি মনোপলি গাছ ফেলিং করেগা।

তাই ঠিক হল। প্রসাদজী পরে বুঝলেন, গাছ বওয়ার খরচের কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। কেন না মুরহাই ছাড়িয়ে, কুরুডার কাছাকাছি চলে এলো ট্রাক। ওদিকটা সমতল ও পাথুরে। ট্রাক আসতে বাধা নেই। সেখানে তাঁবু পড়ল ঠিকাদারের। গাছ কাটার জন্য দক্ষ লোক এলো দুজন।

ঠিকাদার ম্যান পাওয়ার বংরুট করতে বসল। কুরুডা, মুরহাই, সিহো, ধাপারি, ধুমা, চিনাডোহা—ছয়টা গ্রামের ওঁরাও মুণ্ডা পুরুষরা মেয়েরা এলো। অবিশ্বাস্য কথা। ঘরে বসে পয়সা। গাছ কাটবে অন্য লোক, তার ডাল-পালা ছাঁটাই, কাটা গাছ পিস্ করার পর সেগুলি বয়ে ট্রাকে নেওয়া, পুরুষরা দিন বারো আনা, মেয়েরা আট আনা। তারপর দুপুরে মকাইয়ের ছাতু টিফিন। অবিশ্বাস্য সব! ছাতুর সঙ্গে লবণ এবং লঙ্কা। গ্রাম-পহান্ ও গাঁওবুড়ারা মেয়ে-পুরুষ আনবে। গ্রাম পিছু প্রতি হপ্তায় এক বোরা লবণ। গাঁওবুড়ারা বলল, মেয়েরা কাজ করবে, তাদের ইজ্জত?

ঠিকাদার বলল, সবাই সবায়ের মা-বোন! যে ভুলবে, তাকে ভাগিয়ে দেব।

ট্রাকের গতিময়তা, ঠিকাদারের কথাবার্তার স্পীড, তড়িঘড়ি কাজের ব্যবস্থার স্পীড, তাতে গাঁওবুড়াদের মাথা ঘুরে গেল। ফলে তাদের মনেই হল না, ঠিকাদারের কথাটি ঠিক নয়। সবাই সবায়ের মা-বোন হতে পারে না। কথা পাকা হতে ঠিকাদার গাঁওবুড়াদের ছ'জনার হাতে ছ'বোতল এক নম্বরী চোলাই ধরিয়ে দিল। কুরুডার গাঁওবুড়ারা অন্যদের বলল, 'গাঁয়ে যেয়ে পহানকে বলে থানে পূজা দে। সময়টা ভালোই পড়ল আমাদের।'

ঠিকাদার ট্রেনের ড্রাইভারের সঙ্গেও কথা বলে নিল। মুরহাইতে ট্রেন ধরে। সেখানে কথা বলে নিলে, দরকারে কুরুডাতে ট্রেন ধরবে। ওয়াগন মিলবে। ড্রাইভারকেও বোতল দিল ঠিকাদার। পাকা শাল গাছ একেকটির দাম দিচ্ছে সে পনের টাকা। কোন খরচেই তার বিশাল মুনাফা আটকায় না। সে বেচবে কিউবিক ফুট হিসেবে। বনোয়ারীকে সে একটি ট্রান্‌জিস্টার দিল। বনোয়ারী না বললে সে জানতেও পারত না, বামন শালের দেশে এই কোয়ালিটির শাল গাছ আছে। সমস্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত লাভজনক।

ঠিকাদারটি তার স্বজাতীয় প্রসাদ বা মূল্‌নি বা লালচাঁদের বর্বর অশিক্ষা ও অজ্ঞতাকে তারিফ করল। বেটারা জানেও না, কি মাল ছেড়ে দিচ্ছে। বনোয়ারীকে সে গাছ পিছু এক টাকা গোপনে দিয়ে দিয়েছে। তাতেও তার প্রচুর মুনাফা থাকছে। বহু গাছ পাঁচ সাত বছরে কাটার মতো তৈরি হবে। প্রসাদকে হতে রাখা দরকার। শীগগিরই এ সব অঞ্চল যুক্ত হবে ওদিকের তোহ্‌রি ও এদিকে নিরলা-ঘাটের সঙ্গে। রাস্তা তৈরি হচ্ছে। রাস্তা হয়ে গেলে তখন, ভবিষ্যতে ট্রান্সপোর্ট খরচা বেঁচে যাবে।

কিছুদিন বসে ঠিকাদারটি তোহ্‌রি থেকে এক বাক্স মিষ্টি, এক হাঁড়ি ঘি নিয়ে প্রসাদের বাড়ি এলো। প্রসাদ বললেন, 'মেরী! মেহ্‌মান এলো। কুছু চায়ে-উয়ে আন্‌।'

মেরী আজই স্নান করেছে। ফলে খুব ঘষামাজা চেহারা, চুলে তেল দিয়ে বেণী বাঁধা। ছাপা কাপড় সামনে আঁচল দিয়ে পরা, হাতে ও কানে পেতলের গহনা। ট্রে-তে চা খাবার নিয়ে মেরী ঢুকল, তশীলদার সিং সোজা হয়ে বসল। আরে বাব্বা! এ কি মেয়েছেলে? এই জঙ্গলে?

প্রসাদজী বুঝলেন। মেরী বেরিয়ে যেতেই উনি বললেন, আমার নোকরানীর মেয়ে। ওর মা যখন ওর মতো জোয়ানী, তখন...

মেরীর রূপের গোপন রহস্য বিবৃত করে তিনি উপসংহার স্বরূপ বললেন, আমার পরিবার ওকে বেটি সমঝতে, আমাদের ও মা-বাবার মতো ভক্তি করে।

তা তো হবেই। তশীলদার সিং বলল, নইলে আপনাকে সবাই বড়মানুষ বলে কেন? সেই বড়, যার দিল-কলিজা বড়। সে মনে মনে ভাবল, এই জঙ্গলে গাছ কাটানোর ব্যাপারটি খুবই নাফাজনক। মেরী তার অবস্থিতি কালকে অন্য অর্থেও নাফাজনক করতে পারে।

মেরী হল বহির্জগৎ তোহ্‌রি ও কুরুডার নিয়মিত যোগাযোগ-সেতু। রাতে প্রসাদজীকে ওষুধ খাবার গরম জল দিতে এসে ও বলল, য়ো হারামী তো আপনাদের ঠকিয়েছে। নাফা পিটে নিল। তোহ্‌রিসে ছিপাডোর সবাই হাসছে।

প্রসাদজী বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে জলের বাটিতে রাখলেন। তারপর ওষুধ খেলেন। একটু পরে বললেন কা করে মেরী? রোড না হ্যায়, আমার ক্ষমতা কি যে নাফায় কারুকে বেচব? জঙ্গলে থাকলে এই হয়। বনোয়ারীটা ওকে আনল। বনোয়ারীটা গোঁয়ার, তাতে ওর মায়ের দলে। আমি আগে 'না' বললাম, তাতে লালচাঁদ ঔর মূলনি রেগে গেল। বাড়িতেও অনেক আপত্তি হল।

বনোয়ারীও টাকা খিঁচে নিয়েছে।

তুই জানিস?

হমানি কো মালুম হ্যায়।

দেখ্‌ কি দুঃখের কথা।

নিশ্বাস ফেলে প্রসাদজী একটা টাকা ওকে দিলেন। এরকম মাঝে মধ্যে দেন। বললেন, আমার একটি ফল, একদানা ভুট্টায় যাতে না ঠকি, সে জন্যে তুই কত কষ্ট করিস। নিজের ছেলে, কিছু বোঝে না। কি করব বল? আমি কি জানি না, আমি মরলে এই সব কিছু বেচে দিয়ে বেটা ভেগে যাবে?

পরে যখন গাছ্ বেচবেন, ততদিনে রোড হয়ে যাবে, উস্‌কো মৎ দে না। নিজে যাবেন ছিপাডোর। বড় কোম্পানীর সঙ্গে কথা বলে কাজ করবেন। তখন নরম হবেন না।

ঠিক বলেছিস।

মেরী কুরুডার গাঁওবুড়াদেরও বলল, বারো আনা আর আট আনা! এ পয়সায় তোহ্‌রি বা ছিপডোরে কোন কুলী বাবুদের ব্যাগ বয় না।

গাঁওবুড়ারা বলল, কা করে মেরী! আমি 'না' বললে গাঁয়ের লোক খেপে যেত। বলত, কে আমাদের এই পয়সা বা দিচ্ছে?

মেরী বলল, 'ওর লোভ লেগে গেছে। পাঁচ-সাত বছরে আবার ও আসবে। তখন তিন টাকা দু' টাকা নেবে দর কষে। ওকে দিতেই হবে। নইলে এখানে বাইরের লোক পাবে কোথায়?

রোড নেই, কাজ মেলে না, জানিস তো সব।

মেরীর মনে হল, ঠিকাদারের চাহনির উত্তর অনুযায়ী সেও তার বুদ্ধি মতে সকলকে লোকটার স্বরূপ জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তশীলদার সিং ওর কথা ভুলল না। কয়েকদিন বাদে, মেরী যখন মোষের পিঠে চড়ে অন্য গরু-মোষ তাড়িয়ে ঘরে ফিরছে, তশীলদার এসে দাঁড়াল। বলল, কি খুবসুরৎ রে! তোকে হেমা মালিনীর মতো দেখাচ্ছে।

কা বোলা?

তোকে হেমা মালিনীর মত দেখাচ্ছে।

তোমাকে উল্লুর মতো দেখাচ্ছে।

তশীলদার সিং এ হেন মন্তব্যে খুবই প্রশ্রয় পেল ও কাছে এলো। মেরী মোষটা থামাল না। চলতে চলতে একটি ধারাল দা ও ফস্ করে বের করল ও অলস কণ্ঠে বলল, তোমার মতো সরু প্যাণ্ট, কালো চশমা পরা ঠিকাদার তোহ্‌রির রাস্তায় টাকায় দশটা মেলে, তাদের আমি এই দা দেখাই। বিশ্বাস না কর, গিয়ে জেনে এসো।

তশীলদারের কাছে ওর কথা বলার ভঙ্গীটি খুব আকর্ষণীয় মনে হল।

রাতে খেতে বসে বনোয়ারী বলল, মেরী আমার বন্ধুকে অপমান করেছে।

কথাটা বলল বাপকে, জবাব দিল মেরী, কি অপমান করেছি তোমার বন্ধুকে?

কঠা বাত বলেছিস।

এবার বাত বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে ওরকম বদমাশি নাখারা করতে এলে নাক কেটে দেব।

বনোয়ারীও ঘাবড়ে গেল। বলল, কা, কোই বুরা কিয়া যো?

আমার কাছে সেটা বুরাই বাত। তোমার কাছে সেটা ভালো কথা হতে পারে।

প্রসাদজী বললেন, তুই ওকে বারণ করে দিস। গাছ কিনতে এসে এ সব ঝামেলা ভালো নয়।

মেরীও যেন তোহ্‌রি বাজারে শাল গাছ বেচার কথা না বলে। বাড়ির জমিতে হলেও শাল গাছ বেচা বে-আইনী। শাল সরকারের গাছ।

রাখ্ তোর আইন। আইন মতে জমি কে রাখে, এ তল্লাটে শাল গাছ্ কে বেচে না?

মেরী বনোয়ারীকে সরাসরি বলল, আমি তোমাদের গাছ্ বেচার কথা তোহ্‌রি বাজারে বলেছি?

বলেছিস্ বলেছি? বলতে মানা করেছি।

আমাকে হুঁশ দিতে হবে না।

মেরী চলে গেল। প্রসাদজী বললেন, এ ঠিক বাত নয়। তোর বন্ধুকে বলে দিবি। বাড়িতে থাকে, মেয়ের মতন, ওকে কিছু বললে আমার অপমান।

বনোয়ারী তশীলদারকে বলল, যো বহোৎ খচড়াই আর রুঠা মেয়ে। কারুক্কে পাত্তা দেয় না।

কে পাত্তা চায়?

তা ছাড়া ওর সাদীও ঠিক হয়ে আছে।

কোথায়?

মুসলমানের ঘরে।

রাম রাম! সমাজে কি ছেলে নেই?

ওর পছন্দ।

তশীলদারের বিশ্বাসই হল না, কুরুডার মতো জংলী গ্রামের মেরী ওঁরাও ওকে উড়িয়ে দিতে পারে। গাছ্ দাগানো ও কাটা, টুকরো করা ও চালান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও মেরীর সঙ্গ ধরে থাকল। মেরী ওকে পাত্তা দেবে না, মুসলমানকে বিয়ে করবে, তাতে ওর জেদ বেড়ে গেল।

এরপরেই ও মেরীর জন্যে ডালটনগঞ্জ থেকে একটা নাইলন শাড়ি কিনে আনে, প্রসাদজীর জন্যে মিষ্টি। প্রসাদজীকে বলে, কত আসি যাই, চা-য়ো খাওয়ায়, একটা কাপড় দিলাম। প্রসাদজী নিতে রাজী হল না, কিন্তু তশীলদার শোনেনি। মেরী গিয়েছিল তোহ্‌রি। ফিরে এসে কাপড়টার কথা ও শোনে। প্রথমে প্রসাদজীকে পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দেয়। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চা-রুটি খায়। তারপর বেরোয় কাপড় নিয়ে।

তশীলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে-মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে কাপড়টা ছুঁড়ে দেয়। বলে, শহরের রাণ্ডী পেয়েছিস আমাকে। কাপড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিল? ফের বদমাশি করবি তো নাক কেটে নেব। হাত দুলিয়ে বেরিয়ে যায় ও সগর্বে।

তশীলদারের মুখ খুব ছোট হয়ে যায় ওদের কাছে। সে বলতে যায় ভালো মনে একটা জিনিস দিলাম....

গাঁওবুড়ারা বলে, আর দিস না।

কি বললে?

আর দিস না।

উ কা আচ্ছা ঔরত হ্যায়? মুসলমানকো সাথ সাদী করেগা কোই আচ্ছা ঔরত?

আর বলিস না।

হঠাৎ তশীলদার বোঝে, সে এবং তার লোকজন সংখ্যায় কম, এরাই বেশী। সকলের কাছেই বলোয়া বা দা! সে চুপ করে যায়।

রাতে ড্রাইভারও তাকে বলে, এ সব নাখারা উঠাবেন না। য়ে আদিবাসী লোক খচড়াই হোতা। কোই থানামে পাত্তা চলায়ে তো মুশকিল হয়েগা।

ড্রাইভার জানে, তশীলদারের ঘরে বউ ছেলে আছে। জানে, তা সত্ত্বেও তশীলদার মেয়েদের লালচে মরে। মেরী খুবই মোহনীয়া বটে, কিন্তু সেই কারণে আদিবাসীদের খেপিয়ে দিয়ে থানা-পুলিস করা বোকামি। মেরী যদি রাজী থাকত, তাহলে কোন কথাই উঠত না। মেরী নারাজ। তশীলদারকে সেটা মেনে নিতেই হবে।

এরপর প্রসাদজীও গম্ভীর হয়ে যায়। চা আনতে থাকে ভিক্নি। তশীলদার ও বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু মেরীর ধান্ধা ও ছাড়ে না।

মেরী যখন গাই চরিয়ে ফেরে, তোহ্রি থেকে ফেরে, তোহ্রি যাবে বলে তিন মাইল দূরে মুরহাই স্টেশনে যায়, হাট করতে যায় ধুমা, তশীলদার ওর সঙ্গে দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করে।

মেয়েরা বলে, মেরী, ও ঠিকাদার তোকে ভালবাসে।

হাতের মধ্যে পাচ্ছে না বলে। পেলেই ভালবাসা উপে যাবে। আমার মাকেও তো সাহেব ভালোবেসেছিল।

সাদী করবে তোকে।

বউ আছে।

তাতে কি?

ছাড় ওর কথা।

গাছ্ কাটা চলতে থাকে। ক্রমে শীত কমে। পলাশ গাছ্ এখানে মাইলের পর মাইল। গাছে নতুন কুঁড়ি আসে। তারপর একদিন পহানের ঘরে নাগারা বাজে। জানা যায়, হোলির দিন আদিবাসীদের যে শিকার খেলার নিয়ম আছে, এবার সে শিকার মেয়েদের। বারো বছর পুরুষরা এ দিনে শিকারে যায়। তারপর আসে মেয়েদের পালা। পুরুষদের মতো তারাও বেরোয় বলোয়া-তীর-ধনুক নিয়ে। জঙ্গলে পাহাড়ে ছোটে। শজারু—খরগোশ—পাখি যা পায় তাই মারে। তারপর সবাই মিলে বনভোজন করে, মদ খায়, গান গায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। পুরুষরা যা যা করে, ওরাও ঠিক তাই করে। বারো বছরে একদিন। তখন হোলিব আগুন জ্বেলে ওরা গল্প করতে বসে। বুধনি গল্প বলে, সেবার আমরা গুলবাঘা মারলাম। আমি তখন জোয়ানী ছিলাম।

গল্প শোনে বুড়িরা, প্রৌঢ়ারা রাঁধে, জোয়ান মেয়েরা গান গায়।

কেন ওরা শিকার করে, তা ওরা জানে না। পুরুষরা জানে। হাজার-লক্ষ চাঁদ ধ'রে ওরা এ দিনে শিকার খেলছে। একদিন বনে জানোয়ার ছিল, জীবন বন্য ছিল, শিকার খেলার অর্থ ছিল। এখন বন শূন্য, জীবন অপচিত ও নিঃশেষ, শিকার খেলা অর্থহীন। সত্যি শুধু একদিনের আনন্দটুকু।

তশীলদারের ক্লান্তিহীন একাগ্র অনুসরণে মেরীর ধৈর্য চলে যাচ্ছিল। জালিমও জেনে যেতে পারে। জানালে সে খেপে যাবে। হয়তো বাগে পেলে তোহ্‌রি বাজারে মারতে যাবে তশীলদারকে। তশীলদারের অনেক টাকা, অনেক লোকজন। শহুরে খচড়া। কোন চুরির মামলা সাজিয়ে শেষ পর্যন্ত জালিমকে ফাঁসাতে পারে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য হারাচ্ছিল তশীলদারও। গাছকাটা হয়ে যাবে শীঘ্রই, কারবার গুটিয়ে চলে যেতে হবে, তখন কি হবে? তশীলদার একদিন মেরির হাত চেপে ধরল।

সময়টা অনুকূল ছিল। এবার পুরুষদের শিকার খেলা নেই। পুরুষরা মদ খাবে, হোলির গান বাঁধবে নতুন নতুন, সং সেজে গাইতে বেরুবে, পয়সা নেবে। তশীলদার ওদের হোলির মদ দেবে বলেছে।

গাছ-কাটাইয়ের জায়গা থেকে ঘরে ফিরেই গান, রোজ গান। টানা বৈচিত্র্যহীন সুরে। তাই শুনছিল মেরী। হাট ফেরত। শুনতে শুনতে সন্ধ্যা হল। ও ঘরের দিকে রওনা হল।

তশীলদার জানত ও আসবে। ওর হাত চেপে ধরল তশীলদার। বলল, আজ ছাড়ব না।

মেরী প্রথমে ঘাবড়ে যায়। ধস্তাধস্তিতে দা-টা ছিটকে পড়ে। অনেক চেষ্টায়, অনেকক্ষণ নীরব ধস্তাধস্তির পর মেরী ছিটকে সরে আসতে পারল। দুজনেই উঠে দাঁড়াল। তশীলদারের চোখে এখন কালো চশমা নেই। বড় জুলপি, লম্বা চুল, টেরিক্লথের প্যান্ট, সুঁচলো জুতো, গায়ে ঘন লাল জামা। হোলির গানের পটভূমিতে ওকে একটা জানোয়ার মনে হল মেরীর। জা-নো-য়া-র! শব্দগুলো মনে ধাক্কা মারল। হঠাৎ মেরী হাসল।

মেরী!

ব্বাস, ওখানেই থাকো। এগিও না।

কি দেখছিস?

তোমাকে।

আমি তোকে—

আমাকে খুব চাও তুমি, তাই না?

খুব।

ভালো।

কি ভালো?

বুঝলাম সত্যিই চাও।

সত্যি চাই। তোর মতো মেয়ে মানুষ আমি দেখিনি। লাখ টাকার মাল তুই। তোর কদর করবে ও বাজারিয়া? ও মুসলমান?

তুমি করবে তো?

নিশ্চয়। কাপড় দেব, গহনা দেব—

আচ্ছা?

সব দেব।

মেরী খুব জোরে জোরে নিশ্বাস টানল। তারপর বলল, আজ নয়। আজ আমি অশুচ আছি।

কবে, মেরী কবে?

মেরীর চোখ ও মুখ কোমল হল। বলল, হোলির দিনে। তুমি থাকবে ওই বুরুর কাছে। সব মেয়েরা শিকার খেলতে দূরে দূরে যাবে। আমি তোমার কাছে আসব। তুমি তো জানো কোন্ বুরু! তুমি তো সেই পাথরটার আড়াল থেকে আমায় দেখ।

বুঝেছি।

তবে সেই বাত রইল?

হাঁ মেরী।

কারুকে বোল না কিন্তু! মরদের তো দোষ লাগে না, ঔরতের দোষ লাগে। আমি তো বেজন্মা, তায় মুসলমানকে সাদী করতে যাচ্ছিলাম।

করবি না তো?

আর করি? তুমিও একটু ধৈর্য ধরে থেক। ও রকম করে আমার পিছনে ঘুরো না।

তোর জন্যে কত কষ্ট করলাম.....

সব পুষিয়ে দেব। হোলির দিনে।

মেরী ওর গালে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, তুমি বড় ভালো গো! আগে বুঝিনি। হেলে দুলে মেরী রওনা হল। ও জানত, আজ তশীলদার ওকে পিছন থেকে দ্বিতীয় বার জাপটে ধরবে না।

তিন

আগের রাতে আগুন জ্বলেছে, আজ রাতেও জ্বলবে। কাল রাতে হোলির আগুন অনেক ওপরে উঠে আকাশ রাঙা করে রেখেছিল বেশ কিছুক্ষণ। আজ সকাল হতেই পুরুষরা মেতেছে মদে-গানে আবিরে। অত্যন্ত বুড়ি যারা, তারা কয়েকজন বাচ্চাদের আগলাচ্ছে।

মেয়েরা সবাই বনে। যে যার ঘরের সামনে বলোয়া—পুরুষদের তীরধনুক নিয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পহান্ নাগারায় ঘা দিতেই ওরা কুলকুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজে আকাশ চিরে দিয়ে ছুটে গেছে। ভিক্‌নি ছুটেছে প্রসাদজীর একটা শার্ট আর প্রসাদ-গিন্নীর সায়া পরে।

বুধ্‌নি, মুংরি, সোমারি, শনিচরী—এদের ছোটাছুটির দিন বিগত। ওরা মদের বোতল, রান্নার চাল-ডাল, বাসন, মদের চাট, মকাই ভাজা, পেঁয়াজ লঙ্কা নিয়ে গেছে পরিত্যক্ত বম্ ফিল্‌ড বাংলায়। সেখানে কুয়োয় জল আছে। পুরুষরাও শিকারের পর ওখানেই রাঁধে ও খায়। বুধ্‌নি মেয়েদের বলেছে, আমাদের সময়ে আমরা খরা-শজারু তিতির, কিছু না নিয়ে ফিরতাম না। দেখব তোরা কি করিস। শিকার কেমন করিস?

মেরী আজ জালিমের দেওয়া নতুন শাড়ী পরেছে, পুঁতির মালা। নাচতে নাচতে বুধ্‌নিকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, শিকার খেলে এসে তোকে সাদী করে নেব। তখন আমি বর, তুই বউ।

তাই হবে।

তোকে নাচাব।

নাচব।

মেরী আজ আনন্দে উপছে পড়েছে। মায়ের পোষা মুরগি চারটে ও কিনে নিয়েছে মার হাতে নগদ দশ টাকা দিয়ে। মুরগিগুলো এখন শনিচরীর হাতে। মেরী মদও দিয়েছে দু' বোতল। এটা উপরি। মেয়েরা আগেই তশীলদারের কাছে মদ চেয়ে নিয়েছে। তশীলদার পুরুষদের মদের ওপর খাসীও দিয়েছে একটা। বলেছে, সন্ধ্যায় ও এসে সকলকে শহরের টুইস্ নাচ দেখাবে। মদ খাবে বোতল বোতল। গাছ কাটা হয়ে গেছে ওর, পড়ে আছে কাটা গাছের টুকরো। সে অনেক। তশীলদার অসীম উদারতায় সেগুলো কুরুডার লোকদের জ্বালানি করতে দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আবার আসব, তোদের দিয়েই গাছ্ কাটাব। তখন মদে চুবিয়ে রাখব তোদের।

বুধনিদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করে মেরীও ছুটে গেল। শনিচরী বলল, ওঃ, মেরীকে কেমন দেখাচ্ছে আজ? যেন মুল্নিজীর বেটার বউ।

বুধনি বলল, ও বিয়ে করে চলে গেলে কুরুডা কানা হয়ে যাবে।

মুংরি বলল, কখনো খালি হাতে টৌলিতে আসেনি। তোরা ওকে দেখছিস, ভুলে গেছিস, ভিক্নি কত সুন্দর ছিল জোয়ানীতে?

সোম্‌রি ঢুকছিল আর হাঁটছিল। সহসা ও প্রায় চোখ বুজে গেয়ে উঠল,

হোলিতে আগুন রে হোলিতে আগুন
তুমি দেখে দেখে ঘরে এসো ভুলে থেক' না—'

অন্যরা তার সঙ্গে ধুয়ো ধরল। বিগতযৌবন, প্রৌঢ়া, চারটি জরতী প্রেমের গান গাইছে, রোদ তাতছে, নেশা জমছে, দূর-দূরান্তে নাগারা ও ভেঁপুর শব্দ।

মেরী ছুটে চলল। মেয়েরা সবাই কুরুডা পাহাড়ে উঠেছে। জঙ্গলে ঢুকছে, নালার ধারে যাচ্ছে। মেরী হাসল। শিকার ওরা পাবে না। সব খেলার মতো শিকার খেলারও নিয়ম আছে। শজারু-খরগোশ তিতির মেরে কি হবে? বড় শিকার মারতে হয় টোপ ফেলে।

রঙিন শাড়ি ও লাল জামায় মেরী এখন চলন্ত পলাশ গাছ যেন। যেন বাতাসে এক ঝাঁক পলাশ ফুল ছুটে যাচ্ছে। চারদিকে পলাশ আর পলাশ। লালে লাল সব। একটি খরগোশ ছুটে গেল। মেরী হাসল। ও জানে ওর বাসা কোন্ গর্তে। চলে যা! ভয় নাই! মেরী হেসে বলল। ওঃ, মদের নেশায় কি মাতন। রক্তে নাচছে উদগ্র পিপাসা। তশীলদার, তশীলদার, আমি এলাম বলে। তশীলদার ওকে খুব চায়। এখন ওর কাছে জালিম কিছু নয়। তশীলদার ওকে কত উগ্রতায় চাইতে পারে? কত ডিগ্রী ফারেনহাইটে? মেরীর মতো বন্য রক্ত আছে ওর? এত সাহস?

একটি শজারু। যা, চলে যা! আজকের দিন না হলে ওটা মারত মেরী, মাংস খেত। আজ আর ছোট কিছুতে মন উঠবে না ওর। শিকার চাই, বড় শিকার! মানুষ চাই, তশীলদার। দূর থেকে বুরুটি দেখা গেল। সিধা খাড়াই পাথর। ওপর থেকে কার্নিশের মতো বেরিয়ে থাকা পাথর। সেখান থেকে গিটগিন্দা লতা নেমে লতাজাল সৃষ্টি করেছে। জালের গায়ে হলুদ গিটগিন্দা ফুল। জালের পিছনে আড়াল। ভাবতেও রক্ত চমকাল মেরীর। তারপর

এগিয়ে গিয়ে লতাজালের পিছনেই খাদ, খাদের পাড়ে আলগা পাথর। খাদের ভেতরট' কত গভীর কেউ জানে না। কেউ নেমে দেখেনি। সেই অতল ও শীতল অন্ধকারে যদি নামা যেত? সে ও তশীলদার! তশীলদারের গাঢ় লাল শার্ট চোখে পড়ল

বিলিতি মদ, সিগারেট, তশীলদার।

চলো জী অন্দর চলো।

অন্দর কাঁহা? তোরি অন্দর মেঁ ঘুঁসে?

হাঁ জী, হাঁ।

খাদের ধারে। লতাজালের আড়ালে।

পহ্‌লে দারু পিও!

শুধু দারু কেন? সিগারেট দাও।

কেমন খেলি?

বহোৎ বঢ়িয়াঁ।

অত তাড়াতাড়ি খাস না।

নেশা চাই যে?

কত?

অনেক অনেক নেশা চাই। আরো মদ। নেশা হচ্ছে। মাথায় তারা জ্বলছে-নিভছে আঃ, নেশায় চোখে ঝালর নামছে। ঝালরটা ঝিলমিলে। ঝালরের ওপারে তশীলদারের মুখ। আরো মদ। বোতলটা গড়িয়ে গেল। খাদের গভীরে। শব্দও হল না। খাদ কত গভীর? মুখটা এবার, হ্যাঁ এবার শিকারের মতো হচ্ছে বটে।

মেরী সাদরে তশীলদারের মুখে হাত বোলাল, ঠোঁটে চুমকুড়ি খেল। তশীলদারের চোখে আগুন, মুখ হাঁ, ঠোঁট লালামাখা, দাঁতে ঝিলিক, মেরী দেখছে, দেখছে, মুখটা বদলাতে বদলাতে এবার? এবার? হাঁ, জানোয়ার হয়ে গেল।

অব লে মুঝকো?

মেরী হেসে ওকে জড়াল, মাটিতে শোয়াল, তশীলদার হাসছে, মেরী দা-টা ওঠাল, নামাল, ওঠাল, ওঠাল নামাল।

কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়াল। রক্ত? জামায়? কাপড়ে? নালায় ধুয়ে নেবে। ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে ও তশীলদারের পকেট থেকে পার্স নিল। আনেক টাকা। অনে—ক টাকা। কোমরের গেঁজে খুলে নিজের সঞ্চয়ের টাকার সঙ্গে টাকাগুলো রাখল।

তারপর আগে তশীলদারকে খাদে ফেলল, ওর পার্স, সিগারেট, রুমাল। পাথরেব পর পাথর। রক্তের গন্ধে রাতেই হায়না চলে আসবে, নেকড়ে। কিংবা আসবে না।

মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছে ও।

মেয়েদের জমায়েতে মেরী সবচেয়ে বেশি মদ খেল, গান গাইল, নাচল, সবচেয়ে তারিয়ে তারিয়ে মাংস-ভাত খেল। শিকার পায়নি বলে সবাই ওকে প্রথমে খোঁটা দিল। তারপর বুধনি বলল, কি রকম, কি রকম করে খাচ্ছে দেখ? যেন সবচেয়ে বড় শিকার ও করেছে।

মেরী এঁটো মুখেই বুধনিকে চুমু খেল একটা। তারপর দুটো খালি বোতল হাতে নিয়ে ঠুকে ঠুকে নাচতে শুরু করল। বিকেলের বাতাস ঠাণ্ডা। শনিচরী আগুন জ্বালল।

মদ আর গান, মদ আর নাচ। সবাই যখন আগুন ঘিরে গোল হয়ে নাচছে, যখন গাইছে

হে হরম্‌দেও,
এমন হোলি বছর বছর হোক—
এমনি শিকার বছর বছর করি—
মদ দিব তোমাকে
মদ দিব—

তখন নাচতে নাচতে মেরী পিছোতে থাকল। পিছোতে পিছোতে অন্ধকারে ওরা নাচছে, খুব নাচছে। মেরী অন্ধকারে ছুটে চলল। পথ ওর নখদর্পণে। কুরুডা পাহাড় দিয়ে ও আজ রাতে সাত মাইল হেঁটে তোহ্‌রি যাবে। জালিমকে ডেকে তুলবে। তোহ্‌রি থেকে বাস যায়, কাঠের ট্রাক। ওরা চলে যাবে কোথাও। রাঁচি—হাজারীবাগ—গোমো—পাটনা। আজ, বড় শিকারের পর, ওর জালিমকে চাই।

দূরে দূরে হোলির আগুন। অন্ধকারে, তাবার আলোয় রেললাইন দেখে পথ চলতে চলতে মেরীর মনে কোন ভয় এলো না, কোন জানোয়ারের ভয়। আজকে ও সবচেয়ে বড় জানোয়ার মেরেছে বলে বন্য চতুষ্পদদের বিষয়ে সব প্রাত্যহিক, রক্তে অভ্যাসের ভয় ওর চলে গেছে। □

সাঁঝ-সকালের মা

বৈশাখের তাতে মাঠের ছাতি ফাটে, সাধন কান্দোরীর মা জটি ঠাকুরনী মরে গেল।

মরে যাবার আগে জটি ঠাকুরনীর পেট গলা ফুলে ঢাক হয়েছিল। বাঁশের দোলা বেঁধে সাধন কান্দোরীর মা-কে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল।

'মোকে আঁসপাতালে দিস না সাধন। আঁসপাতালে ডোমে লাড়ীভুড়ি টেনে ছিঁড়া করবে বাপ।'

'ডাক্তারে বলে আঁসপাতালে লিয়া করতে।'

'অ বাপ, মোর সাধন বাপ, ডোম দিঞে লাড়ী ছিঁড়া করাস না বাপ!'

'লাড়ী ক্যাও ছিঁড়ে না মা।'

'ছিঁড়ে বাপ! তু কি জানবি বল? দুধের ছেলা তুই। ডোমে লাড়ী ছিঁড়ে, আঁত ছিঁড়ে। ডাক্তারে বুতলে আঁত রেখে দেয় বাপ।'

'কেন গো মা?'

'তু কি জানবি বাপ? দুধের ছেলা তুই । এ মনিষ্য শরীব ই কলিকালে পুড়াবার লয়, গোর-গাড়ার নয়,জানলু?'

'হেই মা! ই কি কথা?'

'হক কথা বাপ! কিন্তু আত্মীয় বন্ধু মনিষ মরলে সামাজ দেয়, চিলুতে উঠায়, লা কি বল?'

'হক কথা।'

'উ ডাক্তার-বদ্যি-ডোম-ধাই সভে শুগুন পানা চিয়ে দেখে।'

'মা।'

'চিয়ে চিয়ে দেখে। তা বাদে য্যাতক্ষণ বেওয়ারিশের মড়া পায় তখন উ-রা ভাগীদার হয় বাপ। ডোমে লাড়ী আঁত ডাক্তারকে দেয়। ধাই কাপড়-জামা ল্যায়। ডোম মড়াটি পচা করিয়ে হাড় বিচে পয়সা ল্যায়।'

'ধ্যুর, তা আমি হতে দিই?'

'দিস না বাপ। আমি তোর সাঁঝ-সকালের মা। মোকে তু আঁসপাতালে মারা করাস না।'

'চুবো যা মা'।

সাধন কান্দোরী ধমক দিয়ে উঠেছিল। জটি ঠাকুরনী ওকে পেটে ধরেছিল এক দিন। ওরা বড় প্রাচীন জাতি, জরা-ব্যাধের বংশধর। ওদের সম্প্রদায়ের নাম পাখ-মারা সম্প্রদায়। সেই বংশের মেয়ে জটেশ্বরী সাধনকে পেটে দশ মাস ধরে প্রসব করেছিল।

কেমন করে গর্ভধারিণী মা সাঁঝ-সকালের মা হয়ে গেল সে এক আশ্চর্য বৃত্তান্ত। সাধনের দেড় বছর বয়স থেকে জটেশ্বরীর ওপর দেবতার ভর। সেই থেকে জটি দিনেমানে জটি

ঠাকুরনী। সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা অবধি ঠাকুরনীকে কেউ মা বউ-বোন ভাবতে নিষেধ। ডাকতে নিষেধ।

সাধনকে জটি নিষেধ করেছিল।

'মা বোলে ডাকো না বাপ, বাপো আমার।'

'কখুনো লয় ?'

'লা বাপো, খুব বিয়েনবেলা, সূয্যি না উঠতে মা বোলে ডেকে লবি। সূয্যি ডুবতে মা বলে ডাকবি।'

'শুধু সাঁঝে আর সকালে, তাই লয় গো মা ?'

'হ্যাঁ বাপো!'

সাঁঝে আর সকালে তু মা। আর দিনেমানে তু ঠাকুরনী ?'

'হ্যাঁ বাপো। আমি তোর সাঁঝ-সকালের মা।'

এই সাঁঝ-সকালের মা জটেশ্বরী কেমন করে যাদবপুরে লাইনের পারে এল, কেমন করে ওর ছেলেকে রিক্সা করে দিল—সে অনেক কথা।

মা ছাড়া সাধন কান্দোরী কিছু জানে না। সাধন নির্বোধ, তিরিশ বছর বয়সেও ওর বুদ্ধিসুদ্ধি অপরিণত। মোষের মত শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ফুসফুস রক্তজবার পাপড়ির মতো হৃদযন্ত্র, সাপের মতো পিচ্ছিল নাড়ী, ভোরের দোপাটির মতো কুসুমকোমল জীবকোষ, কিছু নেই ওর শরীরে। শুধু একটা পাকস্থলী আছে।

আর আছে খিদে। শুধু খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে ওর মনিবের যুবতী বউ কাঠ চ্যালা করায়, টিউবকলের জল টানায়। মণ মণ কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।

মনিবের যুবতী ঘোমটা-টানা সুন্দরী বউ।

'মনিবানীর দিকে চেয়ো না সাধন।'

'লা মা।'

'য্যাখন চাইবি, মাত্তিভাবে দেখবি, জানু বাপ।'

'হ্যাঁ মা।'

মা যা বলে সাধন তাতেই হ্যাঁ বলে। মা ওর জগৎ-সংসার, মা ওর চাঁদ-সূর্য। সেই মা যখন জ্বরে,আমাশায়, পিত্তরসে, কফে ভুগে ভুগে ফুলে গেল, তখন সাধন মনিবকে বলল, 'টাকা দেন মশায়, মোকে টাকা দেন।

'কেন সাধন ?'

'মোর মা মরে যায় মশায়।'

'কি হয়েছে, অসুখ ?'

'হ্যাঁ মশায়। মা দিনেমানে ছেঁয়া দেখতে লেগেছে, লুন খেয়ে বলে বাতাসা খেলাম। আজ দুপুরে মশায় মা বলে মোকে 'মা' বলে ডাক সাধন।'

'বললে!'

'হ্যাঁ মশায়। ডাক্তার আনা করব আপনি টাকা দেন।'

সাধন কান্দোরীর মনিব ওকে দশটি টাকা হাতে দিয়ে বলল, 'মা-কে চিকিচ্ছে করা সাধন। শত হলেও গরভধারিণী।'

'আমার মা মনিষ্য লয় গো মশায়। মা ঠাকুরনী।'

'তুই ডাক্তার ডাক।'

অনাদি ডাক্তার যাকে চিকিৎসা করে সে-ই মরে যায় বলে কলোনীর লোকেরা ওকে মেরে তাড়িয়েছিল। অনাদি ডাক্তার এখন রেলপারে খালধারে দোকান খুলেছে। বর্তমানে তার প্রচুর পসার। ইদানীং বহু খুনজখমের লাশকে ও মোটা টাকার বিনিময়ে 'ডায়েড অফ্ হার্ট ফেলিওর' লিখে শ্মশানে পাচার করে। শ্মশানের লোকদেরও আজকাল টাকা দিয়ে কেনা যায় এই যা সুবিধে।

অনাদি ডাক্তারের যে বাড়বাড়ন্ত হবে তা জটি ঠাকুরনী বলেছিল। হয়তো সেই জন্যে, হয়তো বহু ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাত, মিথ্যা সার্টিফিকেটের পাপের ভয়ে, ব্রাহ্মণ অনাদি ডাক্তার জটি ঠাকুরনীর পা ধরে তেল-নারকেল-চাল-লবণ দিয়ে প্রণাম করে।

অনাদি ডাক্তার তাই তাড়াতাড়ি জটি ঠাকুরনীকে দেখতে গেল। ভয়ানক দুর্গন্ধ জটির ঘরে। তক্তপোশে টকটকে লাল রংয়ের ময়লা চেলি পরে জটি ঠাকুরনী রূপকথার রাক্ষসীর মতো চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। পেট ফুলে উচুঁ, হাত পা চিতিয়ে ফেলে রাখা। জটি ঠাকুরনীর চোখে শুধু আশ্চর্য, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল। পিচুটিভরা রক্তাভ চোখের দৃষ্টি এত সুন্দর হতে পারে তা অনাদি ডাক্তার জানত না।

অনাদি ডাক্তারের টেবিলে মাঝে মাঝে যে-সব যুবতী মেয়েরা অসহায় বেদনায় শুয়ে থাকে, তাদের চোখের চেয়েও জটি ঠাকুরনীর চোখ সুন্দর। আসন্ন মৃত্যু ছাড়া আর কেউ এমন সৌন্দর্যে মানুষের চোখ রাঙিয়ে দিতে পারে না।

অনাদি থমকে গেল। নাড়ী দেখে, পেট দেখে অনাদির চোখে জল এল।

আহা, জটি ঠাকুরনীর কাছে সে বছরে পাপ স্খালন করতে দু-একবার আসত।

'মা, পাপ হয়ে গেল মা।'

দিনেমানে জটি ঠাকুরনীকে কেউ মা বলত না, ঠাকুরনী বলতে হত। অনাদি আসত রাতের কালোয় মুখ ঢেকে।

'কি পাপ, অ আমার বাপ, কি পাপ?'

'মেয়েটা মরে গেল মা।'

জটি ঠাকুরনী নিশ্বাস ফেলে বলত 'মহাপাপী ছিল যি উ। তুমি কি জানবে বাপ, উ-র আঁতাটা (আত্মা) লিয়্যে এখন যমদূত ডাঙশমারা করবে। মহাপাপে বাপের মুখে কালি দেয় নাই উ? ভদ্দর ঘরের মিয়ে তু, তুর এমন বেভ্রম?'

'কি হবে মা?'

'এই লাও বাপ। গোসাপের কণ্ঠহাড়টি মাদুলীতে আছে। বালিশের তলে রেখে লিদ যাবে। আর তে-সন্ধে গঙ্গাজল দেবে ঘরে, কেমন?'

অনাদির মতো পাপী-তাপীদের জন্যে আঁতুড়ের মরাছেলের নখ, গোসাপের কণ্ঠ-হাড়, ধনেশ পাখির তেল কে সংগ্রহে করবে? পয়সা নয়, কড়ি নয়, শুধু একপালি চাল নিত জটি ঠাকুরনী। সন্ধ্যে হলে ঠাকুরনী হয়ে যেত সাধনের মা। ঠাকুরনী হয়ে যে চাল পেত, মা হয়ে তার ভাত বেঁধে ওর হাবা ছেলেকে খাওয়াত।

এখন অনাদিকে কে দেখবে? দুঃখে অনাদির চোখে জল এসে গেল। অনাদি বলল, 'সাধন, হাঁসপাতালে লিয়ে যেয়ে দেখা। ঠাকুরনীর শরীল আমি ভাল বুঝি না।'

অনাদি টাকা দিল। বলল, 'ট্যাক্সি চাপিয়ে লিয়ে যাবি।'

সাধনের মহাপ্রাণী ভয়ে উঁড়ে গেল। টাকা নিয়ে ও তাড়াতাড়ি মিঠাইয়ের দোকানে গেল। মনের দুঃখে মুড়ি-বাতাসা-গজা কিনে দোকানে বসে বসেই খেল সাধন। ঘটি ঘটি জল খেল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার জটিকে নিল না। বলল, 'মুর্দা হ্যায়। গাড়িমে মর্ যায়গা।'

তখন সাধনের মনিব বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ দিল। খাটুলি তৈরি করে জটি ঠাকুরনীকে নিয়ে সাধন বাঙ্গুর হাসপাতালে গেল।

হাসপাতাল বড় অচেনা জায়গা। এত বড় বাড়ি, এত মানুষ-জন, সাধন বলল, 'ভাই বলরাম! ডরে মোর হাত পা পেটের লাড়ীতে সান্ধায়। ঐ আঁসপাতালে এত দরজা, কিন্তুক কুন পথে ঠাকুরনীকে ভিতরে লিয়্যে যাই তা বল?'

'তুই এক জেতের মানুষ সাধন।'

বলরাম, জগদীশ আর উদ্ধব ডাক্তারকে ডাকল। জটি ঠাকুরনীকে ওরা ভর্তি করবেই করবে। ডাক্তার যত বলে 'বুড়ি এখনি মরবে', সাধন তত কাঁদে 'ঠাকুরনীকে বাঁচিয়ে দেন গো! ঠাকুরনী বিনে মোর জগৎ আন্ধার! আহা! ঠাকুরনী যি সাঁঝ হলে মা হয় গো! মোর মাথায় সাদা চুল, তবু মোকে লিয়্যে কত সুহাগ করে ঠাকুবনী! লিজে না খেয়্যে মোকে খাওয়ায় গো!'

'কি বলছ তুমি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

'ডাক্তারবাবু গো'!

সাধন মাথা-কাটা বলির মোষের মতো মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করতে লাগল।

বলরাম এই কুতঘাটে বিয়ে করেছে। কলোনীর মানুষ ও, ভদ্রলোক দেখে ভয় পায় না। যতদিন বলরাম গরিব ছিল ততদিন ভদ্রলোক দেখে ওর রাগ হত না। তখনো ওর গায়ে ধলেশ্বরীর নদীর শীতলতা, স্বভাবে ধানক্ষেতের নম্র শ্যামলিমা ছিল।

এখন কলোনীতে বাড়ি, নিজের রিক্সা ও বারুইপুরে ধানজমি কববাব পব থেকে বলরাম বদলে গিয়েছে। ভদ্রলোক দেখলে, নম্র ব্যবহার পেলে, মিষ্টি কথা শুনলে ওব থুতু ছেটাতে ইচ্ছে করে। বলরাম জানে বর্তমানে এই বাংলা বাপের নয়, দাপের।

বলরাম এগিয়ে এল। কাটা-কাটা কথায় বলল, 'উনি সামান্য মানুষ নয়, জানলেন? উনি দেবাংশী মেয়েছেলে, আমরা ওঁকে মান্য করি, ধর্মপূজোয় ওঁকে ডালা দিই। সিট থাকলে ভর্তি করে নিন না সার। সিট আমার নয়, আপনারও নয়, সর্বসাধারণের, তাই না?'

অবশেষে জটি ঠাকুরনী ভর্তি হল।

সাধনের কান্নাকাটি দেখে ডাক্তারের কষ্ট হয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল ডাক্তার। এতবড় সা-জোয়ান পুরুষকে মায়ের জন্য এমন করে কাঁদতে দেখেনি ডাক্তার।

'ঠাকুরনী বাঁচবে না ডাক্তারবাবু?'

'দেখি সাধন। অস্থির হয়ো না।'

'কুন ওগ উয়ার লাই মশাই! উনি মনিষ্য নয়, উনি দেবতা গো! ওগ উয়ার কাছে আসতে ডরায়।'

'তা তো বটেই।'

'এই তো উনি দিনেমানে ঠাকুরনী থাকে গো মশায়! সাঁঝে সকালে আমার মা হয়। গঙ্গাজলে চ্যান করলে, আঙা কাপড় পরলে উনি ঠাকুরনী। ত্যাখন আর সভার মতো আমিও উয়াকে মান্য দেই গো!'

'তাই নাকি?'

'কিন্তু মা বলবার লেগ্যে আমার জীউটা ফাট্যে গো মশায়! তাই! য্যাখন সাঁঝ হয়, আমি যেয়্যে উয়ার কোলে মাথা রাখব আর মা! মা! মা! বলে সাধ মিটয়্যে ডাকব।'

ডাক্তার অবাক হয়ে সাধনকে দেখছিল। নার্স একটু হেসে বলল, 'তোমার অতবড় মাথাটা ওঁর কোলে রাখ?

সাধন গভীর আন্তরিকতায় বলল, 'মাথা আখব, মা বলে ডাকব, তা বাদে কত অঙ্গ করব মোরা! উয়ার দিনেমানে ভক্তজনা আছে। কিন্তুক এতের বেলা আমি বিনা উয়ার ক্যাও নাই।'

'দিনে কি খেত তোমার মা?'

'আমি কি জানি মশায়? এই ধরেন গা, চা খাবে, গাঁজা খাবে, গঙ্গাজল খাবে। দেবাংশী শরীলে কি ভাত-জল চায়?'

'সন্ধ্যেবেলা?'

'ভাত রান্ধবে, মোকে দেবে, লিজে খাবে ত্যাতটুকুন। য্যামন কচিছেলা খায়।'

'সেই জন্যেই রোগটা হয়েছে সাধন।'

'লা গো! ওগ উয়ার লাই। ওগ কি দেবাংশী শরীলে পশে? মোকে মনে হয় ক্যাও রিষ করে বাণমারা করল বুঝি?'

'দেখি, আমরা দেখি।'

'ডাক্তারবাবু!'

'বল?'

সাধন মাটিতে পা খুঁড়ে বলল, 'আপোনাদেব ঘরে তো লক্ষ্মী বান্ধা গো। ভাতের পাহাড়, ডালের সাগর। তা উয়ার ভাগের ভাতটা মোকে দিতে পাব? উতো এখন খায় না!'

'তা হয় না সাধন।'

ডাক্তার অবাক হয়ে সাধনকে দেখতেই থাকল। মানুষের শরীরে পশুর মত সরল প্রবৃত্তি এমন করে ডাক্তার আর কখনো দেখেনি।

কিন্তু জটি ঠাকুরনীর চিকিৎসা হল না। 'উয়ার কি হয়েছে, বলেন মাশায,' বলে ডাক্তারের মাথা খেয়ে ফেলল সাধন।

ডাক্তার কি বলবে? জটি ঠাকুরনীকে ওরা গ্লুকোজ দিল, স্যালাইন দিল, গলার নলী শুকিয়ে গিয়েছে বলে নল চালিয়ে খাবার দিতে চেষ্টা করল। চেষ্টার ত্রুটি হল না।

জটি ঠাকুরনীর অবস্থা ভাল হল না। মাঝে মাঝে যখনি ওর জ্ঞান হয় তখনি ও বলে,

'আঁসপাতালে মোকে এখো না বাপ মোর। মোর সাধন বাপো। উ ডাক্তার মোর লাড়ী ছিঁড়বে, ডোমগুলান মোর খুলি-হাড় বিচে ফার্সা করবে। মোকে ঘরে লিয়া কর।'

তিনদিনের দিন ডাক্তার জটির রোগ ধরতে পারল। জটির রোগ বড় ছোঁয়াচে। আজও ভারতভূমিতে তার চিকিৎসা বেরোয়নি কোন। এ রোগের নাম অনাহার। না খেয়ে না খেয়ে, খুদকুঁড়ো সাধনকে খাইয়ে জটি ঠাকুরনীর নাড়ী শুকিয়ে গিয়েছিল।

'এ দেব-রোগ সাধন, এর চিকিৎসা আমি জানি না।'

ডাক্তার একটু ঠাট্টা করল।

'তবে লিয়্যে যাই?

'নিয়ে যা।'

জটি ঠাকুরনীও চোখ চেয়ে বলল, 'আরে মড়া, আরে বোকা সাধন! মোর জন্মবিত্তান্ত তু জানিস না? জানিস না আমি কুন সামাজের মিয়ে? মোকে ঘরে লে, ঘরে আমি শরীল রাখব।'

বলরাম, জগদীশ, সাধন, আরো পাঁচজন সমারোহ করে জটি ঠাকুবনীকে ঘরে নিয়ে এল। জটির ঘরের সামনে একটা নিমগাছ। তার ছায়াতে জটিকে শোয়ানো হল।

'নিমগাছের ছায়া ভাল সাধন। আমরা পাঁচজন আছি। তুই যেয়ে ওনার কাছে বস গা।' বলরামের কথায় সাধন গিয়ে জটি ঠাকুরনীর কাছে বসল।

'একোজনা বামুন ডাক গো!'

আছে, বামুন আছে।'

'কে গো?'

'অনাদি ডাক্তার।'

'উনিকে ডাক। ঠাকুরনীর কাছে বসাও।'

অনাদি ডাক্তার জটি ঠাকুরনীর কাছে বসল। সাধন অভিভূত কাতর।

'কথা বুলে যাও গো কিছু, ও আমার সাঁঝ-সকালের মা!'

'বুলব।'

জটি এখন শেষ সময়ে চেতনা ফিরে পেয়েছে।

'বুল গো!'

'তোমার বাপ কান্দোরী। তোমরা জেতে বেদিয়া। বনে ঘুর, বাদাড়ে ঘুব, আর আশ্চাজ্জা চিকনপাটি বুন।'

'তুমি?'

'আমি?'

এখন আকাশে সূর্য, বেলা এখন দশটা। জটি যখন ভাল ছিল এই সময়ে ও ঠাকুবনী হয়ে ঘবে বসে থাকত, মানুষজনের পুজো নিত। এখন সাধনের খুব ইচ্ছে মা হয়ে যায় জটি, বলে—সাধন আমার কাছে আয়।

জটিরও ইচ্ছে হল সাধনকে কাছে ডাকে। বলে অ সাধন, কাছে আয়।

জটি তা বলতে পারত। জটি তা বলল না। এখন তার চাবপাশে কত ভক্ত, কত মানুষ।

এরা ওর কাছে আসে, প্রণাম করে, সম্মান জানায়। ওরাই তো বছরভোর নিত্য চাল যুগিয়ে সাধনকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজের ইচ্ছেয় জটি একদিন ঠাকুরনী হয়েছিল। আজ ওকে ঠাকুরনী হয়েই মরে যেতে হবে।

'তুমি কে গো ?'

সাধন সরল ভক্তিতে জিগোস করল। মা কে? জটি কে? সাধনের বাবা যদি কান্দোরী হয়, জটি কি অন্য সমাজের মেয়ে? সাধন, বলরাম, জগদীশ সবাই কাছে ঘিরে ঘন হয়ে এল।

'তুমরা ছুট নও বাপো! তুমরা জেতে বড়, অ্যানেক বড়।'

'তুমি ?'

'আমাদের বেত্তান্ত বড় আশ্চাজ্জ গো! মোর আদি পুরুষ সেই জারা ব্যাধ। নাম জান ?'

'জরা ব্যাধ ?'

'মোরা বলি জারা ব্যাধ। মোদের জিহ্বায় তুমাদের সাড় লাই ডাক্তার।'

'ঘোর বিকার।'

অনাদি ডাক্তার সভয়ে বলল। এমন বিকারের রুগীকে হাসপাতাল ছেড়ে দিল কেন? এমন রুগীকে ঘিরে এত মানুষের ভিড় কেন? জারা ব্যাধ তো মহাভারতের মতই পুরনো, গল্প-কথা।

'বিকার লয় ডাক্তার। মোর কথা সত্যি লা মিছ্য তা বলতে লারব। শুনেছি...'

জটি এক আশ্চর্য কথা বলতে লাগরল।

'কুন দেশে য্যান সাগর, কুথায় য্যান দ্বারকাপুরী। জারা ব্যাধ সি দেশে যেঞে বাণমারা করেছিল।'

'কাকে ?'

'কিষ্ণকে। পুঁথি পড় নাই ?

'সবাই জানে।'

'ই তো পাপের রাজা মাহাপাপ! ভগমানকে বাণমারা করে ই হতে বড় পাপ লাই। সি বাদে জারার বংশ সি দেশ তেগে ই দেশে এল।'

'কোথায় ?'

'হিজলী—কাঁথি—তমলুক—মেদিনীপুরে।'

'তারপর ?'

'মোদের সামাজ বড় ছোট। মোরা শ্মশানে-মশানে ঘুরি, সাপ ধরি, শ্মশানের কলসীতে জল খাই।'

'ছি!'

'মোরা পাখপক্ষী ধরি, মোদের বলে পাখমারা।'

'পাখমারা কোন জাতি গো? নাম তো শুনিনি।'

'মোদের আনসামাজে সাঙা হয় না। কিন্তুক আমার মন যেয়ে উ সাধনের বাপে বসল। সামাজে কথা হত, তাই মোরা চলে যেয়ে সাঙা করি গো।'

জটি গুছিয়ে বলতে পারল না। প্রথম বিয়ের নাম বিয়ে। দ্বিতীয় বিয়ের নাম সাঙা। পাখমারাদের জাতধর্ম অনুযায়ী জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে ওদের দেবতার বিয়ে হয়। আগে দেবতাকে জল-নারকেল দিয়ে তবে ওরা মানুষের ঘর করতে আসে।

'তারপর, অ্যানেক, অ্যানেক দিন বাদে আমি ঠাকুরনী হলাম গো। আমার পরে সাঁজ-সকালে দেবতার ভর।'

'জটি ঠাকুরনী, জল খাবে, জল?'

'না বাপো সকল। এখন আমি মাহানন্দে স্বর্গে যাব। কিন্তুক সাধন...

জটি হেঁচকি তুলল।

'কি? মোকে কি বল তুমি?'

'আমি ঠাকুরনী হয়েছিলাম। দেখ, মাথার 'পরে সূর্য।'

'এখন দিনমান।'

'তুর মা লয় সাধন, ঠাকুরনী স্বর্গে যায়। তুকে অ্যানেক দেব্য দিতে হবে যি।'

'কি দেব্য?'

সকলের মনে মহা কৌতূহল। সাধনের মাটির উঠোনে পাড়া-পড়শীর ভিড়। যেন এক অন্ত্যজ, গরিব, হতভাগিনী মারা যাচ্ছে না, যেন কোন মহামানী দামী মানুষ মারা যাচ্ছে তাই এত ভিড়।

সবাই চুপ করল। নিশ্বাস টানল। কি চাইবে তাদের জটি ঠাকুরনী শেষ সময়ে।

'সাঁঝে মরতাম বিয়েনে মরতাম, তুর কানাকড়ি লাগত না। এ্যাখুন তু মোকে হাতী দিবি। ছরাদে হাতী দিবি।'

'কিরে কাড়লাম।'

শোকে দু:খে পাগল, ঘটনার অস্বাভাবিকতায় হতবুদ্ধি সাধন বলল, 'সভে শুন, উনির ছরাদে আমি হাতী দান করব।'

'ঘো....ঘো....ঘো....ঘোড়া দিবি।'

'দিব।'

'অন্ন-বস্ত্র-ভুঁই-সোনা-উপো অযচ্ছল দিবি।'

'দিব।'

সাধন ডুকুরে কেঁদে উঠল, 'সব দিব গো! তুমি মোরে ছেড়ে যেয়ে না। মোর ক্যাও লাই!'

'তুর বো...বো...বো...

জটির গলায় কথা আটকে গেল। সাধনের যে বউটা পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ি আছে তাকে নিয়ে আসবার কথাটা জটি বলে যেতে পারল না। তার আগেই ওর মাথা টলে পড়ল।

কোরা কাপড়ে সাজিয়ে, ফুলচন্দনে মুড়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে ওরা জটি ঠাকুরনীকে পোড়াতে গেল। সব খরচ অনাদি ডাক্তার দিল। জটির মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনাদি ডাক্তারের প্রথমেই মনে হল, যাক্, আর নিত্য নিত্য চাল দেবার দায়-দায়িত্ব রইল না।

চালের দাম যখন তালগাছের মাথায় ওঠে তখনো অনাদি জটি ঠাকুরনীকে চাল দিয়ে পেন্নাম করতে যেত। অনাদির বউ বড় রাগ করত, বলত, 'দেবাংশী মানুষ, কিন্তু ভক্তজনের কষ্ট হয়, তা বোঝে না?'

বড় দুঃখ হল অনাদির। বলরামের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে অনাদি বলল, 'তোরা যা খাবি খাস। কিন্তু ঠাকুরনীকে চন্নন কাঠে পোড়াবি। হ্যাঁ, কাঠ শুঁকে নিবি। ফুল দিস, খই ছেটাস, পয়সা ছেটাস, কেমন? তোর বোনাইয়ের না কেত্তন দল ছিল?'

জটির মৃত্যু এখন বলরামদের কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার। মরণকালে, ঘোর বিকারে জ্বরাচ্ছন্ন মাথায় জটি যা যা বলেছে সব কিছু এখন বলরামদের কাছে দৈববাণী। তাই বলরাম বলল, 'না আইলে মাথা ছিঁড়িয়া ফালামু।'

ক্বচিৎ বলরাম এ ধরনের কথা বলে। এই কথা শুনেই ওর ভগ্নীপতি এসে হাজির হল। নামে সদানন্দ, স্বভাবেও তাই। সরকারী আপিসে পিওন ও।

'গুলি মার চাকরিতে । ক্যাজুয়াল লীভ নাই? কামাই করলে কখনো সরকারী আপিসে কাজ যায় না'।

এই কথা বলে ও কোমরে গামছা বাঁধল। মাথার চুল আঁচড়ে, গলায় কাগজের বনমালা পরে সদানন্দ আর ওর সেখোরা 'হরিনাম অঙ্গে লিখে হরিপদে যাও' গাইতে গাইতে জটি ঠাকুরনীকে নিয়ে চলে গেল।

দুই

সাধনের সাঁঝ-সকালের মা কেমন করে মানবী থেকে দেবী হল সে বড় আশ্চর্য কথা।

ওরা মেদিনীপুরের পাখমারা, ওরা যাযাবর। ওরা বলে ওরা জরা ব্যাধের বংশধর। ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল বলে ওরা অভিশপ্ত। সুদূর দ্বারকা থেকে ওদের চলে আসতে হয়েছিল।

ওদের ঘর থাকতে নেই। ওরা পাখি ধরে, পাখি বেচে। শ্মশানের গাছে রান্নার হাঁড়ি টাঙিয়ে রেখে ওরা সংসার করে। শবশয্যায় ওদের বর-বউ অবহেলে ঘুমোয়, ভালবাসে। চিতায় আগুন দেখে ওদের মনে দেহতত্ত্ব জাগে না। মা ছেলেকে সোহাগ করে, স্বামী-স্ত্রী বসে গান গায়।

মেদিনীপুরে লবণ খালাড়িতে, কাজুবাদামের বাগানে, দক্ষিণ ভারতের এমন অনেক লোক আসে, যায়, কাজ করে।

ওদের সমাজের বাইরে বিয়ে করতে নেই। কিন্তু জটির শরীরে আশ্চর্য রূপ ছিল। তামাটে রং, নীল চোখ, কটা চুল। চুল চুড়ো করে বেঁধে জটি তাতে লাল পাথরের মালা জড়াত। বড় ভাল লাগত জটির নদীর জলে মুখ দেখতে, গাঢ় নীল কাপড় পরে নিজের শরীরটি সাজাতে।

শীতকালে জটিরা তখন সুবর্ণরেখার চরে। চরের বালিতে তখন যাযাবর পাখিদের ভিড়। শরবনে ফাঁদ পেতে জটি শিস দিয়ে দিয়ে পাখি ধরত।

সেখানেই একদিন উৎসবের সঙ্গে ওর দেখা। উৎসব জাতিতে কান্দোরী। ওর জাতব্যবসা চিকনপাটি বোনা। উৎসবের তখন বছর তিরিশ বয়স। বেঁটে, বলিষ্ঠ, শ্যামল চেহারা। কাঁধ অবধি বাবরী চুল। উৎসব গান বাঁধত, গান গাইত।

জটিকে দেখে ও গান বেঁধেছিল

'ও নীল শাড়ি, আণ্ডা মেয়ে
দেখ্ চেয়ে
তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়।।'

জটির হাতে তখন জালে জড়ানো নীলকণ্ঠ পাখিটা ছটফট করছিল।

জটি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পিচ কেটে বলেছিল, 'পরাণ জ্বলে যায়! খালভরার গান শুন। দিলে তো মোর পাখিগুলান উড়ায়ে?'

'ও পাখি ধরে কি হবে সখী
মোর প্রাণপাখি
এনে ফেলে দিব তোর পায়ে
হা তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়।।'

উৎসব গেয়ে উঠেছিল।

খুব মজা লাগছিল ওর। ওদের সমাজের মেয়েগুলো তো এমন বন্য হয় না! এমন করে চোখ টানে না! মেয়েটার চোখ, ঠোঁট, নাক যেন পাথর কেটে বের করা।

'খালভরা!'

জটি গাল দিয়ে চলতে শুরু করেছিল। উৎসব লাফিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরেছিল।

'তু আমায় গাল দিলি কেন?'

'তু গান বাঁধলি কেন? আমার পাখি উড়ালি?'

উৎসব হা হা করে হেসেছিল। তারপর অতর্কিতে ওর হাত থেকে জালটা কেড়ে নিয়ে নীলকণ্ঠ পাখিটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। হতচকিত, ক্রুদ্ধ জটির ওপর জালটা ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'তু আমার পাখি। পালাবি? তু আমার প্রাণপাখি।'

জটি কাঁদতে শুরু করেছিল। তারপর জাল ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জটি। উৎসবের হাসি ওকে অনেকক্ষণ তাড়া করেছিল।

পরদিন উৎসব চলে এসেছিল ওদের ডেরায়। জটির ঠাকুমাকে গড় করে বলেছিল, 'টুকো ওষুদ দেন দেখি। বনেবাদাড়ে ঘুরি, বুকে আমার বেথা করে গো। আপোনারা তো গুণী মানুষ, ওষুদের কারবারী, তা টুকো ওষুদ দেন।'

জটি ফোঁস করে বলেছিল, 'উ খালভরাকে পেটন ওষুদ দিলে ভাল। উ মোর পাখি উড়ায়্য দিল, তা জানু?'

জটির ঠাকুমা হেসেছিল। জটিকে গাল দিয়ে বলেছিল নিজের কাজে যেতে। এ সমাজের ছেলেমেয়েকে বাইরের দিকে চাইতে নেই, নিজের সমাজে থাকতে হয়। জটির চনমনে ভাব দেখে ঠাকুমার ভয় হয়েছিল।

উৎসব ওদের ডেরায় আর আসেনি। জটির পেছন পেছন ঘুরে ঘুরে ও জটিকে নতুন নতুন অচেনা সব স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ঘরের স্বপ্ন, মাচায় ধানের ডোল, বেতের দোলায় শিশু-সন্তান। সে ঘরে জটি আয়নায় মুখ দেখে, রূপোর গয়না পরে, লাল-নীল নানা রঙের শাড়ি সে ঘরের উঠোনে মেলা থাকে।

চিকনপাটির চেয়েও মনোহারী নকশায় স্বপ্নটার জাল বুনে বুনে উৎসব জটির ওপর জালটা ফেলে দিয়েছিল।

জটি আর জাল ফেলে পালায়নি।

ওরা পালিয়ে গিয়েছিল।

খড়গপুর থেকে দীঘা। কাজুবাদামের মরশুমে দিনমজুর, মাছের মরশুমে মাছ শুঁটকি করার কাজ।

অনেকদূর না পালালে কাওয়ামারারা অভিশপ্তদের সমাজ ছেড়ে যাবার অপরাধে ওদের তীর ফুঁড়ে ফেলত।

উৎসব স্বপ্নটাকে ঠিক সত্যি করতে পারেনি। কিন্তু জটি বড় সুখী হয়েছিল। কি জীবন! শুধু দুটি রাঁধ আর খাও আর ভালবাস। হতে টাকা পেলে কাপড় কেন। কুঁচের মালা, গালার চুড়ি, রুপোদস্তার গোটা। অন্যরকম করে চুল বাঁধ, অন্য ছাঁদে কাপড় পর। এখন তো আর তুমি কাওয়ামারা নও। এখন তুমি জাতে উঠেছ, শ্রেণী বদলিয়েছ।

'মোদের জাত ফেলনা লয় জটি! মোরা পণ দিয়ে মেয়ে লিই, সমাজকে ভাত-খাসী দিই।'

'উ কথা থাক!'

জটি সভয়ে বলত, ওর শুধু মনে হত এই ঘর, এই ভালবাসা থাকলে হয়! চির অভিশপ্ত ওরা, ঈশ্বরকে যারা হত্যা করে গোড়ালিতে বাণ মেরে, তাদের বুঝি ঘুরে ঘুরেই জীবন শেষ করতে হয়।

জটি তো তা করেনি!

যদি সেই রাগে ঠাকুমা বাণ মারে! মা জটি আর উৎসবের খড়ের পুতুল তৈরি করে শলা দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে!

বড় ভয় পেত জটি, গুন গুন করে বলত, 'উদের কথা রাখ দেখি, মোর সাথে আন কথা বল।'

'তু ডর খাস?'

'খালভরা!'

মৃদুস্বরে বলত জটি। পেছন ফিরে চুল বাঁধতে বসত। একেই কি বলে জাত হারানো, নিচু থেকে উঁচুতে ওঠা? কই, গলায় তো জোর খুঁজে পেত না জটি! বলতে তো পারত না 'মর গা যা!'

মাঝে মাঝে শুধু ডুম-ডুম, ডুম-ডুম ঢোলের শব্দ শুনলে জটি চমকে উঠত।

পাখমারারা অমনি করে ঢোলে নরম চাঁটি মারতে মারতে আসে। দল বেঁধে ঘোরে ওরা, মৌমাছিদের মত এক জায়গায় চাক বেঁধে থাকে।

ঐ একসঙ্গে থাকাটা ওদের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস।

ওরা তো সামান্য নয়, ওরা যে জরা ব্যাধের বংশধর। ব্যাধ তো সামান্য নয়, সে যাকে মেরেছিল তিনি যে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান। গাঁই-জ্ঞেয়াতি-সকল মানুষ এত পাপ করেছিল, এত শাস্তি পাচ্ছিল যে মনের দুঃখে কৃষ্ণভগবান নির্জনে গিয়ে দুটো দণ্ড জিরোচ্ছিলেন। রাঙা টকটক পদ্মফুলের মত পা।

'আঙা টকটকে, পদ্মফুলের মত পা!' জটির ঠাকুমা মাথা নেড়ে নেড়ে বলত, 'সি শরঝোপ হতে দেখে উয়ার বুদ্ধি হরে গেল যেমন! দিলে টং করে বাণ মেরে! বাস! অমুনে কি হল জান?'

আকাশ অন্ধকার হল, সূর্য মুখ ঢাকল। সমুদ্র মনের দুঃখে জলের প্রাণীগুলিকে উগরে দিল। মাছের ডোঙা মারা পড়ে যারা জলের নিচে গেছে তারা অবধি প্রাণ পেয়ে কেঁদে উঠল। গোয়ালারা গাই দুইতে গিয়ে দেখে দুধের বদলে রক্ত পড়ছে। ফটফটে সকাল। কিন্তু রাতের মত কালো আকাশে তারা জ্বলতে লাগল।

তখনি সেই দৈববাণী হল।

ভগবানকে যারা মারে তাদের ঘরদোর থাকতে নেই। তাই দৈববাণী বললে, 'জারা হে জারা! ব্যাধ হে ব্যাধ! ই ভোবনে ভগবান বার বার আসে। তুমার মত একেকটা কসাই ভগবানকে বাণফুঁড়া করে। যারা ই কাজ করে, তাদের ঘরে থাকতে মানা। তুমি এখন তোমার আঁতের লোক, গাঁতের লোক লিয়ে বে-উদ্দিশা হও গা। জানলে?'

'কুথা যাই?'

'যেদিকে দু'চক্ষু যায়।'

'সামাজ লিয়ে যাব?'

'সামাজ লিয়ে যাবে লয় তো কি থুয়ে যাবে? তোমার সামাজ এখুন মাহাপাপীর সামাজ। উ সামাজে যে ছেলেমেয়েরা বিয়া দিবে তার মরণ। তা দেখ বিয়াসাদী যা হবে নিজেদের সামাজে। সামাজ ছেড় না। আর দেখ, জারা হে জারা! ব্যাধ হে ব্যাধ! মোর কণ্ঠ কানে যায়?'

'যায়।'

'আর দেখ, তুমার সামাজের প্রতিটি ছেলা বল, মেয়া বল, যেন সামাজ না ছাড়ে। তুমার পাপে উরাও তো পাপী, তাই। জন্মকালে উদের সাথে দেবতার বিয়া দিবে।'

'দিব।'

জরা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল। আহা! দ্বারকা ছেড়ে যেতে কে চায় গো! কি সুন্দর দ্বারকাপুরী! নীল সমুদ্রের তীরে কি সুন্দর সোনার চূড়ো দেওয়া ঘরদোর। জরা অবশ্য বনেবাদাড়ে থাকে, দুর থেকে দেখে, কিন্তু পরের সুখ, পরের রমরমা, দেখেই কি সুখ কম?

তারপর কি জরার কম শাস্তি হয়েছিল? গাঁতের লোক আতের লোক, পোঁটলাপুঁটলি, শিকারী কুকুর, সব নিয়ে কি কম ঘুরতে হয়েছিল?

কোথায় সত্যপুত্র, কোথায় কেরলপুত্র, কোথায় চোল, কোথায় পাণ্ড্য, শুধু ঘুরে ঘুরেই মরল জরা। ঠাঁই আর পেল না।

'হ্যাঁ! ভগবানকে বাণমারা করে এলেন মোদের দেশকে সর্বনাশ করতে। ওরে আমার চালাক শিয়াল! দ্বারকাপুরী শ্মশান করেছ, এখন আমাদের মারবে?'

জরা জায়গা আর পায় না। থিতোতে আর পারে না। এদিকে ওপরে বসে দেবাদিদেব নিশ্বাস ফেলেন। দ্বাপর যুগ যায়, কলি যুগ আসে। ঘুরে ঘুরে জরার বয়েস হল অযুত নিযুত। পায়ে গোদ হল। অঙ্গে ব্যথা। কে যেন একদিন দয়া করে বললে, 'রাঢ় জান?

বঙ্গ জান? গৌড় জান? যাও! গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশে, সেই দেশে যাও। সে দেশে সকল পাপী-তাপী-লোভী-তঞ্চক-শয়তান আশ্রয় পায়। সে দেশ কারেও ফিরায় না। সেই দেশে যাও তুমি।'

ওরা এই দেশে এল।

সমাজের মধ্যে বিয়ে, শ্মশানের শয্যায় ফুলশয্যা, শ্মশানের কলসীতে বউ ভাত রাঁধে, গাঁই-জ্ঞেয়াতির পাতে দেয়। খুব স্বাধীন ওদের মেয়েরা পুরুষরা। ওদের মেয়েদের রূপের শেষ নেই। তামাটে চুল চূড়ো করে বেধেঁ ওরা পলাকাটির মালা দিয়ে জড়ায়। ওদের চেহারায় পাথরের মূর্তির মত স্বচ্ছ সৌন্দর্য। বহু পুরুষ ওরা কুল ভাঙেনি। স্বজাতে বিয়ে করেছে। রক্তের পবিত্রতা ওদের মহাপ্রাচীন। তাই ওদের চেহারা এত সুন্দর।

কমতে কমতে, মরতে মরতে, এখন ওরা মাত্রই শ'খানেক জন আছে। কখনো ওরা দল ছেড়ে সরে যায় না।

শহরের রাস্তা ধরে, গ্রামের পথ ধরে ওরা চলে যায়, ডুম-ডুম-ডুম-ডুম ঢোলক-বাদ্য বাজিয়ে।

পাখমারা যায়! পাখমারা যায়!

শহরে ওরা পারতপক্ষে আসে না।

মাঝে মাঝে, বছরে একবার দু'বার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার আপিসে ওরা নাম লেখাতে আসে। কেউ মরে গেলে নাম লিখিয়ে রেখে যায়।

সরকারী খাতায় ওরা বুঝি সংরক্ষিত উপজাতি।

জটি তাই, এক কানে, আধেক মনে উৎসবের কথা শুনত। আরেক কানে, আধেক মনে বাজনা শুনত ডুম-ডুম-ডুম-ডুম।

ওরা যদি আসে?

মা-বাবা, পিতামহী, গাই-গাঁতের মানুষ?

যদি বলে,'চল মোদের সঙ্গে? বনে চল, সামাজে ফিরে চল?'

জটি কি করবে?

উৎসব ওর ভয় দেখে হাসত। গান বাঁধত।

'ওরে তোর মিছে ভয়।
পিরীত ফাঁদে ধরা দিতে কেন এত ভয়।'

জটি বলত, 'খালভরা!'

উৎসব বলত, 'আমার জান থাকতে তোকে ল্যায় কে? তোর উ বুনো বেটারা? তারা উৎসবকে চিনে? একবার দারোগাকে বলা করালে সব বেটাকে শায়েস্তা করে ছেড়ে দিবে।'

তবু জটির ভয় যেত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, উৎসব ওকে অনেক ভয় ভুলিয়ে দিল। জটির কোলে এল এই মোটাসোটা, একমাথা চুল এক কালোকোলো ছেলে। দেখে আর বলে দিতে হয় না এ ছেলে উৎসবের। বাপের মুখ যেন অবিকল বসানো। শুধু চোখ দুটি মায়ের মত। স্বচ্ছ, নীলাভ, টলটলে।

জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা খুব বেড়ে গেল উৎসবের। জটিকে তো ও নিজের জাতে তুলেছিল।

উৎসব মনে মনে জানে সে চিকনপাটি বোনে, সে পাখমারা-পাখধরাদের চেয়ে জাতে উঁচু। আবার এই যে এখন মজুর খাটা—এও আরেক ধাপ জাতে ওঠা।

ছেলের বাপ হয়ে উৎসবের মনে হল সে আরো উঠতে চায় জাতে। সে আর গরীব-গুরবোর বৃহৎ সমাজে থাকতে চায় না। ভদ্রলোকের ছোট্ট সমাজের এক কোনায় আসন পেতে চায়।

জটিকেও উৎসব তাই-ই বলল।

'জটি লো জটি জটেশ্বরী! বিড্ডি আপিসে যেয়েছিলাম, তা বি-ডি-ও বাবুরা কি বললে জানিস?'

'কি?'

'একুন আর কুন বাধা নাই। আমি টাকা খর্চ করে কাছারীতে যেয়ে একুনি নাম পালটাতে পারি। কান্দোরী-মান্দোরী যে শুনে সেই বুঝে জেতে মোরা ছোট গো!'

'নাম পালটাবি?'

'কেন লয়?' উৎসব কান্দোরী কেমন শুনতে? উৎসব দাশ, সাধনচন্দ্র দাশ কেমন শুনতে? তা বাদে অন্য কাজ লিয়ে বড় শওরে চলে যাস যদি, তাহলে তো কাজ সারা।'

'কেন?'

'বড় শওর জগন্নাথের ছিক্কেত্তর। সেথা ক্যাও কারো খোঁজ ল্যায় না। নাম দেখলে চিন্তা করবে এ বেটা লিশ্চয় জেতে উঁচু, লইলে নামের পিছে দাশ কেন?'

উৎসবের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আনন্দ হয়েছিল জটির। কোমরে হাত দিয়ে ও নাচতে শুরু করেছিল। 'চল, চল, তাই চল। এখুনি যেয়ে জেতে উঠি।'

উৎসব সস্নেহে বলেছিল, 'পাগলী! এখন কি? ছেলার বয়স হোক! মুখে অন্নপ্রসাদ দেই! দেব-ঠাঁইয়ে পুজো পাঠাই!'

জটির একবার মনে হয়েছিল যার পূর্বপুরুষ একবার ভগবানকে হত্যা করে, সে কি নিজের সমাজের নির্দিষ্ট দেবতা ছাড়া অন্য কাউকে পুজো করতে পারে? যদি পাপ হয়? যদি ক্ষতি হয়?

তারপর মনে হয়েছিল উৎসব ঠিকই বলেছে। সব ছেড়ে পালিয়ে গেলো, সরকারের কাছারীতে লিখে-পড়ে জাত পালটালে তাহলে আর ওর মা-ঠাকুমা ওকে ধরতে ছুঁতে পারবে না।

'তাই ভাল!' জটি চোখ বুজে বলেছিল।

পাখমারাদের পূর্বপুরুষ জরা ব্যাধকে যে দেবতা দৈববাণী করেছিলেন, তিনি হেসেছিলেন?

হল, সাধনের মুখপ্রসাদ হল। উৎসব তখন খড়্গপুর স্টেশনে মোট বয়। কুলীদের সমাজকেও ও ভাত-খাসী দিল। তারপর চোরাই বিক্রির চোলাই মদ খেয়ে বমি করে হাসপাতালে মরে গেল।

নিজের দেখানো স্বপ্ন, প্রাণভরা ভালবাসা, কণ্ঠভরা গান, সব নিয়ে চলে গেল উৎসব। জটি আবার একা। জটি এখন স্বাধীন। জটি এখন ইচ্ছে করলে যেখানে মন চায়, চলে যেতে পারে। কিন্তু দোলায় শুয়ে ঐ যে ছেলেটা কাঁদে আর মিটিমিটি চায়?

জটি বুঝতে পারল, এখন ওকে কি করতে হবে। চলে যেতে হবে ওদের সমাজে। পা

ধরে কাঁদতে হবে পিতামহীর। জটি তো জানে উৎসব মরেছে পিতামহীর বাণে। ডাক্তার যা বলুক আর পুলিস যা বলুক!

ভয়-পাওয়া পাখির মত ছেলেকে বুকে নিয়ে জটি চলে গেল ওদের সমাজে।

হা ভগবান! কোথায় ওদের গাঁই-জ্ঞেয়াতি-আঁতের মানুষ? কোথায় সেই বিচিত্রবর্ণের পোশাক, কুকুর-ছাগল গাধার পিঠে জিনিসের বোঝা, পিতামহীর খলখল হাসি?

শ্মশানে নেই, মশানে নেই, কোথাও নেই ওরা। জটি ছুটে ছুটে শহরের ট্রাইবাল বোর্ডের আপিসে গেল।

'পাখমারাদের ঠিকানা দেন মহাশয়, আপোনার ব্যাগ্যতা করি', জটি পিওনের পা ধরতে গেল।

শ্মশান-মশানে দেখ্‌গা যা! কোথা যেয়ে পড়ে আছে দেখ গা!'

জটির চোখ ফেটে জল এল। এ সমাজ ছেড়ে ও সমাজে, এ জাত ছেড়ে ও জাত, কত লোভ দেখিয়ে উৎসব তো সব স্বপ্ন কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে গেল।

জটি এখন কি করে?

অনেক রূপ, অনেক স্বাস্থ্য, অনেক যৌবন নিয়ে জটি গিয়ে স্টেশনে বসল। কোলের কাছে ছেলে। জটি গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে আর ভাবে।

জটি ভাবে ওর ছেলের কথা। আর পাঁচজন ভাবতে শুরু করল জটির কথা।

জটি এখন কি করে, কোথায় যায়? জটি গিয়ে কুলী লাইনের হনুমানতলার সন্নেসীর কাছে পরামর্শ চাইল।

'এখানে থাক্।'

সন্নেসী চোখ বুজেই বলল। প্রৌঢ় সন্নেসী। অনেক ঠাকুর-দেবতার পর এই হনুমানজীকে আঁকড়ে আছে বলে এখন ওর অবস্থা ফিরেছে খানিকটা।

জটি এসে এখানে বসবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমানতলার ভিড় বাড়তে লাগল। সন্নেসী মনে মনে প্রমাদ গনল।

কয়েকদিন বাদে তিন-চারজন লোক জটির কাছে এল। বলল, 'ঐ বুড়োর আশ্রয়ে থেকে কি হবে? চল্ আমাদের সঙ্গে। আমরা তোকে শহর দেখাব।'

মিছেমিছি জটি শিরায় শিরায় বহু বছরের প্রাচীন রক্ত বয়ে বেড়ায়নি। বন-জঙ্গল, বনের প্রাণী তার যেমন চেনা, অচেনা মানুষে তেমনি ভয় ওর।

'দূর হ, খালভরা', বলে জটি ওদের গালাগালি করেছিল।

হয়তো তারাই গিয়ে নালিশ করে থাকবে।

কয়েকদিন বাদে পুলিস এসে সন্নেসীকে শাসিয়ে গেল কড়া গলায়। বলল, 'সব খবর পাওয়া গেছে।'

'খবর, খবর কি পাবেন বাবামশায়? আমি সন্নেসী মানুষ। ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকি।'

'ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাক না ঠাকুরনী নিয়ে?'

'ছি ছি মুখ পচে যাবে তোমার...।'

'এখানে মেয়েছেলে রাখ। এখানে বজ্জাতি, বদমায়েসী হয়। মদ চোলাই হয়, তাসের জুয়া খেলা হয়।'

'সব ঝুট।'

সন্নেসীর ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

পুলিশের লোকটি গেরস্ত মানুষ। সে বলেছিল, 'কথা যে মিছে তা তুমিও জানছ, আমিও জানছি। ঐ মেয়েটার জন্যে যত গোলমাল! তা ওকে কেন সরিয়ে দাও না?'

'সরিয়ে দিলে তো ওদের খপ্পরে যাবে। ওরা তো তাই চায়।'

'তবে মরগা যা!'

পুলিশের লোক রেগে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বলেছিল, 'কেন ওসব গুণ্ডা বজ্জাতকে চটাচ্ছ? গুড় যতক্ষণ রেখেছ, ততক্ষণ মাছি আসবে। ও মেয়েটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মানুষ আসবে এখানে। ওদের তো রাজত্ব এখন। এসে যদি মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যায় তখন কোন্ বাপের সুমুন্দি এসে ঠেকাবে শুনি?'

সন্নেসী মহাচিন্তায় পড়েছিল। তবে জটি বুঝেছিল এখানে আরো থাকলে সন্নেসীর বিপদ, ওরও বিপদ।

'লাও, আমার য্যাখন সোমসার ছিল, এই বাসনকুসন। সব গচ্ছিত রাখ ঠাকুর, আমায় টাকা দাও কটা!'

'কোথা যাবি? ছেলেটা কোথা যাবে?'

'জানি না।'

'তোর কেউ নাই?'

'জানি না।'

সন্নেসী শেষে নিশ্বাস ফেলে ওকে একটা লাল চেলী কাপড় দিয়েছিল। এমন রাঙাচেলী দিয়ে বিহারের মানুষ মড়া ঢাকে।

লালচেলী আর একটা ছোট ত্রিশূল দিয়েছিল সন্নেসী। বলেছিল, 'একদিন তোকে শেয়ালে-শকুনে ছিঁড়ে খাবে তা মনে জানতে পারছি। তবু তুই এই বস্তরে-অস্তরে চলে যা মা। এ ঘোর কলিতেও থাড় কেলাসে সাধুসন্নেসী চলে যেতে পারে, কেউ মাথায় পা দেয় না।

'যদি শুধায় কিছু?'

'বলবি আমি জটি ঠাকুরনী।'

'ঠাকুরনী?'

'আহা বলবি, বলতে মানা কি?'

'ঠাকুরনী!'

সত্যিই ট্রেনে কেউ কিছু বলেনি জটিকে। ওর রূপ, রাঙা কাপড়, পিঠের পোঁটলায় ছেলে, হাতে ত্রিশূল দেখে সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

জটি জানলা দিয়ে চেয়ে ছিল বাইরের দিকে। দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল ওর। এই তো মানুষ ওকে মান্য দিল, সমীহ করল। এরই নাম কি জাতে ওঠা? আহা উৎসব যদি থাকত, তবে দেখতে পেত কাছারী নয়, আদালত নয়, শুধু একখানা কাপড় আর ত্রিশূলের জোরে জটি কেমন জাতে উঠে গিয়েছে।

আরেকটি লোক ওকে লক্ষ্য করছিল। লোকটি ট্রেনে গান গায়, কখনো শ্যামা সঙ্গীত, কখনো হরিনাম। লোকটি বয়স্ক, রোগা, সংসারে ওর কেউ নেই।

জটিকে দেখে ও বলেছিল, 'হাওড়া তো পৌঁছলে বাছা। এখন যাবে কোথা ?'

জটি কথা বলেনি।

জটি চোখ বড় বড় করে হাওড়া স্টেশন, জনারণ্য দেখছিল। এই বুঝি সেই ছিক্ষেত্তর। যার কথা উৎসব বলেছিল! এত মানুষ এখানে, অসংখ্য, অগণন। জঙ্গলে বুঝি একটা গাছে এত পাতা নেই। এত মানুষের মধ্যে জটি কোথায় যাবে ?

'বলি যাবে কোথা ?'

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করেছিল।

জটি বলেছিল, 'তা তো জানি না।'

লোকটি বলেছিল, 'আমার সঙ্গে যাবে ?'

'কুথা ?'

জটি ওকে ভয় পায়নি। তখন জটির ভেতরে সেইসব আদিম সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করছে। মানুষ দেখলে ও পলকে বোঝে কাকে ভয় করবার, কাকে ভয় করবার নয়। এই লোকটিকে দেখে ওর ভয় হয়নি। তাছাড়া সামনের আশ্চর্য সব দৃশ্য ওর চোখ টেনে বাখছিল।

'আমার সঙ্গে।'

'কুথা গো কুথা ?'

'আমার বাসা। আমি গাড়িতে গান গাই।'

'গান গাও ?'

'হ্যাঁ গো!'

লোকটি বুঝিয়ে দিয়েছিল সব। গান গেয়ে ও ভিক্ষে করে। যদি জটি সাধনকে কোলে নিয়ে ওর সাথে-সঙ্গে ঘোরে তাহলে ভিক্ষে পাওয়া সোজা হয় আরো।

'তুর ঘর কুথা ?'

'তু মু বলিস না বাপু, যাবি তো চল।'

বেশ চলল এক বছর। জটি সঙ্গে থাকে, লোকটি গান গায়। পয়সা নিয়ে বাসায় গিয়ে সন্ধেবেলা জটি চাল কিনে ভাত রাঁধে, লোকটি দাওয়ায় শোয়, জটি ঘরে ঘুমোয় দোর আটকে।

'সাধন রে সাধন! বাপো রে বাপো!'

জটি বন্য আদরে ছেলেটাকে অস্থির করে দেয়। তাছাড়া স্টেশনের কাছাকাছি নেপালী ও ভোটবুড়ীদের মালা-তাবিজ-শেকড়-পাখির পা-ব্যাঙের ছাল বেচতে দেখে ওরও শহুরে বুদ্ধি হয়েছে।

যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ গো, তুমি সাধ্নী হয়েছ। তা গেঁটে বাতের টোটকা কিছু জান ?'

জটি মুখ ভেংচে গালি দেয় না। পিতামহীর কাছে দেখা টোটকাটুটকি মনে আনতে চেষ্টা করে, মাঝে মাঝে ওষুধ দেয়।

বেশ চলছিল, বেশ চলে যেতে পারত, কিন্তু লোকটি একদিন দাওয়া ছেড়ে ঘরে এসে

ঘুমোতে চাইল। কতদিন আর দাওয়ায় ঘুমোতে পারে ও? জটি কেমন করে জানবে দাওয়ায় ঘুমোবার কষ্ট কত?

জটি ত্রিশূলটা তুলে ধরল। বলল, 'জানু আমি কে? কুন সামাজের মিয়ে? জানু মোর বাপ কে, মা কে, গাঁতি-জ্ঞেয়াতি আঁতের মনিষ কে? তু আমায় কুপস্তাব করিস? বাণ মেরে মেরে ফেলাব না!'

পরদিনই জটি চলে এল আশ্রয় ছেড়ে। অনেক ভেবে চিন্তে ও ঠাকুরনী হল। ঠাকুরনী না হলে জটি ওর হাবা ছেলেকে বাঁচাতে পারত না। নিজেকে বাঁচাতে পারত না মানুষের নজর থেকে।

জটি বুঝেছিল অলৌকিকতা দিয়ে নিজের চারদিকে বর্ম না আঁটলে নিজেকে ও বাঁচাতে পারবে না।

'সোন্দর মুখের মরণ!' জটি অস্ফুটে বলল।

তিন

'সাধন! এখন তো তোমায় ছরাদ্দ করতে হবে বাপ।'

পাঁচজন এসে বলল।

'করব হে পাঁচজন। মা-কে আমি হাতী দিব, ঘোড়া দিব, ভুঁই দিব, সোনা দানা দিব। কিরে কেড়েছি।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সাধনের কথা পাগলের প্রলাপ। কিন্তু সাধন যে কিরে কেড়েছে তাও তো মিথ্যে নয়।

তাছাড়া, জটি তো সামান্য মানুষ ছিল না। সে যে ঠাকুরনী, অলৌকিক, আধিভৌতিক জগতের দোরধরুনী।

'কি যে করলি সাধন! তুই যে বললি তা কত টাকার খেলা তা জানিস?' বলরাম গভীর আন্তরিকতায় বলল।

'কিরে কাড়লাম যি।'

'এখন যা, ভিখ মাঙতে যা। দোরে দোরে ভিখ মেগে আয়।'

সাধন গলায় কাছা নিয়ে ভিক্ষে করতে বেরুল।

মা নেই, এখন আর কেউ সন্ধে হলে তপ্ত ভাত রাঁধে না। শোলমাছ পুড়িয়ে ছাল ছাড়িয়ে, আদার রস, লেবুর রস, লঙ্কা, লবণ, তেল দিয়ে মেখে বলে না 'বাপো, মোর কুলের কাছে বসে খাও।'

চোখে জল, গলায় কাছা, কোমরে ছেঁড়া কম্বল, সাধন ভিক্ষে করতে গেল।

কেউ দিতে চায় না। ঘুরে ঘুরে, পায়ের নড়া খসিয়ে সাধন একুশটি টাকা পেল। আর এক পালি চাল। এক পালি চাল দিয়ে অনাদি ডাক্তার জটির সঙ্গে জন্মের সম্পর্ক কাটাল।

অবশেষে বলরাম গেল কালীঘাট। সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে হতভাগ্য চেহারার এক পুরুতকে সাষ্টাঙ্গ পেন্নাম ঠুকে বলল, 'বড় বিপদ ঠাকুর। আমার নয়, আমার বন্ধুর। এমন একটা উপায় বাতলাও দেখি, সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে।'

'কেমন করে? বলি বিপদটা কি?'

বিপদের বহর শুনে তো বামুন হেসে বাঁচে না। বলরাম বললে, 'আপনারা তো চিরটা কাল মধুর ঠাঁইয়ে গুড় দেন। সোনার ঠাঁইয়ে পাঁচসিকা। দেখুন দেখি শাস্তরে কোন বিধান আছে কিনা।'

বামুন নাকে নস্যি টিপে বলল, 'মূল্য ধরে দেবে, বলি তা পারবে তো?'

'কত মূল্য?'

'ধর গা একশো টাকা!'

'একশো টাকার যোগাড় যদি থাকবে, তবে তোমার মতো পাঁচসিকের বামুনের কাছে আসি?'

'আশি টাকা?'

বামুন লোভাতুর চোখে চাইল। এই সময়ে ইস্কুরুপ আঁটলে ক'টা টাকা আসে। কিন্তু কোন্ সাহসে বামুন দর কষবে? কালীঘাটের বামুন এখন উপোসী ছারপোকা। পাঁচ টাকা হাতে পেলে সসাগরা ভারতভূমি দান করিয়ে দেবে। বলরাম একটু ভেবে নিল। যাওয়া-আসার খরচ, একটু নেশার খরচ, কত কাটবে, কত রাখবে। তারপর, কড়া গলায় বলল, 'দেখ ঠাকুর, তোমার হাতে আমি আঠারোটি টাকা দেব। কাজটি তুমি করিয়ে দেবে। নচেৎ আমি অন্য ঠেঁয়ে চললাম। পয়সা ফেললে পুরুতের অভাব? গুড় ছড়ালে পিঁপড়ে আসে না? 'হ্যাঁ' বলবে না 'না' বলবে ভেবে দেখ। আমার হাতে টাইন কম। তোমার সঙ্গে কেজে-কোঁদল করতে আমার টাইন নেই।'

'নিয়ে এস তোমার বন্ধুকে। তা বাবা, মার্কণ্ডের কাপড়, পিত্তিপুরুষের কাপড়, ঘি, ফুল, কাঠ, তিল, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য—সব তোমরা আনবে তো?'

'ও রে আমার চালাক মাধাই! তাই যদি আনব তবে আর তোমার ময়লা গামছার গন্ধ শুঙতে আসি?'

বলরাম সাধনকে নিয়ে এল।

সব যোগাড় করে রেখেছিল পুরুত। পুরুতের বাড়ির বারান্দায় বসেছিল সব যোগাড় করে।

'দক্ষিণ মুখে বস বাপ!'

পুরুত খনখনে গলায় বলল। ও পাশে ছাঁটা চুল, লাল চোখ, ছাতার মতো ভূষোরঙের একটা লোক বসে আছে।

'উটি অগ্রদানী। দান নেবে।'

অগ্রদানী চোখ খুলে বলল, 'লাও দেখি মামা! হাজার টাকার ছরাদ তো? দশ মিনিটে সেরে দাও দেখি, একবার চাকদা যেতে হবে।'

'এই তো! নাও বাপু, আচমন কর।'

আচমন হল। শ্রাদ্ধ শুরু হল। একেকটা জিনিস সাধনের হাতে ছোঁয়ায় পুরুত আর বিদ্যুৎবেগে কেড়ে নেয়। আঠারোখানা একটাকার নোট নিয়ে বলরাম বসে আছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল প্রেতক্রিয়া। একখানা চার আনার গামছার একেকটা সূতো ছিঁড়ে সাধন অজানা সব লোক ও লোকাতীতকে অজস্র বস্ত্র দান করল। তারপর পুরুত বলল, 'বল, মা-কে কি দিতে চেয়েছিলে?

'এঁগ্যে, হাতী!'

'লাও বাপ, পাঁচসিকা ফেল। ইটিও তোমার হাতীদানের পুণ্য হল, জানলে? বিকল্পে মূল্য ধরলে, এই ভাবে দান করা চলে, জানলে?')

বলরাম কাগজে লিখলে হাতী, তার পাশে লিখলে পাঁচসিকে।

সাধনের মুখ এখন বিহ্বল, বিমূঢ়। এ কি আশ্চর্য কথা! পাঁচসিকে মূল্য ধরে দিলে প্রতিশ্রুত গজদানের ফল হয়? এমন জানলে কি সাধন...

'পাঁচসিকা ধর, অশ্বদান হল।'

তখন অদ্ভুত এক প্রতিযোগিতা শুরু হল। সাধন বলে অশ্ব-ভুঁই-সোনা-ধান-বস্ত্র-তৈজস। পুরোহিত বলে পাঁচসিকা—পাঁচসিকা। বলরাম শুধু দেখে এই অপরিমিত দান-যজ্ঞ আঠারো টাকার মধ্যে থাকছে কিনা।

'বামুনকে গো-দানটা পাঁচ আনায় সেরে দেন ঠাকুরমশায়,' বলরাম হেঁকে বলল।

প্যাঁকাটির ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে অগ্রদানী বলল, 'পাঁচ আনায় গাই-গরু হয়?'

'না হলে মামা-ভাগ্নাকে আঙুল চুষে মরতে হবে। দক্ষিণা দিতে হবে না?'

সাধনের পরনে মা-র একখানা ছেঁড়াখোঁড়া লাল চেলী। সাধনকে দেখতে এখন ক্ষ্যাপা মোষের মতো। প্যাঁকাটির আগুনে মাটির এতটুকু খুরিতে কয়েক দানা চাল সেদ্ধ করা হয়েছে, শ্রাদ্ধান্ন। ভাতের গন্ধ নাকে যাওয়াতে সাধন এখন ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে।

'লেঃ সাধন, আচমন করে বামুনকে পেন্নাম ঠুকে উঠে পড়।'

সাধন উঠে পড়ল। সাধনের চোখ মাটির দিকে। সাধনের গামছায় বাঁধা অনাদি ডাক্তারের দেওয়া এক পালি চাল। চালটা বামুন সবটা রাঁধল না কেন? চালটা তো মাকেই দেওয়া হল, তাহলে কয়েক দানা রাঁধবার অর্থ কি? সাধনের সন্দেহ হল। নাক দিয়ে ঘোঁত করে শব্দ করল ও।

'তুই ব্যাটা আমার হাতে আঠারো টাকা ধরিয়ে দিয়ে হরিশ্চন্দোর হয়েছিলিস? রামচন্দোর হয়েছিলিস?'

বলরাম হাসতে গিয়ে থেমে গেল। সাধন উপুড় হয়ে পড়েছে, চাল গামছায় বাঁধছে।

'কর কি, কর কি বাপ? ও চাল যে আমার পাওনা।'

'চুবো শালা!'

সাধন বামুনকে গাল দিল। এই বামুন না ওকে দিয়ে জটি ঠাকুরনীকে অগাধ, অতুলন ঐশ্বর্য দান করিয়েছে? জটি ঠাকুরনী না এখন সোঁ সোঁ করে স্বর্গে যাচ্ছে? যে দেবতাকে ওর পূর্বপুরুষ মেরেছিল, তারই পায়ের কাছে? গোলকধামে? সাধন সব ভুলে গেল কেন?

'সাধন, কি করিস?'

'চাল লিয়ে যাই, ভাত আঁধব!'

'আরে ও ছরাদের চাল রে, তোর খেতে নাই!'

'চুবো বলরাম!'

মত্ত হাতীর মতো চেঁচিয়ে উঠল সাধন। বলল, 'ঘরে কানাকড়ি লাই যে চাল কিনে আঁধব। ই চাল আমি হাতছাড়া করি!'

'বেটা মূর্খ, গজমূর্খ!'

'চাল আমার! বলরাম! আমার পাছু আসিস না।'

পুরুত নিষ্ফল আক্রোশে বলল, 'শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে রেঁধে খাওয়া? এ শ্রাদ্ধ তোর নষ্ট হল ব্যাটা!'

'কেন নষ্ট হবে, আমি হাতী দিই নাই? গরু দিই নাই? সোনা-রূপা, বস্ত্র দিই নাই? কোন শালা আমার মায়ের ছ্রাদ নষ্ট করে শুনি?'

বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাঁধবে।

ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ-সকালেব মা বাঁধা থাকবে।

মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনেব চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না। □

বাঁয়েন

ভগীরথ যখন খুব ছোট তখনি ওর মা চণ্ডীকে বাঁয়েনে ধরেছিল। বাঁয়েনে ধরবার পরে চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে দিল। বাঁয়েনকে মারতে নেই, বাঁয়েন মরলে গাঁয়ের ছেলে-পিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে, বাঁয়েনে ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

তাই চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে রেলের ধারে চালা তুলে দিল।

ভগীরথ বড় হয়েছে অন্য মা-র কাছে, অন্য মা-র আদরে-অনাদরে। নিজের মা কাকে বলে ভগীরথ জানে না। শুধু মাঠের ওপারে ছাতিম গাছের নিচে একটা চালা ঘর দেখেছে, শুনেছে এখানে চণ্ডী বাঁয়েন একলা থাকে।

কখনো মনেও হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কারো মা হতে পারে। দূর থেকে দেখেছে ঘরের মাথায় লাল নেকড়ার ধ্বজা, মাঝে মাঝে দেখেছে উদ্‌ভ্রান্তের মত ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের চষা দুপুরে লালকাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর।

বাঁয়েন যখন যায় তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বাঁয়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা পুরুষকে দেখে তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে।

তাই বাঁয়েনকে একলা থাকতে হয়। বাঁয়েন যাচ্ছে জানলে যুবা বুড়ো সব পথ ছেড়ে সরে যায়।

একদিন, শুধু একদিন ভগীরথ তার বাবা মলিন্দরকে বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল।

—চক্ষু লামা ভগীরথ, ওর বাবা ধমকে বলেছিল।

বাঁয়েন পা টিপে টিপে পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভগীরথ এক পলক দেখেছিল পুকুরের জলে লাল কাপড়, তামাটে মুখ, জটাবাঁধা চুল।

দেখেছিল দুই চোখে কি ক্ষুধিত দৃষ্টি, যেন ভগীরথকে চোখ দিয়ে মেরে ফেলবে।

না, ভগীরথের মুখের দিকে চায়নি বাঁয়েন। ভগীরথ যেমন করে কালো জলে বাঁয়েনের লাল ছায়া দেখেছিল, বাঁয়েনও ঠিক তেমনি করেই ভগীরথের ছায়াটাকে দেখেছিল। ভগীরথ শিউরে উঠে চোখ বুজেছিল, বাবার কাপড় চেপে ধরেছিল।

—কেন এসেছিস ? ভগীরথের বাবা হিসহিসিয়ে উঠেছিল ।

—মোর মাথায় তেল লাই গঙ্গাপুত্ত, ঘরে কেরাসিন নাই। একলা মোকে ডর লাগে গো!

বাঁয়েন কাঁদছিল, চণ্ডী বাঁয়েন। জলের ওপর ওর ছায়া-চোখে জল পড়ছিল।

—কেন, এ শনিবার বারের ডালা দেয় নাই ?

শনিবার শনিবার ডোমপাড়ার একজন বারের ডালা নিয়ে যায়, চাল, ডাল, লবণ, তেল নিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের কাছে রেখে ছাতিম গাছকে সাক্ষী রেখে বাঁয়েনের বারের ডালা দিলাম গো বলে ছুটে চলে আসে।

—কুকুর খেয়ে দিলে।

—টাকা লিবি? টাকা লে।

—আমায় কে জিনিস বিচবে .

—দেব, আমি কিনে দেব, তুই এখন যা!

—আমি একলা থাকতে পারি না।

—তবে বাঁয়েন হলি কেন? যা বলছি!

ভগীরথের বাবা পুকুর পাড় থেকে একদলা কাদা তুলেছিল।

গঙ্গাপুত্ত, এ খোকাটা কি....

একটা বিশ্রী গালি দিয়ে ভগীরথের বাবা কাদার দলাটা ছুঁড়ে মেরেছিল। তখন পালিয়ে গিয়েছিল চণ্ডী বাঁয়েন।

—বাবা, তুমি বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে?

ভীষণ ভয় পেয়েছিল ভগীরথ। বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে তার মৃত্যু অবধারিত। ভগীরথের মনে হয়েছিল ওর বাবা মরে যাবে আর বাবা মরে যাওয়ার কথা ভাবলেই ভগীরথের মনে হত মাথায় বুঝি বাজ ভেঙে পড়ল, বাপ মরলে সৎ-মা যে তাকে তাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

—এখন বাঁয়েন বটে, কিন্তু উ তোর মা।

বাবা আশ্চর্য গম্ভীর গলায় কথাটা বলেছিল। গলার কাছটায় ডেলা আটকিয়ে গিয়েছিল ভগীরথের। মা! বাঁয়েন কারো মা হয়! বাঁয়েন কি মানুষ? বাঁয়েন তো মাটি খুঁজে মরা ছেলে বের করে, আদর করে, দুধ খাওয়ায়, বাঁয়েনের দৃষ্টিতে একটা গোটা গাছ অব্দি চড়চড়িয়ে শুকিয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তো একটা জল-জীয়ন্ত ছেলে। সে কেমন করে বাঁয়েনের পেটে জন্মাল? ভগীরথ ভেবে পায়নি।

আগে মানুষ ছিল, তোর মা ছিল।

—তোমার বউ?

—আমার বউ।

মলিন্দর কি ভেবে যেন নিশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল—তোরে সব বলে যাব ভগীরথ, তোর কোন ভয় লাই।

ভগীরথ অবাক হয়ে ওর বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে আল হাঁটছিল। মলিন্দর গঙ্গাপুত্রের গলায় এমন স্বর ও কখনো শোনেনি। শধু ডোম নয় ওরা, শ্মশানের ডোম, শ্মশানে এখন মিউনিসিপ্যালিটি শধু একজন ডোম থাকতে দেয়। ভগীরথরা বাঁশবেতের কাজ করে, সরকারী মুরগী খোঁয়াড়ে কাজ করে, ময়লা ফেলে সারমাটি করে। একা মলিন্দর ছাড়া এ অঞ্চলে কোন ডোম নাম সই করতে জানে না। সেইজন্য মলিন্দর কিছুদিন আগে মহকুমার লাশঘরে কাজ পেয়েছে।

সরকারী কাজ। মলিন্দর গঙ্গাপুত্র লিখে বেয়াল্লিশ টাকা মাইনে নেবার কাজ। ভগীরথ জানে বাবা মাঝে মাঝে বেওয়ারিশ মড়া চুন আর ব্লিচিং পাউডারে পচিয়ে হাড় বের করে। হাড়, যদি গোটা মানুষের হাড়, নয়তো খুলি, নিদেনপক্ষে পাঁজরা খাঁচাটা পাওয়া যায়, তাহলে অনেক লাভ।

সরকারবাবু কলকাতার হবু ডাক্তারদের কাছে খুলি-হাড়-কঙ্কাল মোটা লাভে বেচে দেয়। বাবাকে দশ-পনের যা দেয় তাতেই বাবা খুশি। এই উপরি টাকা সুদে খাটিয়ে খাটিয়ে বাবা কয়েকটা শুয়োর কিনেছে।

মলিন্দর গায়ে পিরান পরে, পায়ে জুতো পরে মহকুমা যায়, পাড়ায় ও সম্মানী মানুষ।

সেই মলিন্দর চোখ লাল করে অনেকক্ষণ চণ্ডী বাঁয়েনের ঘরের ওপরে গেরুয়া আকাশের কপালে এতটুকু একটা সিঁদুর-ফোঁটার মত লাল নেকড়ার নিশানটুকুর দিকে চেয়েছিল। বিড়বিড় করে বলেছিল—আঁধারের ডর খায়, অন্ধকারে থাকতে লারত তারেই বিধাতা বাঁয়েন করে ছাড়ল? এখন মলে বাঁয়েন শান্তি পায়, কিন্তু বাঁয়েন নিজে না মরে তো কেউ ওর জান নিতে লারবে, জানু বাপু?

খুব দুঃখু না পেলে মলিন্দর এত কথা বলে না।

—কে মানুষকে বাঁয়েন করে বাবা?

—বিধাতা।

মলিন্দর ভাল করে চেয়ে দেখেছিল ভগীরথের আশ-পাশ দিয়ে দুপুরের রোদে কোন ছায়া চলেছে কিনা? বায়েনরা ঠিক হাট-বাজারের ফুল, গোলাপ, মাখনবালার মত, নানা ছলাকলা জানে। ধর কোন ছোট ছেলেকে বাঁয়েন নিতে চায়, সে যখন হেঁটে যাবে চারদিক রোদে পুড়লেও তার মুখে ঠিক ছায়া থাকবে। অদৃশ্য হয়ে বাঁয়েন আঁচলের ছায়া ধরে ছেলেকে আড়াল করে নিয়ে যবে। ছেলেটা মরে গেলে কেউ যদি দোষ দেয় তাহলে বাঁয়েন মুচকি হেসে বলবে—তা কি জানব বল? খর রোদ দেখে এট্টু ছেঁয়া দিতে গেলাম তা তোমার ঠোকাটা যেনু ননীর পুতুল। এট্টু তাতে মরে গেল?

ভগীরথের আশেপাশে কোন ময়লা গন্ধওঠা লালচে আঁচলের ছায়া দেখতে না পেয়ে মলিন্দর যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বলেছিল—তোর কি ভয় বাপ? তোর কুনো অনিষ্ট উ করবে না।

তবু ভগীরথ ভরসা পায়নি।

শুধু ঐদিকে মন চলে গিয়েছিল ওর। ধানক্ষেতে যাক, গরু নিয়ে যাক, কেবল মনে হত, রেললাইন ধরে ছুটে চলে যায় ওখানে। গিয়ে দেখে আসে একলা থেকে থেকে বাঁয়েন কি রকম ভয় পায়। দেখে আসে বাঁয়েন মাথায় তেল মেখে চুলের জল কেমন করে চৈত্রী বাতাসে শুকোয়।

যেতে পারত না ভগীরথ, ভয় পেত।

মনে হত যদি আর না ফিরতে পারে কোনদিন? যদি ওখানেই ভগীরথকে একটা গাছ করে, একটা পাথর করে রেখে দেয় বাঁয়েন?

কয়েকদিন ভগীরথ শুধু চেয়ে দেখত।

দেখত ছাতিমগাছ আর চালাঘরের মাঝামাঝি আকাশটা যেন কার কপালের মতন। সেই কপালে এক ফোঁটা সিন্দূর-টিপের মত লাল নেকড়ার নিশানটা কখনো স্থির হয়ে থাকে, কখনো দোলে। মনে হত ছুটে চলে যায় একবার, আর পাছে ছুটে যায় সেই ভয়ে উলটোদিকে ছুটে ভগীরথ বাড়ি চলে আসত।

আশ্চর্য, বাঁয়ানের ছেলে বলে ওকে কেউ হেনস্তা করত না, বরঞ্চ বেশি খাতির করত। বাঁয়েনের ছেলেকে খাতির করলে বাঁয়েন সে কথা জানতে পারে। সে ভাল খাতির দেখায়।

তার কচিকাঁচা ভাল থাকে। যে দূর ছাই করে তার ঘরে শুধু মরতেই থাকে ছেলেপুলে।

ভগীরথের এখানকার মা-ও কিছু বলেনি। সতীনের ছেলের ওপর ওর অনুরাগ আছে, না বিরাগ, দ্বেষ না ভালবাসা, তার কোনটাই ও কোনদিন প্রকাশ করেনি। তার প্রধান কারণ ওর নিজের ছেলে নেই। গৈরবী আর সৈরভী দুটো মাত্র মেয়ে। পুত্রসন্তান না থাকলে স্বামীর ওপর জোর থাকে না। তাছাড়া এখানকার মা-র ওপরের ঠোঁট ফাঁক, মাড়ি বের করা। বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না বেশি। বলে—কুন মুখ দেখাতে যাব সি বল দেখি? মুখ মোটে বুজে না যি। না হাসলেও মনে হয় মাগী হাসতেছে। দেখ গঙ্গাপুত্র, মলে পরে মুখখানা গামছা দিয়ে ঢেকে দিও—জানলু? লইনে মানুষ বলবে দাঁতী ডোমনী চলল।

যশি শুধু কাজ করে, ঘর নিকোয়, ভাত রাঁধে, কাঠ কুড়োয়, গোবর চাপড়া দেয়, শুয়োর তাড়ায়, মেয়েদের মাথার উকুন বাছে, ভগীরথকে 'বাপ' বলে কথা বলে, খেতে এস বাপ, লাইতে যাও বাপ, যেন ওদের মধ্যে কুটুমের সম্পর্ক, বাঁয়েনের ছেলেকে যত্ন-আত্তি না করলে বাঁয়েন তার মেয়ে দুটোকে বাণ মেরে দিতে পারে। যশি জানে। আরো জানে, একদিন ভগীরথের ভাতের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে।

মাঝে মাঝে মাড়ি বের করেও সভয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, কে জানে ভর দুপুরে বাঁয়েন ওর মেয়ে দুটোর কথা মনে করে মাটি দিয়ে পুতুল গড়ছে কিনা, বাণ ফুঁড়ছে কিনা। তখন যশিকে যত কুচ্ছিত তার চেয়েও কুচ্ছিত দেখায়। অনেক দুঃখে মলিন্দর ডোমপাড়ার সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটিকে সাঙা করেছে। কয়েকটা গাঁয়ের ডোমপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি বাঁয়েন হয়ে যাবার পর মলিন্দর আর রূপসী মেয়ে দেখতে পারে না।

মলিন্দর বউকে নাকি খুব ভালবাসত।

হয়তো সেই ভালবাসার কথা মনে করেই একদিন মলিন্দর ভগীরথকে চণ্ডী বাঁয়েনের কথা বলল! দুজনে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। মলিন্দরের হাতে মাংসের পোঁটলা, এই এক আশ্চর্য দুর্বলতা মলিন্দরের, নিজের হাতে পালা শুয়োরগুলোকে ও কাটতে পারে না। শুয়োর পোষে, বড় করে, তারপর কাটবার দরকার হলে গোটা শুয়োরটা কাউকে বেচে দেয়। যে কেনে সে মলিন্দরকে একটু মাংস দেয়।

—এট্টু গাছের ছেঁয়ায় বসি?

যেন তের বছরের ছেলের অনুমতি নিল মলিন্দর, বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ভগীরথ জিগ্যেস করল—এখান হতে ডাকাতরা যায়, না কি বাপ?

ভগীরথ এখন বুনিয়াদী ইস্কুলে যায়। এই সরকারী স্কুলের দেয়ালে ওদের মাস্টারমশাই এক সময়ে দেয়াল-পত্রিকা লিখিয়েছিলেন ছেলেদের দিয়ে। নিজে হরফগুলি লিখে এনেছিলেন। ভগীরথ সেগুলি কালি দিয়ে ভরেছিল। সেই লেখাটি পড়ে ভগীরথ জানতে পেরেছিল উনিশ শো পঞ্চান্নর অচ্চুৎ আইনের পর থেকে ওরা কেউ আর অচ্চুৎ নয়।

জেনেছিল ভারতীয় সংবিধান বলে একটা জিনিস আছে, তার প্রথমেই একটা মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে, তারা নাকি সবাই সমান।

দেয়াল-পত্রিকাটা এখনো টাঙানো আছে। কিন্তু ভগীরথরা জানে সহপাঠীরা বা মাস্টাররা ওদের একটু দূরে বসাই পছন্দ করেন। এই ইস্কুলে অন্য জাতের ছেলেরা নেহাত গরীব বা অপারগ না হলে আসে না। আসবে কেন? এখন চারদিকে ইস্কুল।

যা হোক, ভগীরথ এখন একটু অন্য রকম ভাষায় কথা বলে। মলিন্দর ওর কথা শুনতে ভালবাসে ও ভগীরথের পাশে প্রায়ই ওর নিজেকে এক অযোগ্য বাপ বলে মনে হয়।

ভগীরথ ডাকাতদের কথা জিগ্যেস করল।এখন এই সোনাডাঙা পলাশী, ধুবুলিয়া জায়গায় জায়গায় সন্ধ্যার ট্রেনে ডাকাতি খুব বেড়ে গিয়েছে। ডাকাতি সবাই করে বলতে গেলে। ভদ্রলোক গরীব ছাত্র কলোনির বাসিন্দে পাকা বাড়ির মালিক—নানা রকম পরিচয় তারা বাইরে দেয়, কামরায় ওঠে। তারপর ঠিক সময়ে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেয় অন্ধকার মাঠে। অন্ধকার থেকে সেখোরা আসে। তারপর সবাই মিলে যা পারে নিয়ে থুয়ে মেরে ধরে চম্পট দেয়। বিশেষ করে এই বটগাছটা সন্ধ্যের পর বড় ভয়ের হয়ে উঠেছে।

তাই ভগীরথ ডাকাতের কথা জিগ্যেস করল। মলিন্দর কিন্তু সে কথা বিশেষ গায়ে মাখল না। শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আকাশে ও মাঠে কি যেন খুঁজল, তারপর বলল—আমি আগে নিমায়া-নিদায় ছিলু জানলু বাপ! তোর মা ছিল তুষু তুষু ফ্যানেকে কানত। বিধেতার বিচার!

যেন ভগবানই একদিন ডোমপাড়ায় এসে পাশা উল্টে দিলেন। চণ্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন, নিষ্ঠুর নির্দয় শিশুহন্তা। আর মলিন্দর হয়ে গেল তুষুপ্রাণ। হতেই হবে।

একজন যদি অমানুষ হয়, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অলৌকিক জগতের অদৃশ্য দরজা খুলে ঢুকে যায়, তাহলে আরেকজনকে মানুষের মত মানুষ হতেই হবে।

ভগীরথ এই সময়ে বুঝতে পারল, ওর বাবা ওকে কিছু বলেতে চায়। ভগীরথ একটু আশ্চর্য হল। সেই একদিন বাবা বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলেছিল আর বলেনি। আজ আবার বাঁয়েনের কথা কেন?

মলিন্দর ভগীরথের হাত চেপে ধরল। বলল—ভয় কি? সবাই জানে আর তুই তোর মায়ের বিত্তান্ত জানবি না?

ওরা গঙ্গাপুত্র। ওরা ডোম, মলিন্দর বাঁশ বইত, কাঠ কাটত আর চণ্ডীর ছিল কাঁচা ভাগাড়ের কাজ।

ওর বংশগত উত্তরাধিকার। এই গ্রামের উত্তরে বিলের ধারে বটগাছতলে কাঁচা ভাগাড়। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মরলে এখন পোড়াতে হয়, তখন সবাই পুঁতে দিত। ঐ ভাগাড়ে চণ্ডীর বাবা খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ত, কাঁটা গাছ দিয়ে গর্ত ঢেকে রাখত, শেয়াল তাড়াত। হই হই হইয়া...ওর প্রমত্ত কণ্ঠের ভয়ঙ্কর ডাক রাতে বিরেতে হরদম শোনা যেত।

শুধু মদ আর গাঁজা খেত চণ্ডীর বাবা। আর শনিবার একটা ডালা হাতে গাঁয়ে বেরুত। বলত—আমি আপোনাদের সেবক গো, আমি গঙ্গাপুত্ত, আমার ডালাটা দিয়ে দেন গো।

সবাই ওকে ভয় পেত। ওর চোখ থেকে ছোট ছেলেমেয়েকে সরিয়ে রাখত। একটাও কথা না বলে ওকে ভিক্ষা দিয়ে চলে যেত।

একদিন একটা ফর্সা মেয়ে, কটা চোখ, লালচে চুল, এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—আমি চণ্ডী, অমুক গঙ্গাপুত্তের বিটি, বাপ মরে গেল। বাপের ডালা এখন মোকে দেন।

—বাপের কাজ তুই করবি ?

—করব।

—তোকে ভয় লাগে না ?

—মোর ভয়ডর নাই।

এই ভয়ডরের কথাটা চণ্ডী বুঝতে পারত না। ছেলে মেয়ে মরলে মা বাপ কাঁদে, সে শোকের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু মরাকে কি কেউ বাড়িতে ধরে রাখে, না রাখতে পারে ? তার সৎকার করাটা তো চণ্ডীর কাজ ; অন্যত্র জীবিকা। এতে ভয়ের কি আছে, নিষ্ঠুরতাই বা কি ? যদি থাকে সেও তো বিধাতার নিয়ম ? সে নিয়ম তো গঙ্গাপুত্ররা তৈরি করেনি ? তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ, কেন ভয় পায় ?

এই চণ্ডীকে মলিন্দর বিয়ে করেছিল। তখনো মলিন্দর সরকারবাবুর সঙ্গে হাড় বেচার কাজ করত। গো-ভাগাড়ের হাড় থেকে সার হয়, সে হাড়েরও দাম আছে। হাতে পয়সা ছিল মলিন্দরের, বুকে সাহস, রাতে মাঠ দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ও ফিরত—কিসিকো নেই ডরতা, হাম আগুন খাতা ! কিসিকো নেই ডরতা !

সন্ধ্যেবেলা লণ্ঠন হাতে একা চণ্ডীকে বটগাছতলায় ঘুরতে দেখে ও বলেছিল—এই, তু আঁধারে ডরিস না ?

না। হাম আগুন খাতা জানিস ? চণ্ডীর হাসি দেখে মলিন্দর খুব অবাক হয়েছিল। সেই বৈশাখেই ও চণ্ডীকে বিয়ে করে। আরেক বৈশাখে চণ্ডীর কোলে ভগীরথ এসেছিল।

চণ্ডী ভগীরথকে কোলে নিয়ে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল, বলেছিল

—মোকে ওরা ঢেলা মেরেছিল গঙ্গাপুত্ত। বলল আমার নজর মন্দ।

—কে ঢেলা মারল ?

—লাও ! তাকে কি তুমি মারবা ?

—ঢেলা মারল কেন ?

মলিন্দর উঠোনে বেড়া পুঁততে পুঁততে প্রায় নাচতে শুরু করেছিল চট্‌কা রাগে। আমার বউকে ঢেলা মারে কে ? কার এত আস্পর্ধা ? গালাগালি দিতে শুরু করেছিল মলিন্দর।

চণ্ডী ওর দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে বসে ছিল। তারপর বলেছিল—মোর মন চায় না গঙ্গাপুত্ত, খন্তা ধরতে, মন চায় না কিন্তুক বিধাতা ই কাজ মোকে দিয়ে করাবে, তা আমি কি করব বুল ?

চণ্ডী আশ্চর্য হয়ে ঘাড় নেড়েছিল, নিজের হাত পা দেখেছিল। ওর বংশে ভাই-কাকা-দাদা থাকলে বংশের কাজ করত, কিন্তু কেউ নেই। ওরা সেই আদিম যুগের শ্মশানের দাস, যখন হরিশ্চন্দ্র চাঁড়াল হয়েছিলেন তখন চণ্ডীদের পূর্বপুরুষ ওকে কাজ শিখিয়েছিল। আবার যখন হরিশ্চন্দ্র রাজা হলেন তখন সসাগরা পৃথিবী ওঁর, দান করতে লাগলেন ভারে ভারে।

—মোদের কি বেবস্থা ?

সেই আদিম গঙ্গাপুত্র রাজসভা ফাটিয়ে জিগ্যেস করেছিল। ওদের কানের ভেতরে রাবণের চিতা শোঁ শোঁ করে, তাই ওরা প্রতিটি কথাই চেঁচিয়ে বলে, ধীরকণ্ঠ শুনতে পায় না।

—কিসের বেবস্থা ?

—বামুন গাই-বলদ পাবে, সন্নেসীর নিত্য ভিক্ষা, মোদের কি বেবস্থা? মোদের কি দিলে?

—পৃথিবীর সকল শ্মশান দিলাম।

—কি দিলে?

—সসাগরা পৃথিবীর সকল শ্মশান তোমাদের দিলাম।

—দিলে?

—দিলাম, দিলাম, দিলাম।

তখন সেই আদি গঙ্গাপুত্র দুই হাত তুলে ভীষণ নেচেছিল। উল্লাসে বলেছিল—হা, মোরা সকল শ্মশান পেয়েছি গো, সকল শ্মশান পেয়েছি! এ পিথিমীর সকল শ্মশান মোদের।

সেই মানুষটির বংশের একজন হয়ে চণ্ডী কেমন করে জাতকর্মে লাথি মারত? মারলে যে সে দেবরোষে পড়ত না তার ঠিক কি? অথচ, চণ্ডীর ভীষণ ভয় করত ইদানীং, খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিত। গর্তে কাঁটা ঝোপ চাপা দিলেও ওর ভয় যেত না। মনে হত যে-কোন সময়ে মুখে আগুন নিয়ে একটা শেয়াল বটগাছের মত বড় বড় থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করবে।

ভগমান—ভগমান—ভগমান...চণ্ডী গুনগুন করে কাঁদত। একছুটে চলে আসত বাড়ি। ঘরে বাতি জ্বেলে বসে থাকত আর ভগীরথের দিকে চেয়ে ঠাকুরকে ডাকত। এই সময়ে চণ্ডী সব সময়ে কামনা করত গ্রামের প্রতিটি শিশু যেন অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে বেঁচে জীয়ে থাকে কেন না আগে তার যে দুর্বলতা ছিল না এখন সেই দুর্বলতা হয়েছে।

ভগীরথের কথা মনে করে ওর প্রতিটি শিশুর জন্য কষ্ট হয়, নিদারুণ কষ্ট হয়। যদি বটতলায় বেশি সময় থাকতে হয়, ওর বুক দুখে টনটন করে। মুখ নিচু করেও গর্ত করে ও বাপকে মনে মনে দোষ দেয়। মেয়েকে কেন সে এই নিষ্ঠুর কাজে ব্রতী করে গেল?

—আপনারা অন্য মানুষ দেখে লাও, মোর মন উঠে না।

চণ্ডী একথাও বলেছিল একদিন। কিন্তু ওর কথা কেউ কানে নেয়নি। মলিন্দর ওর কথা বিশেষ বুঝত না, কেন না অন্য মানুষ যা দেখে ভয় পায়, ঘৃণা করে, সেই অশুচি শবদেহ, হাড়, চামড়া নিয়েই ওর জীবিকা। চণ্ডীর কথাবার্তা শুনে ও বলত—ধুস্ যত মিছা ডর!

চণ্ডী বেশি কাঁদলে বলত—তো-মানীর বংশে তো কেউ লাই, কে আসবে শুনি?

এই সময়েই সেই নিদারুণ ঘটনাটা ঘটেছিল। গ্রামে বেড়াতে এসেছিল মলিন্দরের এক জ্ঞাতি বোন। তার মেয়েটা ক'দিনেই চণ্ডীর ন্যাওটা হয়েছিল। গ্রামে সেবার খুব বসন্ত হচ্ছে। চণ্ডীরা কোনদিনই টিকে নেয় না, শীতলাতলায় যায়। ননদের মেয়েটিকে কোলে নিয়েছিল চণ্ডী। ননদকে নিয়ে পূজা দিয়ে এসেছিল শীতলাতলায়। রেললাইনের ধারে বিহারী কুলীরা যখন কাজ করত ওরা একটি শীতলাথান বসিয়ে গেছে। সেখানে পাকাপাকিভাবে বিহারী পুরোহিত থাকেন একজন।

কয়েকদিন পরে সেই শিশুটিই, কি আশ্চর্য, মায়ের দয়ায় মারা গেল। চণ্ডীর বাড়িতে নয়, অন্যত্র, কিন্তু মেয়ের মা-বাবা-পিসী-কাকা সবাই বলতে লাগল চণ্ডীই ওকে নিয়েছে।

—আমি?

—হাঁ গো তুমি!

—আমি লয় গো আমি লয়।

চণ্ডী ওদের সমাজের মেয়েপুরুষগুলির দিকে চেয়ে সকাতরে বলেছিল।

—হাঁ তুমি!

—কখুনো নয়।

চণ্ডী সাপের মত ফুঁসে উঠেছিল। বলেছিল—আমা হতে কারো মন্দ হবার লয়। জান আমি কার বংশ?

ভীরু কুসংস্কারে অন্ধ মানুষগুলি ভীত চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—টুকনিকে মাটি দিবার কালে তোমার বুক হতে দুধ মাটিতে পড়ল কেন?

—হা রে বোকার সমাজ!

চণ্ডী কিছুক্ষণ ঘৃণা ও বিস্ময়ে সকলের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—ঠিক আছে। পিত্তিপুরুষের শাপ মোকে লাগুক, ডর করি না। উকাজ ছেড়ে দিলাম আজ হতে।

—কাজ ছেড়ে দিবি?

—দিব। যা, যেয়ে বীরপুরুষ সব, পাওরা দেগা। মোর মন ই কাজে বহুদিন লাই, গঙ্গাপুত্ত গোরমেন্টের ঘরে সরকারী কাজ পাবে, ই কাজে আমি মরতে যাব কেন?

সমাজের সকলকে বোবা করে দিয়ে চণ্ডী ঘরে চলে এসেছিল। মলিন্দরকে বলেছিল—কাজ যিখানে সিথা ঘর মেলে না? সিথা চলে যাব। উরা মোকে কি বলে তা জান?

মলিন্দর চণ্ডীকে ঠাট্টা করে অবস্থাটা সহজ করে নেবার জন্য স্বভাবসিদ্ধভাবে চেঁচিয়ে হেসে বলেছিল—কি বুলে উরা? তু বাঁয়েন হছিস?

বলেই মলিন্দর আর্তনাদ চেপে নিয়েছিল। কি বলল! মলিন্দর আর্তনাদ চেপে নিয়েছিল। কি বলল! মলিন্দর একি ভয়ানক কথা উচ্চারণ করল?

চণ্ডী কাঁপতে শুরু করেছিল বাঁশের খুঁটি ধরে। উত্তেজনায়, দুঃখে, রাগে, চতুর্গুণ চেঁচিয়ে ও বলেছিল—ঘরে বন্‌শধর রইতে কেউ উ বাক্য মুখে ল্যায়? আমি বাঁয়েন? আমি ঘরের ছেলে ফেলে, মরা ছেলেকে দুধ দেই, মরা ছেলে লিয়ে সোহাগ করি? আমি বাঁয়েন?

—চুবো!

মলিন্দর ওকে ধমক দিয়ে উঠেছিল, কেন না তখন ভর দুপুর। এ সময়ে মানুষের কুকথা-দুঃসংবাদ বাতাসের মুখে ধায়। এ সময়ে মাথায় তেল, ভাত না থাকলে মনে ভয়ঙ্কর হিংসে-রাগ-আক্রোশ সহজে ধুঁইয়ে ওঠে। মলিন্দর ওর সমাজের লোকের স্বভাব চরিত্র জানত।

—আমি বাঁয়েন লই গো আমি বাঁয়েন লই!

চণ্ডীর কান্না চিল ছোঁ মেরে বাতাসকে পৌঁছে দিয়েছিল। বাতাস নিমেষে সে কান্নার খবর ঈশান থেকে অগ্নি আকাশের সবকটা কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ঐ একবার কেঁদেই চুপ করে গিয়েছিল চণ্ডী, আর কোন কথা বলেনি, মলিন্দরকে নাকি বলেছিল—মোরা আঁধারে চলে যাই কুথা।

—কুথা যাবি?

—পালাবা ?

—কুথা ?

—জানি না।

চণ্ডী মলিন্দরের কাছে এসে ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসেছিল, বলেছিল—কাছে গুইড়ে এসো, বুকে মাথা রাখি।

বলেছিল—মোক বড় ডর লাগছে। পিত্তিপুরুষের কাজ করব না বলে এলাম থিকে ডর লাগছে। এতদিন তো ডরি নাই ? আজ অ্যামন ডর লাগছে, তুমাকে আর দেখব না, ভগীরথকে আর দেখতে দিবে না, ভগমান ?

এই কথাটি বলে মলিন্দর চোখ মুছল। বলল—এখুন মনে ল্যায় বাপ, সিদিন ভগমান উর মুখ দিয়ে কথাটা বুলিয়েছিল, জানলু ?

—তারপর ?

তারপর চণ্ডী কয়েকদিন আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকছিল। অল্প কাজকর্ম করে আর ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসে থাকে, গান গায়। ঘরে খুব ধুনো জ্বালে পিদীম জ্বালে আর মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে।

একটানা দুটো মাস খুব ভাল কেটেছিল। আর চণ্ডীকে ডাকতে আসেনি কেউ আর দরকারও হয়নি। খুব শান্তিতে ছিল ওরা সেই কটা দিন। চণ্ডীও খুব শান্ত হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—ই কাঁচাকচিদের অন্য বেবস্থা হতে হয়। ই বেবস্থা খুব মন্দ।

—হবে, বেবস্থা হবে। দিকে দিকে হচ্ছে।

চণ্ডী বলত—ভাল করলাম কী মন্দ করলাম কে বুলে দিবে ? দেখ, মোক মন বুলে নিশি য্যাখন শুনলাম ত্যাখন জানি মোক বাপ হাঁকুর দেয়।

—তুই শুনলি ?

—মন বুলে যেমন হই-হই-হইয়া ডাক উঠে, বাপ কি শিয়াল তাড়ায় নাকি ?

—চুপ যা চণ্ডী !

মলিন্দর ভয় পেত। মাঝে মাঝে কি তারই মনে হত না চণ্ডী বাঁয়েন হয়ে যাচ্ছে, চণ্ডী রাতে চমকে উঠে বটতলায় কাদের কান্না শোনে ? হয়তো সমাজ যা বলছে সে কথাই সত্যি। মনে হত এর চেয়ে দেশ-গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়া অনেক ভাল।

সমাজও চণ্ডীকে ভোলেনি। চণ্ডীর ওপর চোখ রাখছিল। চণ্ডী তা বুঝতে পারত না এই যা ! সমাজ যখন চায় তখন লক্ষ্যে চোখ রাখে, যখন চায় না তখন অলক্ষ্যে চোখ রাখে। সমাজের অসাধ্য কাজ নেই।

তাই একদিন ঝড় বাদলের রাতে, মলিন্দর যখন মদ খেয়ে নেশায় টুপটুপে হয়ে ঘুমোচ্ছে, ওর উঠোনটা মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছিল। ওকে ডেকে তুলেছিল কেতন, চণ্ডীর কি রকম মেসো। বলেছিল—তোর বউ বাঁয়েন কিনা দেখে যা !

ঘুম ভাঙা চোখে মলিন্দর বোকার মত ওদের দিকে চেয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ।

—দেখে যা শালা দেখে যা, ঘরে বাঁয়েন পুষ্যে মোদের ছেলেগুলোকে সারা করাছিস ত্যাতদিন ধরে !

মলিন্দর দেখতে গিয়েছিল।

দেখছিল—বটতলায় মশাল জ্বলছে, লণ্ঠন। সমাজের বেটাছেলেরা ভিড় করে চাক বেঁধে আছে, কেউ কথা বলছে না।

—চণ্ডী রে!

মলিন্দরের আর্ত চিৎকারটা কে শূন্যেই ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছিল। সবাই স্তব্ধ, সবাই দেখছে এরা কি করে।

চণ্ডী!

চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে একটা দা, পাশে লণ্ঠন, এক পাঁজা কাঁটা গাছের ডাল পাশে উঁচু করা।

—ডাল ঝোপ এনে আমি গর্ত ঢাকছিলাম গো।

—কেন, তু উঠে এলি কেন?

—শিয়ালগুলো চেঁচাতে যেয়ে য্যামন থেমে গেল ত্যামন মোক মন বুলল—উরা গর্তে যেয়ে খাবলাচ্ছে, মরা তুলবে।

—তু বাঁয়েন!

গ্রামের লোকেরা মন্ত্রধ্বনির মত বলল, সভয়ে।

—ক্যাও পাওরা দেয় না থি।

—তু বাঁয়েন!

—মোক বংশকাজ। উরা কি জানবে?

—তু বাঁয়েন!

—আমি বাঁয়েন লই গো, মোক বুকে কচি ছেলা, মোক বুক দুধে ফেটে যায়! বাঁয়েন আমি লই! গঙ্গাপুত্ত তুমি বুল না গো, তুমি তো সব জান?

লণ্ঠনের আলোয়, বৃষ্টিতে লেপটানো বুক আঁচলটা দেখছিল মলিন্দর মন্ত্রমুগ্ধের মত। বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছিল মলিন্দরের। কে বলছিল ও মলিন্দর সাপ দেখলে তু কাছে যাস, আগুনে যেয়ে হাত ঢুকাস, এখন যাস না তু, তুদের কত ভালবাসার বিয়ে, ভালবাসার ঘর। তু গেলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মলিন্দর কাছে গিয়েছিল, রক্ত চোখ দিয়ে চণ্ডীকে ভাল করে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠেছিল জন্তুর মত—আরি ই-ই-ইহার! তু বাঁয়েন! বটতলায় এসে কারে দুধ দিচ্ছিলি রে? আরি ই-ই-ই-ই-গো।

—গঙ্গাপুত্ত...হায় গো।

চণ্ডীর ভীষণ ও বুকফাটা কান্না মাটির মৃত শিশুদের, চণ্ডীর বাবার অশান্ত আত্মাকে, ওর আদিমপুরুষ সেই আদিম ডোমকে অব্দি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মানুষের জগৎ থেকে অমানুষটি অতিলৌকিক লোকে নির্বাসনের সময় মানুষের আত্মা বুঝি অমন করেই কাঁদে। অমনি আকাশ-মাটি-পাতাল কাঁপিয়ে।

কিন্তু মলিন্দর ছুটে ঘরে এসে ওর শ্বশুরের শনিপুজোর ঢোলটা নিয়ে আবার বটতলা চলে গিয়েছিল। ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—আমি মলিন্দর গঙ্গাপুত্ত শোহরৎ দেই। আমার বউ বাঁয়েন হয়্যাছে গো বাঁয়েন হয়্যাছে!

—তারপর? ভগীরথ জানতে চাইল।

—তারপর সমাজ উকে বেলতলা লিয়ে গেল বাপ। জানলু, একেল হতে সি য্যামন ডরাও, সি একেবারে একেল হয়ে গেল। উই, উহ্ শোন বাঁয়েন গান গায়।

অনেক দূর থেক্কে টিনের কৌটোর শব্দ আর এক্ক আশ্চর্য গানের সুর ভেসে এল। সে গানে শব্দ নেই। কথা নেই বলে মনে হয়, কিন্তু কথা ধীরে ধীরে শোনা গেল।

ঘুম এস ঘুম এস রে সোনা, ঘুম এস রে যাদু...

গানটা ভগীরথ জানে, গানটা গেয়ে ওর এখনকার মা গৈরবী-সৈরভীকে ঘুম পাড়ায়।

—চল, ঘরকে যাই বাপ!

মলিন্দর অভিভূত ভগীরথকে নিয়ে ঘরে ফিরে চলল। ভগীরথ বুঝতে পারল—বাঁয়েনের গানটা ওর ভেতরে ঢুকে গেল, ওর রক্তে মিলে গেল, একটা দুর্বোধ্য বেদনার মত ওর কানের ভেতর বাজতে থাকল!

তার কয়েকদিন পর ভগীরথ দুপুরবেলা একলা চলে এল মজা বিলের পাশে। অনেক দূর থেকে ও টিনের শব্দ শুনেছে, শুনে ছুটে ছুটে এসেছে।

জলে বাঁয়েনের ছায়া। বাঁয়েন ওকে দেখছে না। চোখ নিচু করে জল ভরছে মাটির কলসীতে।

—তোমার আর কাপড় নাই?

বাঁয়েন চুপ; বাঁয়েন মুখ ফিরিয়ে আছে।

—তুমি ভাল কাপড় পরবে?

—গঙ্গাপুত্তের বেটা ঘরে যাক্।

—আমি, আমি এখন ইস্কুলে পড়ি। আমি ভাল ছেলে।

—মোক সঙ্গে কথা বুলে নারে। আমি বাঁয়েন।

—আমি ছেঁয়াকে বলছি।

—মোক ছেঁয়াতে পাপ আছে ইকথা গঙ্গাপুত্তের বেটা জানে না?

—আমার ভয় নাই।

—ঘরে যাক্, এখন ত্যতম্পর তাত। ইকালে দুধের ছেলা বাইরে ঘুরে না।

—তুমি...তুমি একলা থাকতে ভয় পাও?

—একলা? না.রে মোক কুন ভয় নাই। একলা থাকতে বাঁয়েন ডরে?

—তবে তুমি কাঁদ কেন?

—কে বুলে?

—আমি শুনেছি।

—গঙ্গাপুত্তের বেটা শুনেছে! আমি কাঁদি?

জলে লাল ছায়াটা কাঁপছে। বাঁয়েনের চোখে জল, বাঁয়েন চোখ মুছল, বলল—ঘরে থেয়ে গঙ্গাপুত্তের বেটা য্যান ফিরে কাড়ে, বাঁয়েনের ধারে কুনদিন আসবে না, লয় তো...লয় তো আমি গঙ্গাপুত্তকে বুলে দিব।

ভগীরথ দেখতে পেল আল ধরে বাঁয়েন চলে যাচ্ছে। চুলের গোছা উড়ে উড়ে পড়ছে, কাপড়ের আঁচল লাল। অনেকক্ষণ বসে রইল ভগীরথ, বিলের জল স্থির হওয়া অব্দি বসে রইল। কিন্তু আর কেউ গান গাইল না—ঘুম এস ঘুম এস সোনা, ঘুম এস রে যাদু।

ঘরে গিয়ে বাঁয়েনও অনেকক্ষণ বসে রইল। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। ভেবে ভেবে শেষে উঠে অনেকক্ষণ বাদে একটা ভাঙা আরসি টেনে বের করল।

—চ্যাহারার কিছু লাই।

অস্ফুটে বলল বাঁয়েন। চুলগুলো একবার আঁচড়াতে চেষ্টা করল। ভীষণ জোট।

—টোকাটা কাপড়ের কথা বলল কেন? উর তো কিছু মনে থাকার কথা লয়। ফর্সা কাপড়, ভাল চ্যাহারার কথা? ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল বাঁয়েন। অনেকদিনই ও মানুষের মত গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। ভাববার কিছু নেইও ওর। শুধু গাছের পাতার শব্দ, বাতাসের ডাক, রেলের আওয়াজ নিয়ে কত কথা আর ভাবা যায়।

কিন্তু আজ ওর মনে হল টোকাটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হঠাৎ মানুষের বউয়ের মত অবিবেচক মলিন্দরের ওপর রাগ হল। টোকাটাকে সামলে রাখবা কার কাজ? বাঁয়েনের নজর থেকে আড়াল করা কার দায়িত্ব?

উঠে, লণ্ঠন জ্বেলে ও হনহন করে রেললাইন ধরে ধরে এগোতে লাগল। লাইন ধরে এগিয়ে গেলে ঐ দূরে গুমটি ঘর, লেভেল ক্রসিং। ওখান দিয়ে আসে মলিন্দর। এসে আলপথ ধরে ঘরে যায়। লাইন ধরে যেতে যেতে ও লোকগুলোকে দেখতে পেল। লোকগুলো লাইন থেকে কি সরাচ্ছে।

না, লাইনের উপর বাঁশ গাদা করছে এনে এনে।

আজ বুধবার রাতের ফাইভ-আপ লালগোলায় মেলব্যাগ আসবে। অনেক টাকা। অনেকদিন ধরে ওরা এই জন্যে তৈরি হচ্ছে।

—তোরা কে?

বাঁয়েন লণ্ঠন তুলল, নিজের মুখের পাশে দোলাল। লোকগুলো মুখ তুলছে। ভয়ে সাদা, চোখ বিস্ফারিত। ওর সমাজের মানুষদের এত ভয় পেতে বাঁয়েন কোনদিন দেখেনি।

—বাঁয়েন?

তুরা বাঁশ-গাড়ি দিচ্ছিস, তুরা গাড়ি মারবি? আবার পালিয়ে যাচ্ছিস, হা মোক ডরে? ই বাঁশ ফেলা আগে, সর্বনাশ হবে।

—ওরা বাঁশ নামাতে পারে না লাইন থেকে, সর্বনাশ ঠেকাতে পারে না। সমাজ চিরকাল এই করে, সমাজের এই কাজ। ওদেরি একজন একদিন ঢোল শোহরৎ দিয়ে ওকে বাঁয়েন করে দিয়েছিল। বাতাসে বৃষ্টির ঝাপট, চণ্ডী লণ্ঠনটা হাতে নিল। অসহায়, কি অসহায় চণ্ডী। ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর পোষা অন্ধকারের দানবগুলো এসে ঐ ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে। শুধু এইটুকু। কি অসহায় চণ্ডী, চণ্ডী এখন কি করে?

লণ্ঠন হাতে চণ্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগল। এক হাত তুলে মানা করতে লাগল—এসো না, আর এসো না-গো, এখানে পাহাড়-প্রমাণ বাঁশ গাড়া।

ট্রেন দুরন্ত ছেলের মত কোন বাধা না মেনে একেবারে চণ্ডীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রাণ দিয়ে ট্রেনটাকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্যে চণ্ডীর নাম অনেক দূর পৌঁছে গিয়েছিল। বুঝি বা সরকারের ঘরেও।

লাশ ঘর থেকে ওরা যখন চণ্ডীকে নিয়ে চলে গেল তখন দারোগাবাবু মলিন্দরদের গ্রামে এলেন। সঙ্গে বি.ডি. ও.।

—রেল কোম্পানী চণ্ডী গাঙ্গোদাসীকে মেডেল দিবে মলিন্দর, তা তোদের বেত্তান্ত তো আমি জানি বললাম, ওর কেউ নেই তবু মুকাবিলা করে দেওয়া দরকার তাই ইনি এসেছেন।

—সাহসের কাজ, খুব সাহসের কাজ করেছে, সবাই ভাল বলছে মহকুমার। তোমার পরিবার?

সবাই চুপ করে। সমাজের লোকগুলি এ ওর দিকে চাইল, ঘাড় গলা চুলকে মাটির দিকে চেয়ে কেউ বলল, আজ্ঞা আমাদেরি জ্ঞাতি।

ভগীরথ অবাক হয়ে গেল। সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

চণ্ডীকে ওরা জ্ঞাতি বলল? চণ্ডীকে ওরা স্বীকার করে নিচ্ছে?

—তোমাদের সকলের হাতে তো ওর মেডেল দেবে না সবকাব।

—আজ্ঞা আমাকে দেন।

ভগীরথ এগিয়ে এল।

—তুই কে?

—উনি আমার মা।

—বটে, তোর নাম কি—কি করিস...

বি.ডি.ও. লিখতে লাগলেন। ভগীরথের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল... ভগীরথ গলা ঝেড়ে বলল—আজ্ঞা আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র।

বাপ পূজা মলিন্দরেব পুত্র। নিবাস ডোমপাড়া।

মা ঈশ্বর চণ্ডী গঙ্গাদাসী...।

ভগীরথ বংশপরিচয় দিতে লাগল। □

বেহুলা

নদীটির নাম বেহুলা, গ্রামটির নাম বেহুলা, ব্লক ইরফানপুর, ব্লক আপিস—হেল্‌থ সেন্টার—কৃষি সমবায় আপিস, সবই ইরফানপুরে; বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আড়াই ঘণ্টা ট্রেনে গেলে ইরফানপুর স্টেশন। সেখানে নেমে স্রেফ হেঁটে যেতে হয়। শীত গ্রীষ্মে ধানক্ষেতের আল বা খেতের মাঝের হাঁটা পথ ধরে যাওয়া চলে। বর্ষায় পথ অগম্য। তখন কাদা। পিছল এঁটেল কাদা। গ্রামের লোকেরা বলে, কাঁদতে কাঁদতে বেউলো ঝাও, কাঁদতে কাঁদতে এসো। এখানেই আসে বসন্ত কুমার। হাফকিন ইনস্টিটিউটএ ছিল ও। বাঙালী ছেলে। অপুষ্টিজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানব শরীরে কালাজ বা সাধারণ করাইত সাপের বিষক্রিয়া ওর রিসার্চের বিষয়। সেই জন্যেই ও এখানে আসে, 24 পরগনার এই গণ্ডগ্রামে। এখানে অপুষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানব শরীর ও কালাজ অ্যাবাউন্‌ডিং। গ্রামাঞ্চলটি খুবই উর্বরা কালাজ সাপ আবাদে। সমগ্র অঞ্চলটিতে শীর্ণ ও বুভুক্ষু মানুষের ফলনও প্রচুর। এই দুই উর্বরতা বৃষ্টি-বন্যা-খরা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। কালাজ এ অঞ্চলে শিয়ড়চাঁদা বা শিকড়চাঁদা নামে খ্যাত। কালাজের দংশন জনিত মৃত্যুও এখানে প্রচুর।

''কালাজ বা বাংগেরাস ক্যেরুলিয়ুস ভারতে সর্বত্র প্রাপ্ত। সমভূমিতে। ইস্পাত নীল উজ্জ্বল চামড়ায় জোড়ায়-জোড়ায় সাদা সরু ডোরা। দৈর্ঘ্য 1500 মিলিমিটার। পুরুষরা দীর্ঘতর। সাপটি নিশাচর। গোখরোর পরেই কালাজের কামড়ে সর্বাধিক লোক মরে। পুরুলিয়ায় 'ডোমনাচিতি' নামে এ পরিচিত। সেখানে প্রবাদ, যদি কাটে ডোমনা ডেকে আন্ বাম্‌না। অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য। শবাচারের জন্যে ব্রাহ্মণ ডাক। গোখরো বা চন্দ্রবোড়ার বিষ 12 বা 15 মিলিগ্রাম দেহে প্রবেশ করলে স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরামে কাজ হয়। কালাজের বিষ 6 মিলিগ্রামের বেশি দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিসিরামে কাজ হয় না। সাপটি শুকনো জায়গা ভালবাসে। যেমন, ইটের পাঁজা।''

বসন্ত কুমার বেহুলা গ্রামে এসে যে জোতদারের বাড়ির ঘর ভাড়া নিতে বাধ্য হয় (আর কারো পাকাবাড়ি বা বাড়তি ঘর নেই), সেই হৃদয় বা হেদো নস্করই কালাজ চাষ করে থাকেন। একদা তিনি ইটের পাঁজা করবার শুভসংকল্প করেন। কাজ শুরু করেন। লক্ষাধিক ইট পোড়ান। অতঃপর, চালানের খরচা সামলে লাভ থাকবে না বলে সংকল্প ত্যাগ করেন। উক্ত ইটপাঁজাগুলি, ইট পোড়াবার চুল্লিগুলি, কালাজ চাষের উপযুক্ত জায়গা। কিছু ইট এনে তিনি দোতলা সম্পূর্ণ করেন। তারপর ছেলের সঙ্গে কলকাতার মেয়ের বিয়ে হয়, এবং কুয়োতলায় বাঁধানো স্নানের ঘর করার দরকার পড়ে। এ বাড়ির বাঁধা মিস্ত্রী এসে মাপজোখ করে ও জোগান সহ ইট আনতে যায়। যায় হেঁটে ও তড়িঘড়ি ছুটতে ছুটতে প্রত্যাবর্তন করে। বলে, 'বাবু? সাপের চাষ করে ছেড়েচেন? ব্বাপো রে, ত্যাত কালাজ জন্মে দেকি নি। নমস্কার বাবু! শিয়ড়চাঁদা কাটলে রক্কে নি বাবু।'

হেদো নস্কর গর্জে ওঠেন, 'কৎ টাকার ইট রয়েচে, ঝানিস?'

'সে তুমি ঝানো বাবু। আমি পারবুনি।'

'ছিরি মালরে ডেকে দ্যাকাচ্চি।'

'ছিরি মাল কেন, ধন্বন্তরি গেলি উহোথাক্ যাবু নি। শিয়রচাঁদার চাষ!'

শ্রীপদ মাল এ অঞ্চলে সাপের ওঝা, উইচ ডকটর এবং ছেলেদের ভোলাবার কাঠের ঝুমঝুমি বানানো ওর শখ। বর্তমানে সে গ্রামে নেই। শ্বশুরের দেওয়া আধ বিঘা জমির তদন্ত করতে বাদায় গেছে। ফিরে এসে ও সরজমিনে তদন্ত করতে যায় ও এসে বলে, ' করেচেন কি? ওই অত ইট, গেরামের মদ্দি, এ ঝে মানুষমারা কল! একে শালার সাপের উৎপাতে মানুষের নিস্তার নি?'

'তুইও বলছিস?'

'হেঁটে হুঁটে দেকে আসুন।'

হেদো নস্কর তড়িঘড়ি কলকাতা থেকে কার্বলিক অ্যাসিড আনান, ও স্বগৃহ সুরক্ষিত করেন! কিন্তু গ্রামটিতে কালাজ দংশন জনিত মৃত্যু হতে থাকে। মাসে একজন-দুজনকে সাপে কাটে। শ্রীপদ সব কেস্ নেয় না। না নিলে বাঁধন দিয়ে ইরফানপুর হেল্‌থ সেণ্টারে পাঠায়। হেলথ সেণ্টারটি দেখলে মনেও হয় না, কলকাতা এত কাছে। ডাক্তারের সম্বল কিছু সাল্‌ফাডায়াজিন, এণ্টারোকুইনল ও কাশির মিক্‌স্‌চার। তিনি পটাশ পারম্যাংগানেটে ক্ষতস্থান বেঁধে শ্রীপদ প্রদত্ত বাঁধন পরীক্ষা করে দেখে বলেন, 'কলকাতা নিয়ে যাও।' শ্রীপদ সাধারণত সঙ্গে আসে। ও আড়বুঝো নয়। বিষধর সাপ জুৎ করে না কামড়ালে ও চিকিৎসা করে ও রোগী বাঁচায়। নইলে হেল্‌থ সেণ্টারে আনে। যা নিয়ম। যেহেতু জায়গাটিতে সর্পদংশন নিয়মিত ব্যাপার, সেহেতু এ সব হেল্‌থ সেণ্টারে সর্পদংশনের অব্যর্থ ওষুধ স্নেক ভেনম অ্যাণ্টিসিরাম কখনোই সরবরাহ করা হয় না। ডাক্তার রোগীকে কলকাতা নিতে বলেন। শ্রীপদ বলে, 'বাবু! ঘুমে এলি পড়চে, চোকে ঝাপসা দেকচে, কতা সরচে নি, ঘাড় ভাঙচে, কলকেতাতক ঝেতে হলে টিকবে না। টেন নি একন।'

রোগীর লোকদের বলে, 'কিচু হবার নয় হে। অধরের আশা নি। ওরে ঝমে ডেকেচে।'

'ইঞ্জিশান দেবে নে?'

'সাপের ইঞ্জিশান নি'

'আসে নে?'

'না।'

রোগী খাটুলিতে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে লোকজন তাকে নিয়ে ফেরে। শ্রীপদ মাটিতে আঁকিবুকি কেটে বলে, 'ভোটের বচরে ভোট নেয় শালারা, ঝত ঝনা যায়, সবারে বলি, হেথা ইঞ্জিশান পাটে্ দাও। সে ইঞ্জিশান পড়লি মানুষ ঝপ করে মরে নে। সব শালা মথুরা ঝেয়ে কেষ্ট হয়।'

ডাক্তার আবার স্নেক ভেনম অ্যাণ্টিসিরাম চেয়ে পাঠান। ফলে গর্ভনিরোধক বড়ি ও আরো সাল্‌ফাডায়াজিন পান। এগুলি তিনি, মরিয়া হতাশায় টাইফয়েড-নিউমোনিয়া-রক্তামাশা-ক্রিমি—সকল ব্যাধিতে দিয়ে চলেন ও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করেন। এখানে আসার পর তাঁর বিশ্বাস বেড়েছে, ভগবানই সর্বাবস্থায় মানুষকে বাঁচান। নইলে নিউমোনিয়ার রুগী গর্ভনিরোধক বড়ি খেয়ে সারে কি করে? বড়িগুলি নিশ্চয় দৈব আশীর্বাদ ধন্য।

সাপে কাটা রোগী একসময়ে মরে। শবকৃত্য করে আজও এরা মৃতকে বেহুলার জলে ভাসায়। নদীটি নামের কারণে অভিশপ্ত। সর্পদষ্ট লাশ তাকে বইতেই হয়। বেহুলা যেহেতু মজে যাচ্ছে, সেহেতু বর্ষা বিনে তার স্রোতে গতি নেই। এমন ককিয়ে ককিয়ে সে লাশ বয়, যে মনে হয় জরতী বেহুলা নিরন্ন লখিন্দরের লাশ বইছে। প্রখর স্রোতময়ী সুবিশাল তামলীতে পড়ার আগে একটি বাঁওড়। সেখানে গিয়ে কলার ভেলাটি ঘুরপাক খায়, ক্রমে তলিয়ে যায়, তারপর গিয়ে ভেসে ওঠে তামলীতে।

স্বভাবতই শ্রীপদ এখানে, গ্রামজীবনে যথেষ্ট সমীহ পায়। কিন্তু যেহেতু কালাজে কাটলে, জুত করে কাটলে কিছু করার থাকে না। কালাজ কাটলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, বাঁধন ছাঁদন পড়লেও, অ্যান্টিভেনম না দিলে আশা থাকে না। না দিলে আরো আশা কম। দেখে দেখে শ্রীপদ ভেতর ভেতর আস্থা হারাচ্ছে নিজের ওপর। ইঞ্জেকশান হেল্‌থ সেন্টারে এলে সেই সবচেয়ে খুশি হবে। ও গ্রাম ছেড়ে কোথাও গেলে ঘরে ঘরে শঙ্কার ছায়া নামে। শ্রীপদর নিজেরও মনে হয়, নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে রেখে যাচ্ছে এদের। ঘুমোতে ঘুমোতে বিছানার নিচে হাত পড়লে সাপে কাটে, উনোনের ছাই কাটতে সাপে কাটে, রাতে বাইরে বসতে সাপে কাটে। সর্বত্র কালাজ। হেদো নস্করের ইটের পাঁজা সর্পদংশনে মৃত্যু বাড়িয়ে দিয়েছে।

সাপ কামড়াবে, মানুষ মরবে, এতে মানুষের মধ্যেও এক পরাজিত মানসিকতা। নদীটির নামও যেন সেই পরাজয়ের সহায়ক। নদীর নাম যদি বেহুলা হয়, তবে স্ত্রী-পুরুষে লখিন্দর হবেই। মনসা পুজোর সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। এখানে মনসা বাস্তু রূপে ঘট ও মনসাসিজের ডালে পূজিতা। পুজোর দিনে নানা বিধি রান্না। পরদিন অরন্ধন। অনেকের কাছে এটি ''রান্না পুজো'' নামেও পরিচিত। পতিত ইটের জমিনে কালাজ চাষে সোনা ফলাবার পর থেকে হেদো নস্কর মনসাপুজোর ধূম বাড়িয়েছে। এখন ও এ কথাও বলে, 'তো বেটাদের ছেদ্দা নি। তাতেই সাপে কাটে। আমার ইটের পাঁজা হতে সাপে বিরিদ্দি, তবে আমায় কেন কাটে নে?''

কথাটি ও বসন্তকেও বলে। বসন্ত অন্য মানসিকতা এবং অন্য পৃথিবীর মানুষ। গবেষণা করতে এসেছে, হেদো নস্করের সর্বশক্তিমানতা ওর কাছে অনস্তিত্ব। এস. ডি. ও. ওর ভগ্নীপতি। তাঁর মাধ্যমে এই থাকার ব্যবস্থা। হাকিমকে অবলাইজ করতে পেরে হেদো নস্করও খুব খুশি। রেজিম যে রকমই হোক, হাকিম-হুকুম থাকলে কিঞ্চিৎ ফায়দা ও ওঠাবেই।

হেদোর কথা শুনে ও গ্রামীণ মানুষের সংস্কারবদ্ধতা দেখে শুধু, এবং ঈষৎ হেসে বলে, 'কার্বলিক ঢালছেন, আলো আছে বাড়িতে, ঘাসজঙ্গল রাখেন নি, জুতো ছাড়া বেরোন না, সাপ কাটে না।'

'না মশায়। ইটের পাঁজা-ইটের পাঁজা, সবাই বলতেছে। পাঁজা ঝকন ছিল না, তকন সাপে কাটে নে? আমি ত' জ্ঞান হতে দেকতেছি বেউলোয় ভেলা ভাসে। ছিরিপদরও হাতযশ নি। নইলে, ওঝা তুমি, গুণীন মানুষ, ইঞ্জিশান দেবার কতা বল কেন?'

'বলে বুঝি?'

'আরে বাপু রে! আমারে ছিঁড়ে খায়। ইঞ্জিশান আনার বেবস্তা কর। ঝেই বলচ ইঞ্জিশান, সেই তুমি হার মানচ তো?'

'হেল্‌থ-সেণ্টার স্নেক ভেনম অ্যাণ্টিসিরাম রাখে না ? বলেন কি ?'

'রাখে কখনো ? এ দক্ষিণে কোতা সাপের কোপ নেই ? সর্বত্তর সাপ মশায় ! শতে-শতে মানুষ মারে। নরে-নাগে বাস, কতায় বলেচে। হেল্‌থ সেণ্টারও হয়েচে। সেতা ইঞ্জিশান কোতা আচে ? যে সনে অনেক মরে, সে সনে এট্টু পাটায়। পাটাবে বা কেন ? সাপে কাটা হল নিয়তি। কে কবে সাপের লেখা হতে বাঁচে ?'

বসন্তর মনে এক্যাডেমিক আকর্ষণ জাগে। সাপ সম্পর্কে এই পরাজিত মনোভাব কেন ? তারপর ওর মনে হয়, সর্পদংশনে মৃত্যু যেখানে ক্রনিক, সে অঞ্চলে, স্নেক ভেনম অ্যাণ্টিসিরাম থাকে না কেন ? সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরও কি মনে করে, ''সাপের কাটা কপালের লেখা ?''

'সাপে কাটলে ?'

'ছিরিপদ।'

'সারাতে পারে ?'

'পারলে ও, না পারলে ও। তবে ও মলে পরে খুব চিন্তা। ছেলে ও পতে যায় নি।'

'ওর বাবাও এই কাজ করত ?'

'সে ছিল গুণী মানুষ। রামপদ মালের নাম এ দিগরে ঝানতু সবে। কাল মরেচে, আজ ভাসাতে নেস্‌চে, রামপদ বলে, দারোগা বাবু ? ছেলে যে বেঁচে আচে গো ! জীয়ন্তে ভাসাবে ?— দারোগা বলে, জেবন দে, তোরে পাঁচশো টাকা দেব। সে ছেলেরে রামপদ বাঁচাল, টাকা নিল, আমার স্বচক্ষে দেখা। তখন আমি ছোট।'

'শ্রীপদকে দেখতে হচ্ছে।'

'ও গুনো কি ? শিশিতে ?'

'ইঞ্জেকশান'

'ইঞ্জিশান ?'

'সাপ নিয়ে কাজ করি তো !'

'কাজ হয়।'

'আমাকে তো দু'বার কামড়েছে। বেঁচে তো আছি। তাহলে কাজ হয় নিশ্চয়।'

'সাদা গুঁড়ো ঝ্যামন ?'

'পাউডার-সিরাম।'

'কাজ হয় ? অ্যাঁ ? ওই সাদা গুঁড়ো ইঞ্জিশান করলি মানুষ বাঁচবে ?'

'আমি বেঁচে আছি, না ?'

এখন হেদো নস্কর অন্য কথা পাড়ে। বলে, 'হাকিমের সম্মন্দি, এ ছোটলোকের কাজে এলেন বা কেন ? এ কি ভদ্দরলোকের কাজ ?'

বসন্ত সে কথার জবাব দেয় না ও বলে, 'কলটা কোথায় আপনার ?'

'ওই ঝে ? চাপা কল, সেপটিক সেজখানা, মান্যিগন্যি মানুষ এলে এই হেদো নস্করের ঘর ! তা, স্টোভ, বাসন দেখচি ?'

'রাধব না ? খাব কি ?'

'আমার বাড়ি থেকে রেঁধে খাবেন ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনুন, এই যে ঘরের ভাড়া দিচ্ছি; আবার খাওয়ার জন্যে খরচ করব, সবই তো আমি পাচ্ছি। তাহলে আপনার নিতে কি?'

'ঝাক, দুদটা ঝ্যানো কিনবেন না'

'টিনের গুঁড়ো দুধই তো আছে।'

হেদো হেসে ফেলে ও বলে, 'বুঝিচি। ভগ্নীপোতের নিষেদ। ঝাক, দরকার-অদরকারে বলবেন।'

দু-এক দিনের মধ্যেই শ্রীপদ ও বসন্তের সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। যুদ্ধের মাধ্যমে। চরণ বেরার যুবতী ও সধবা, গর্ভবতী মেয়েকে যেদিন সাপে কাটে।

বসন্ত চা খেয়ে কাপ-ডিশ ধুচ্ছিল। হঠাৎ লম্বা মত একটি লোক ছুটতে ছুটতে আসে। বলে, 'আপনি ইঞ্জিশান নে চল বাবু, ছিরিপদ ডাকতেচে।'

'কেন?'

'মালতীকে সাপে কেটেছে গো, গভ্‌ভবতী মেয়ে!'

বসন্ত ইঞ্জেকশান নিতে নিতে বলে, 'বাঁধা হয়েছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ছিরিপদ......'

চরণ বেরার বাড়িতে উঠোনে মেয়েটি শায়িত। বসন্ত দেখে, একেবারে নিয়ম মতে উরুর ওপর তিনটি বাঁধন। বাঁধনের নিচে নিয়ম মতে চেরা ও কাটা। রোগা, হাড়পাকানো, ঝাঁকড়াচুলো শ্রীপদ ক্ষিপ্রহাতে বাঁধন খোলে, একটু ওপরে বাঁধে। বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'বাবু এয়েচেন? ইঞ্জিশান দ্যান, ইঞ্জিশান দ্যান, তেমন জুতে কামড়াতে পারে নি, তবু শিয়ড়চাঁদা বলে কতা!'

বসন্ত ইঞ্জেকশন দেয়। হাঁড়ি দেখে বলে, 'গরম জলের তাপ দিচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

ক্ষত স্থানের পাশে, গোড়ালিতে শ্রীপদ নরুন চেরে ও মেয়েটি অস্ফুটে ''আঃ'' বলে। শ্রীপদ বলে, 'রা কেড়েচে ঝকন, তকন আশা আচে।'

'তাই বল ছিরিপদ! জামাই থুয়ে আবাদে গেল। এ কি হল মা?'

শ্রীপদ খুব খারাপ কথা বলে ও খ্যাঁচায়। বলে, 'মাটিতে হাঁড়ি-কলসি জাঁদ করেচ, মনে থাকে নে? কোতা বাস কত্তেচ? কলসির পোঁদ জইড়ে, বুঝলেন বাবু? ঝ্যামন কাচে গেচে!'

'সাপটা?'

'তিনি বামুন তো! এখন কালনিদ্দা যাচ্ছেন। পরে দাহ হবেন।'

ঘণ্টাখানেক বাদে মেয়েটির বিপদ কাটে। চরণ ও তার স্ত্রী শ্রীপদর পায়ে পড়ে। শ্রীপদ ওদের প্রণাম নেয় ও ফিচেল হেসে বলে, 'বাঁচাল উনি।'

বসন্তও প্রণাম পায় কয়েকটি। শ্রীপদ বলে, 'আবাদ হতে জামাই এলে একদিন মনসামঙ্গল লাগিয়ে দাও হে চরণ। অনেক কাল খ্যাঁট জোটে নে। গরানের নৌকো বেয়ে-বেয়ে চাট্টি টাকাও তো করেচ।'

'সে আর বলতে?'

শ্রীপদ বলে, 'চলুন বাবু, ঝেয়ে দুটো কতা বলি। হেতা বিপদ সেরে গেচে।'

চরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্রীপদ বলে, 'আসুন, সাপের চাষ কোতা হচ্চে দেকুন।'

দূর থেকে ওরা পতিত ইটের পাঁজাটি দেখে। শ্রীপদ বিড়ি ধরায়, মাটিতে থুথু ফেলে বলে, 'ওই গুখেগোর ব্যাটা হেদো নস্কর!'

'ওঁরই পাঁজা ?'

'নয়তো এমন কীত্তি কার ? সাপের মহল্লা এটা। সাপে-কাটা লাশ টানতে টানতে বেউলোর জল মজে যাচ্চে। বর্ষা ছাড়া সোঁত নি, তাতে নস্কর সাপের চাষ দিল।'

'আচ্ছা, সাপে-কাটা লাশ পোড়ায় না কেন ?'

শ্রীপদ বিষণ্ন হাসে। বলে, 'বলে দেন গে, মাত্তে আসবে। নদীর বওতা থাকে, লাশ টেনে তামলীতে ফেলল, লাশ ঝেয়ে সাগরে শামিল হলেন! বেউলো তো মত্তে বসেচে। ই কি আবাদ ? ঝে ঝত খাল-নদী সব ঝেয়ে সাগরে পড়তেচে ঝপাঝপ। পুইড়ে দে লাশের কাপড়টা ভাইসে দে, বলার জো আছে ?'

কথাগুলির পেছনে একটি পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিনিষ্ঠ মন উঁকি মারে ও বসন্তকে চমকে দেয়।

'ইটের পাঁজা ভেঙে ফেললে হয় না ?'

শ্রীপদ ওকে বলে, 'চলেন, আমার ঘরে চলেন। বসে কতা কই।'

বসন্ত সাপ-বিষয়ক গবেষণা করছে বটে, কিন্তু সাপুড়ে বা সাপের ওঝা বিষয়ে ওর ধারণা শরৎচন্দ্রের ''শ্রীকান্ত : প্রথম পর্ব'' বইয়ের ভিত্তিতে গঠিত। শ্রীপদ কোনো অংশেই ''শাহজী'' সদৃশ নয় দেখে ও মনে-মনে ধাক্কা খায় যেন। শ্রীপদর বউ ওদের চা করে দেয়, এবং তার চেহারা মোটেও অন্নদা দিদির কাছ দিয়ে যায় না দেখে ও আবার ধাক্কা খায়। তারপর বোঝে, উক্ত কাহিনীর চিত্ররূপ ওর ধারণাকে গঠন করেছিল। নইলে পশ্চিমবঙ্গের সাপুড়ে ও মিসেস সাপুড়ের পক্ষে, মঞ্চ-পর্দার কুশলী নট-নটী সদৃশ হওয়া খুবই কঠিন। বহু দুধ-মাখন-মাছ-মাংস-আহ্লাদী জীবন হলে তবে মঞ্চ বা পর্দায় দুর্গত নিরন্নের চরিত্রায়ণ সম্ভব।

শ্রীপদ বলে, 'কোতা হতে হেতা এলেন ? ইরফানপুরের ডাক্তার বলিছিল বটে আপনি আসবেন। তা এমন ভাগাড়ে কেন ?''

'সাপে-কাটায় মরে বেশি, সাপে-কাটা নিয়ে আমার কাজ, তাই এসেছি।'

'ডাক্তার ? ইঞ্জিশান দেবেন ?'

'ডাক্তার নই। তবে ইঞ্জেকশান, যদ্দিন থাকব, তদ্দিন দিতে পারব।'

'কদ্দিন থাকবেন ?'

'তিন মাস।'

'অ। তা ইট পাঁজার কতা কি বলছিলেন ?

'ওটা ভেঙে লোপাট করে দিলেই তো হয়।'

'সে বলতে গেলে বিত্তান্ত! হেদো নস্কর ঝকন ইট পাঁজা খরচা পোষাবে নে বলে ঠিক করল, তখন এক কন্টাকটর এইছিল। ইট নে আবাদে ঝাবে। বেউলো হয়ে তামলী হয়ে নৌকোয় নে ঝাবে।'

'তারপর ?'

'পিচেশ তো? আমি বল্লু, বেচে দাও বাবু, হোতা সাপের শওর হবে। বলল, দরে না পোষালেও বেচতে হবে? রইল পাঁজা। কেরমে সাপের শওর হল। ওনার দরে ঝকন পুষল, তকন ওর কাচে ঝাবে কে? সাপের সঙ্গে খেলা চলে? গত সনে বল্লু, বৈশেকে মাটি শুগনো, পাঁজা বেড়ে খাল কেটে আগুন দাও। ক টিন কেরাচিনি পাঁজায় ঢালতি হবে, খানাতেও কাঠ-ঝোপ পোয়াল ফেলে কেরাচিনি দিতি হবে। এতে সাপ মরে, আমি সেই মেদ্নীপুরে দেকে এইচি। এক পতিত গড় সাপের পাঁজা হইছিল। এমনি ভাবে আগুন দে সাপ পুইড়ে গরমেন্ নিকেশ করল। সে গড়ের ঠেঙে একন ইশকুল।'

'রাজী হল না?'

'না। বলে ইটের পাঁজা কি আমার ঘরের দোরে? বিশ টিন কেরাচিনির ফন্দ হাঁকচ, পয়সা তুমি দেবে? উনি কেরাচিনির কণ্টোলের মালিক। কেরাচিনি ওকে পয়সা দে কিনতে হতুনি। তবুও ছাড়ল না কেরাচিনি।'

'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অমন বাঁধন দিতে, বাঁধন সরাতে, চিরতে আপনি শিখলেন কি বাবার কাছে?'

'নিচ্চয়। বাবু! আমি ইঞ্জিশানের কতা বলি বলে সবাই ঝেনে গেচে ছিরিপদ আসলে ভুষো মাল, কিচ্ছু ঝানে নে। কিন্তুক...'

'কি?'

'আপনি তো সকল ঝানো।'

'বলুন না।'

শ্রীপদ উশখুশ করে ও বলে, 'সে কতা পরে হবে। একন ঝান। চ্যান-খাওয়া সারুন। আপনিও রইলেন, আমিও রইলাম।'

বসন্ত চলে আসে। ও ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে হেদো নস্করের ঝি থালায় সার-সার বাটি বসিয়ে ঢাকা দিয়ে নিয়ে আসে। বলে, 'গিন্নি মা বলল, ভদ্দরনোকের ছেলে ঝ্যামন চাল ফুট্টে নেয়। তরকারির হাংনামা কত্তে হবে নে।'

বসন্ত ঢাকা খুলে বড় বড় মাছের দাগা দেখে ভির্মি খায় ও বলে, 'তোমার গিন্নিমাকে বলবে, আজ পাঠিয়েছেন, নিলাম। আর যেন না পাঠান। আমি এত খাই না'

হেদো নস্করের ইটের পাঁজার কাহিনী শোনার পর থেকে ওর মনে একটা ''কিন্তু'' এসে গেছে। এমনিতে ও খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে। কোন ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ হলেও ও কিছু বলে উঠতে পারে না। তার ওপর, মধ্যবিত্ত স্বভাবের দরুন, পরের হ্যাপায় জড়াতে ও একেবারে নারাজ। তবু, সাপ নিয়েই ওর কাজ, এবং সর্পদংশনে মৃত্যুর ভয়াবহতা ও জানে। একটা লোকের ইটের পাঁজার জন্যে গ্রামে এত লোক মরবে? বছরে বিশ-পঁচিশ জন?

কথাটি ও ওর ভগ্নীপতিকেও বলে, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে। এস. ডি. ও. কথাটিতে গুরুত্ব দেন না ও বলেন, 'হ্যাঁ। এর আগে মানুষ সাপের কামড়ে মরত না? ইটের পাঁজার কারণেই মরছে?'

'ডেথ রেট বেড়ে গেছে।'

'সে যা হোক, ও নিয়ে তুমি ঘাঁটাতে যেও না। লোকটা সুবিধের নয়।'

'আসল কথা হল, এখানে হেল্থ সেণ্টারে অ্যাণ্টিসিরাম দরকার।'

'দরকার তো জানি। ডাক্তার আছে, রিকুইজিশান দেবে, দেখা যাক।'

ভগ্নীপতি বসন্তকে তাঁর নিজস্ব সমস্যার কথা বলেন। এখন বেহুলা ব্লকের অবস্থা বেশ শান্ত। বর্গাদার সমস্যার একরকম সমাধান হয়েছে। সবাই খুশি নয়। কিন্তু কবে কী হয়েছে, যাতে সবাই খুশি হয়েছে? পঞ্চায়েতি নির্বাচনও একরকম উৎরে গেছে। হেদো নস্কর পঞ্চায়েত-প্রধান। কোনো কারণেই তার ও গ্রামবাসীর সম্পর্ক তিক্ত করা ঠিক নয়। জোতদার পঞ্চায়েত-প্রধান হলে গ্রামবাসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল থাকে না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু ''আমার বক্তব্য হচ্ছে, সম্পর্ক মন্দ হলে আপনা থেকে হোক। তোমাকে নিয়ে যেন কোন সিচুয়েশন না বিস্ফোরক হয়। গ্রামে শিক্ষিত, বাইরের ছেলে থাকলেই পোলিটিকাল চেহারা নেয় সকল ঘটনা।'

বসন্ত জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে গ্রামে ফেরে এবং শ্রীপদ মাল তাকে ডেকে যায়। চরণ বেরার বাড়িতে মনসামঙ্গল হবে। 'খুব গান-নাচ হবে। মনসার ভোগ দেবে চরণ। আপনি তো ফিরতি টিকিট কেটে হেথা এয়েচ, চল দেকে আসবে।' বসন্ত সম্মতি জানায়।

হেদো নস্কর খুঁতখুঁত করে। বলে, 'হাকিমের শালা হয়ে হোতা ঝাবেন? শালারা মাকে খিচুড়ি ভোগ দেয়, তাই খাবেন?'

'সাপ নিয়ে কাজ! না বলতে পারি?'

হেদো নস্কর ব্যাপারটি সুচক্ষে দেখে না ও বউকে বলে, 'নানা নিদি পাটাতে হবে নে বেঁদে বেঁদে। ভদ্দরলোক! এক কাজ বলে এয়েচে, কে ঝানে কি মতলব? নয় তো বন্ধু হল ছিরে মাল!'

'তোমার সাতে পারবে?'

'তা কখনো পারে? তবে ঝেয়ে হাকিমের শালা! তেমন ঘাঁটাতেও চাই না। ভাল-ভালন্তে দু-তিন মাস কাট্যে চলে গেলেই শান্তি। হাকিম বলল, নস্কর, হোতাকে রাখ। নইলে আমি ছেঁড়া ঝামেলা জোটাই?'

'জেলে ঘরে আসতেচে মাচ বেচতে, বাগদী ঢুকে শাক বেচছে, সব ছোঁয়ান্যাপা হচ্চে।'

'ও কতা বোল নি। একন ও সব কথা মনে হলে কিল খাবে, কিল হজম করবে।'

বসন্ত কিছুই জানতে পারে না এবং মহানন্দে মনসার গান শুনতে যায়। চরণের উঠোন লেপা-পোঁছা। হ্যাজাকের আলোয় মনসার ধ্বজা হাতে শ্রীপদ এসে দাঁড়ায়। এক পায়ে ঘুঙুর, এক হাতে ঘুঙুর-দেওয়া বালা পরে সে তাল দিয়ে দিয়ে গান গায়। দোহার ধরে ওর সঙ্গী ও ছেলে। মনসার গান বলতে বেহুলার উপাখ্যান। বসন্ত গান শুনে বোঝে, এরা কাহিনীটিকে আঞ্চলিক রূপ দিয়েছে।

শ্রীপদর গানে, বেহুলা ও লখিন্দর সংসার করতে থাকে। শেষে লখিন্দর স্বর্গে যায়। বেহুলার ওপর অভিশাপ নামে। দেবতারা বলেন, দেবসভায় লাস্য দেখিয়ে নেচেছিল বেহুলা। তার ফলে যে পাপ হয়, সে পাপ খণ্ডাতে বেহুলাকে, কলিকালে বেহুলা নদী হয়ে বয়ে যেতে হবে। সর্পদষ্ট শব ওর জলে ভাসলে সদ্গতি পাবে। বেহুলা বলে, কবে সদ্গতি হবে আমার? দেবতারা তার উত্তর দেন না। সেই থেকে বেহুলা নদী হয়ে বইছে। গানের শেষে মনসা বন্দনা হয় ও উঠোনে ধ্বজা পোঁতা হয়।

খুবই মূল্যবান অভিজ্ঞতা। খাঁড়ি মুসুরের খিচুড়ি পাঁচ রকম ভাজা মায়ের ভোগ। খেতে খেতে শ্রীপদ গভীর বিশ্বাসে বলে, 'এখানেই হইছিল সব। চম্পাই নগর এখন বেউলোর গব্ভে। বেউলো ঝেখানে দাঁইড়ে দাঁইড়ে নদী হয়, সেখানে এক আশ্চাজ্জ কদম গাচ আচে। বৈশেখে কদম ফুল ফোটে।'

চরণ বলে, 'বোশেখ অব্দি রইলে দেকবেন, বেউলোর মেলা বসে। সেতা নানা ঠাঁই হতে মাল আসবে, সাপের খেলা দেকাবে, দেকার জিনিস।'

শ্রীপদ বলে, 'সাপ ধত্তে আসে।'

'সাপ ধরে?'

'ধরে না? সাপ এখন ভাল ব্যবসা। খপাখপ দাঁড়াস ধরে। চামড়ার দাম কলকাতায় বিস্তর। জীয়ন্ত গোকরো ধল্লে কবরেজী দোকানে ওষুধ কত্তে বিষ নেয়।'

'আপনি সে কাজ করেন না?'

'না।! বাবার নিষেদ। কত্তে নি।'

'চলে কি করে?'

'চলে নে। চ্যায়রা দেকে বুজচেন না? নস্করের জমি ভস্‌সা। যারে বলে নির্ভস্‌সা।'

'কত জমি?'

'সরকারী সিলিংকে কলা দেকিয়ে বিস্তর জমি। কোনটা দেবত্তর, কোনটা কারখানা করবে বলে রেকেচে, কোনটা দেকাচ্চে ফলবাগান হবে, কোনটা না কি মেছো ভেড়ি হবে—সর্বত্তর চাষ হচ্চে। ধান-কলাই-পাট—সে বিস্তর চাষ।'

'উনি চেষ্টা করলেই ত ইঞ্জেকশন আসে।'

'করবে কেন? কোনদিন কিচু করল নে, আবার ওই হল পঞ্চায়েতের মাতা, আমরা চিরকাল ওর কাচে বাঁদা রইলাম।'

খাওয়া শেষ হয়। শ্রীপদ বলে, 'চলুন, আপনাকে পঁউচে দিই।
রাত হচ্চে, তেনারাও বেরুচ্চেন। দাঁড়ান, লাঠি নিই। ওই লাঠি ঠক-ঠক ভস্‌সা। টচবাতি কিনব, তা আর হয়ে উঠচে না।'

'না, আমি চলে যাব। কিন্তু আপনার সঙ্গে বসতে হবে। আমার কাজে আপনি সাহায্য না করলে পারব না।'

'সে বসব। এট্টা কতা! এই ইঞ্জিশানে মানুষ বাঁচে তো?'

'সময়ে পড়া চাই। তবে ভাল মত বিষ ঢুকলে কাজ হয় না।'

'এ ইঞ্জিশান ওষুদ কোম্পনি তৈরি করে না কেন? নানা নিদি কত্তেছে?'

'যাতে বছরে মাত্র বিশ হাজার লোক মরে, তার ওষুধ তৈরি করলে পড়তায় পোষায় না। কামড়ায় লাখ চারেক লোককে, মারা পড়ে হাজার বিশেক। তার মধ্যেও নির্বিষ সাপ কামড়ালে ভয়ে মরে কিছু, বাজে ওঝার হাতে মারা পড়ে কিছু। আপনি এ কথায় রাগ করবেন না।'

'না রাগ করব না। আমি নিজের ক্ষ্যামতার দৌড় ঝানিনি? কাল কতা হবে। একন চলে ঝান।'

পরদিন শ্রীপদর বাড়ি যায় বসন্ত। নিজের কাজের কথা বলে। শ্রীপদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিবাদী কথা বলে ওকে অবাক করে দেয়। শ্রীপদ বলে, 'যতাস্তানে এয়েচেন। উপোসী ক্যাংলার শরীলে কালাজের, আমরা শিয়ড়চাঁদা বলি, তার বিষে কি হয়! সে ত আমি মুখেই বলে দিতে পারি। একেনে সকলঝনা উপোসী ক্যাংলা।'

'মনে হচ্ছে স্বচক্ষে দেখতে পাব।'

'তা পাবেন। হেদো নস্করের পাঁজা! আপনার ভগ্নীপোত কি বললেন? চমকাচ্চেন কেন? হেতা কোন কতা চাপা রয় নে। হাকিমের সম্মন্দী বলে হেদো চুপ আচে। নইলে আপনি ছোটলোকদের সঙ্গে মিশতেচ, তাতে কি ও চুপ রইত? টাকা আচে ত! ওর জ্যাটাতো ভাই পরাণ নস্কর হেলে চাষা, তাতে সেও হেদোর কাচে ছোটলোক। জব্দ হইছিল সত্তর সনে। হেতা পটকাটিও ফোটে নে, ও বেটা ভয়ে পালাল, বলে গেল, ধান কেটে তোরা নি গে যা ভাগ করে।'

'কালাজ কাটলে কি কি লক্ষণে বোঝেন?'

'বাবু! উনি হল যম! গোখরো কাটলে, উনি কাটলে শিরায় ঝিমুনি লাগে, ঝিঁ ঝিঁ ধরে ঝ্যামন, তবে গোখরো কাটলি জ্বালা, চন্দরবোড়া কাটলি পুড়ে ঝায়, ইনি কাটলি তকনি যন্তরনা নি। বিষদাঁত এতটুনি। তা বাদে হাড়ের মদ্যে শিরশিরনি, কাটার ঠেঙে যন্তরনা, আর সকল শরীলে এলে ঝিমঝিমে ঘুম, চোকে ঝাপসা দেকে।'

'আপনি তো সব জানেন।'

'বইয়ে নেকা আচে?'

'ঠিক এই কথা লেখা আছে।'

'রাগ করনি। আপনার শিক্কা বইয়ে পড়ে, ওই ঝারে বল লাইবেরি—'

'লেবরেটরি।'

'ওই হল। সেতা সাপ দেকে শিক্কা। আমরা নরে-নাগে বাস করি। তায় সাপের ওঝা! মাল!'

'এই যে চিকিৎসা করেন, এ আপনার বংশগত কাজ। আবার ইঞ্জেকশনেও বিশ্বাস। সাধারণত সাপুড়ে বা মালরা ডাক্তারী ইঞ্জেকশনের ওপর চটা।'

'দেখুন, একন ভেঙে বলি। অন্যদের কতা বলব না। আমি ওদের গোত্তরের মাল নই। দাঁড়ান, দেকাই। অ রাধি! সাট্টিফিকেটটা আন্ তো মা?'

শ্রীপদর ভাইঝি একটি বিবর্ণ ও কালি ফিকে হয়ে যাওয়া বাঁধানো কাগজ আনে। তাতে লেখা আছে, তামলি স্কুল থেকে শ্রীপতি মাল বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ওটি নিস্পৃহ কণ্ঠে নিয়ে যেতে বলে শ্রীপদ। বিড়ি টানে। চোখে কোন অতীত। বেদনা। তারপর বলে, 'তকন, কোতা ইস্কুল নি। মাসে দুটো টাকা হলে ইরফানপুর ইস্কুলি পড়া হতু। হেদোর বাপের ঠেঙে আমার বাপ কত ব্যাগ্যতা করিছিল।'

'দিল না?'

'না। বলল, আজ মালের পো পড়বে, কাল জেলের পো পড়বে, পরশু তোরা মাতায় পা রেকে চলবি। তাতেই হয় নে।'

'সেই থেকে এই কাজ করছেন?'

'এ কাজে তো পয়সা নি। ঝকন চাষ হয়, হেদোর খেত চষি, পেট না চললি আবাদ ঝাই। সে ঝাক। ওই এট্টু বিদ্যে আচে। বাপের সঙ্গে কলকাতা যেতু, হাসপাতাল দেকিচি। হাসপাতাল ভাল বাবু, ডাক্তারী ভাল, আগে হলি টাইফায়েটে, কলেরায় মরতু সবাই। একন ঝদি সময় থাকতে ডায়মন্‌হারবারে হাসপাতালে নিয়ে পারি, বেঁচে ওটে। সেতা নিলে বা ইরফানপুরে নিলে বিয়োতে ঝেয়ে মাগীগুনো মরে নে।'

'তাতেই বিশ্বাস এল?'

'না। আরো কতা আচে। জাত মাল ঝদি সাচাই হয়, তাইলে আমার পতে চলবে।'

'যেমন?'

'মানুষ ভয়ে মরে অনেক। আগে কাটা দেকব। দেকে ঝদি ঝানি নিবিষ সাপ, তকন রুগীরে ভস্‌সা দেব, লাফ-ঝাঁপ মারব, মন্তর বলব, কাটা জায়গা ঝাড়ব, ওষুধ দেব, রুগী বাঁচালি আমার হাতযশ হবে। মানুষ ভয়ে মরে বাবু! ঢোঁড়া-দাঁড়াস-ঘরমুনো-চিতি-লাউডগা নিবিষ। সবাই ঝানে। কিন্তু কামড়ালি ভাবে গোখরো বা শিয়রচাঁদা কাটল।'

'বিষাক্ত সাপ কামড়ালে?'

'সকল সময়ে জুত করে কাটতে পারে না। আগে কাটা দেকব। ঝানব কে দংশালেন। ঝকন বুঝব তেজুতে কাটে নি, তকন বাঁধন দেব, চেষ্টা করব। ওষুধ দেব। মন্তর কইব, ঝাড়ব।'

'ওষুধে কাজ হয়?'

'হয় বাবু। শরীলে তেজুতে বিষ না গেলি কাজ হয়। চালতে-কট্‌কল-টাবা, লেবু-সাদা আর নীল অপ্‌রাজিতা-চিনি-কাঁটানটে পাক করে ওষুধ দেব। আগে বাঁদব, চিরব, মুকে কাপড় নে, বা ধুলো নে কাটা জায়গা চুষব। আরো নানা নিদি ওষুদ আচে।'

'বাঁচে?'

'বাঁচে কি বলচ বাবু? এতেই তো বেঁচে আচে। তোমরা বলবে হাতুড়ে টোটকা। তা দেক, কলকেতা থে এত্‌টুনি দূর! না আচে ইঞ্জিশান, না আচে ডাক্তার, এই তো ভস্‌সা।'

'যদি বেজায়গায় কাটে?'

'বাবু! অন্ধকারে চলে, পায়ে কামড়টা বেশি। ঘরে এসে কাটে, ঘুমের ঘোরে হাতটা পড়ল, হাতে কাটল। তকন বাঁদন চলে। গলায় বুকে-কোম্‌রে কাটে কম। কাটলি মরে! কোতা বাদঁন দেবে? সর্বত্তর কি বাঁদন চলে?'

'ভাল মতে কাটলে?'

'বাঁদন দেব, চিরব, চুষব, ইরফানপুর নিতে বলব। সেতা ঝেয়ে, গত সাত বছরে মাত্তর দু বার ইঞ্জিশান পেইচি, বেঁচেচে। ভাল জুতে কাটলে মালের সাদ্য নি বাবু। ঝারা ভূষো মাল, তারা তেমন রুগী নে বাঁদন খুলবে, মন্তর দেকাবে, কিন্তুক তুমি ত ঝানো, তেমন বিষ দেহে গেলি ইঞ্জিশানেও কাজ হয় নে। কলকেতায় ডাক্তার বলেছিল। তাতেই বাবা বাঁচেনি।'

'সাপ কামড়েছিল?'

'শিয়রচাঁদা।'

এ কথা বসন্তও জানে। বারো মিলিগ্রামের বেশি গোখরোর বিষ, পনেরো মিলিগ্রামের বেশি চন্দ্রবোড়ার বিষ, ছয় মিলিগ্রামের বেশি কালাজের বিষ শরীরে ছড়িয়ে পড়লে স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরাম বিফল হবে। চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে শরীরের রক্তে লালকণিকা ভেঙে যায়, নাক-মুক-মূত্র ও গুহ্যদ্বারে রক্তস্রাব হয়। তাৎক্ষণিক মৃত্যু করুণাময়। নয় মাংস গলে-খসে অসহ মৃত্যু। গোখরো ও কালাজের বিষ নিউরোটক্সিন। স্নায়ু অবশ-অবশ, পেশী সংকোচন, লালা নিষ্ক্রমণ, ঘুম-ঘুম ভাব, শ্বাস কমে আসা, মৃত্যু।

শ্রীপদ বলল, 'আমি ঝানি আমার ক্ষ্যামতার দৌড়। আর ইঞ্জিশান হয়েচে যকন, তকন মরতি ঝাবে কেন মানুষ?'

'দূর্বল শরীরেও একই প্রতিক্রিয়া হয়?'

'একই। উপোসী ক্যাঙালীর মনে জোর থাকে নে, সামান্য বিষ দেহে গেলিও মরে।'

বসন্ত অত্যন্ত চিন্তাকুল চিত্তে ঘরে ফেরে। সামান্য বিষ দেহে গেলেও মানুষ মরে? দুর্বল ও প্রতিরোধহীন শরীর বলে?

সহসা তার মনে হয়, সব কিছু এক্যাডেমিক আগ্রহে দেখা ঠিক নয়। দুর্বল শরীরে কালাজ বিষের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, তা ও দেখতে ও লিপিবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু মহানগরীর এত কাছে একটি গ্রামে এত অন্ধকার কেন?

লাভে পোষাবে না বলে নস্কর ইট বেচবে না। পরিণামে কালাজের বংশবৃদ্ধি ও মানুষের মৃত্যু। মানুষগুলি অনাহারে শীর্ণ কেন? নস্কর এই ক্রনিক অনাহারে কোন ভূমিকায় আছে? কেন হেল্‌থ সেন্টারে এ্যান্টিসিরাম থাকে না?

হেল্‌থ-সেন্টারের ছোকরা ডাক্তার মাথা নাড়েন। না, তিনি জানেন না কোন ''কেন''র উত্তর। কলকাতায় স্বাস্থ্যদপ্তর মানে মন্ত্রী-আমলা-ফাইল। মানুষ ও মানবিক সমস্যা সেখানে ফাইলে লিখিত অক্ষর মাত্র।

বলেন, 'আমার হাসপাতাল দেখলে বুঝবেন। একটা বেডে ছয়জন পোয়াতি বাচ্চা নিয়ে থাকে, এমনও হয়। এ্যান্টিসিরাম? চাইলাম এ্যান্টিসিরাম, পাঠাবে এন্টারোকুইনল। অফিসিয়ালি নো ম্যালেরিয়া। তাই ম্যালেরিয়া হচ্ছে জানালেও ওষুধ পাঠাবে না। পাঠায় গাদা গাদা কন্ট্রাসেপ্‌টিভ ট্যাবলেট আর একটা মিকস্‌চার।'

'বলেন কি?'

'ডেটল নেই, তুলো নেই, সিরিঞ্জ নেই, ক্লিনিকাল টেস্টের কোন ব্যবস্থা নেই, মার্কুরি ক্রোম অব্দি দেবে না মশাই। কোয়ার্টার নেই, মেয়ে নার্স পাই না। জমাদারের স্যাংশান নেই। তবু মানুষ বেঁচে ফেরে। কেন জানেন? এরা বোধহয় যমের অরুচি। ফলে সব কেস্ পাঠাই কলকাতা নয় ডায়মন্ডহারবার? কি করব?'

'অ্যান্টিসিরাম চেয়ে পাঠান।'

'পাঠাই মশায়, পাঠাই।'

'পান না?'

'না। আপনার কাছে আছে শুনলাম?'

'সে ত সামান্য।'

'দেবেন ?'

'দেখি। আপনার দরকার ত বেশি।'

'অত্যন্ত মন ভেঙে যায়, জানলেন? জানি ইঞ্জেকশন দিলে সারবে, বেঁচে যাবে, অথচ....শ্রীপদ যখন আনে কেস.....আমার কি মনে হয় জানেন ?'

'কি ?'

'ইনট্রাভেনাস দিতে পারবে না, কিন্তু ট্রেনিং দিতে পারলে শ্রীপদর মত বুদ্ধিমান লোক স্বচ্ছন্দে ইনট্রামাস্কুলর বা সাবক্যুটেনস ইঞ্জেকশান দিতে পারত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। লিগেচার, সাক্শন সব করে তবে আনে। বাঁচায় ও, অথচ ও হল কোয়াক, আমি ডাক্তার।'

'সাকশন করা কি ঠিক ?'

'ওর দাঁত আর মাড়ি ভাল। দেবেন সিরাম ?'

'দেখছি।'

'আপনার ভগ্নীপতিকে বলুন না ?'

বসন্ত হেসে ফেলে। বলে, 'খবরটা সবাই জানে, তাই না? অথচ হিমাদ্রিদা এখানে আসেননি, আমিও কাউকে বলিনি। তবু সবাই জানে।'

'ছোট জায়গা ত!'

'বলব।'

ভগ্নীপতি বসন্তর ওপর খুশি হন না! বলেন, লিখে দিচ্ছি, কলকাতায় এখানে গেলে পাবে। খানিকটা পাবে। তবে আমার নাম যেন জানাজানি না হয়। হেল্থ-ডিরেকটারেট কিছুই করে না। কলকাতার হাসপাতালগুলোই সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয়। মফঃস্বলে হেল্থের ব্যাপার একেবারে আদিম অবস্থায়। হেল্থ সেন্টারে ওষুধ দেবে! হেল্থ সেন্টার! কটা জেলা-সদর হাসপাতালে ও. টি এআর-কন্ডিশন্ড, এক্স-রে মেসিন ফাংশান করে, রুগীর বিছানা পরিষ্কার? ওয়ার্ডে কুকুর ঘুরছে! এবার লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ও নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। আমি চাকরি করতে এসেছি, চাকরি করে শান্তিতে থাকতে চাই। বাঘের ঘরে ঘোগ ঢুকে গেছে। তোমার দু দিনের উৎসাহে কিস্সু হবে না।'

বসন্ত কলকাতা চলে যায় ও অ্যানিটসিরাম নিয়ে ফেরে। যাঁর কাছে যায়, তিনি, "অ! অ্যান্টিসিরাম!" বলে ঝিমিয়ে পড়েন ও দিয়ে দেন। তারপর, বলা উচিত বিবেচনায় বলেন, 'এর আবার সব রিঅ্যাকশন আছে।'

'জানি।'

'কি জানেন ?'

'ও তো আমাদের ইনস্টিটিউটেই তৈরি হয়। আচ্ছা, এগুলো কি এখানেই থাকে ?'

'আমি ত তাই দেখছি। দেওয়ালের শোভা আর কি!'

বসন্তর আবারও মনে হয়, যদি বাজারী ওষুধ হত! তারপরই তার বিপক্ষীয় যুক্তিগুলি ওর মনে জাগে এবং হতাশ লাগে ওর। সর্পদংশন কোন ওষুধ কোম্পানিকে আগ্রহী করতে পারে না। কেন না সাপ কামড়ায় চার লাখ মানুষকে, মরে হাজার বিশেক। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বহু বছর ধরে ওই বিশ হাজার মৃত্যুর পরিসংখ্যান থেকে যাচ্ছে প্রায় এক চেহারায়। ভারতে কি সাপ ও মানুষে কোন সমঝোতা আছে?

বেশ, ওষুধ কোম্পানি না করুক, সরকার তো তৈরি করছে ওষুধ। গোখরো-কালাজ-চন্দ্রবোড়া ও অহিরাজের বিষে ঘোড়াকে হাইপার-ইম্যুনাইজ করে ঘোড়ার প্লাজমা থেকে। প্লাজমাকে রাসায়নিক উপায়ে শুকিয়ে। এই শুকনো অবস্থায় অ্যান্টিভেনম বহুকাল থাকে।

তৈরি করে যদি, বণ্টন করে না কেন? কলকাতায় ওষুধ গুদামজাত করে লাভ কি? কেন সাপে-কাটার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা কলকাতায়? কলকাতার চৌকাঠে থেকেও ইরফানপুর হেলথ্ সেন্টার ও বেহুলা ব্লক কেন কালাজের দয়ায় বাঁচবে?

হেদো নস্কর ইট বেচে দিল না কেন? হেদো নস্করদের শাস্তি দেবার উপায় প্রশাসনের হাতে নেই কেন?

এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের একটি কথা ওর মনে পড়ে এবং স্টেরাইল-পাইরোজেন মুক্ত-ফিজিওলজিক্যাল সল্ট সল্যুশন কেনার সময়ে ও সিরিঞ্জও কেনে দুটো, একটি টর্চ এবং আন্দাজে সাইজ আঁচ করে ফুটপাত থেকে কৃত্রিম স্যান্ডাকের পাম্প্‌শু।

ইচ্ছে করেই সন্ধ্যার ট্রেনে ফেরে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারকে বাড়িতে গিয়ে ও অ্যান্টিভেনম ও সল্যুশন দেয়। বলে, আমার নাম যেন কোন মতে জানাজানি না হয়। তাহলে আমি-আপনি ফেঁসে যাব।

ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়ে ও বলে. 'কোনদিন ভুলব না ভাই! সাপে-কাটা রুগী ইঞ্জেকশন নেই বলে গ্যাঁজলা তুলে মরে, সে চোখে দেখা যে কি কষ্টের!'

বসন্তর মনে পড়ে, হেল্‌থ-সেন্টারের মলিন, চটা ওঠা, ফাটল ধরা দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার-কাটা সাঁইবাবা-বামাক্ষ্যাপা ও মা সারদামণি-রামকৃষ্ণের ছবি। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা, প্রশাসনের নির্মম ঔদাসীন্যে বিফল হলে হতভাগ্য ডাক্তার বোধহয় উক্ত মহান পুরুষ ও রমণীদের মুলগাঁওকর অঙ্কিত প্রতিকৃতি থেকে ভরসা খোঁজে। কিন্তু কালাজ কামড়ালে সাঁইবাবার ছাই ও মধুও বিফল।

ও বলে, 'ট্রেনিং নিয়েছিলেন নিশ্চয়?'

'কিসের?'

'অ্যান্টিভেনম দেবার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'অ্যান্টি-রিঅ্যাকশনের ওষুধপত্তর আপনি যে করে হ'ক, জোগাড় করবেন।'

'করব।'

'চলি তা হলে।'

'ওগুলো আপনি নিচ্ছেন?'

'রাখলাম কিছু।'

'প্রচুর মরে, জানলেন?'

'জানি।'

'অন্ধকার বড্ড যে?

'টর্চ আছে।'

অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে বেহুলার দিকে চলতে চলতে বসন্তর মনে আজ আনন্দ হয়। যে কারণে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে ও যে কাজ করতে এসেছে তার কোন যোগ নেই।

পরদিন ও শ্রীপদকে টর্চটি এবং জুতো জোড়া দেয়। বলে, 'এমনি দিচ্ছি না কাজ করিয়ে নেব।'

'আমাকে দিয়ে?' শ্রীপদ জুতো জোড়াটিতে হাত বোলায়, গন্ধ শোঁকে এবং ভাষাতীত কৃতজ্ঞতা চোখে নিয়ে বারবার বসন্তর দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ। এখন মনে করে বলুন, এমন কোন রুগী পেয়েছেন, যাকে কালাজ কেটেছে, তেমন বিষ ঢোকে নি, আপনি সব চেষ্টা করেছেন, রুগী কয়েক দিন বাদে মারা গেছে?'

'ভুনি দাসী।'

'সে কে?'

'শ্মশানের ডোম, সাগরের বউ।'

'কেসটা বলে যান।'

'লিখবেন?'

'হ্যাঁ।'

'চা বলি?'

'বলুন।'

'রাধি, চা কর্ মা এট্টু।'

'বলুন।'

'ভুনি দাসী ঘুমোচ্ছিল। মাটিতে শোয়া হেতা, চ্যাটাই পেতে, ঝানেন ত সব। তা হাতের কেড়ে আঙুলে কাটল। আমারে ডাকল, তা গেলাম। ঝেরে বাঁদন দিলাম, চিরলাম, রক্ত চুষলাম। রাতভোর সেতা রইলাম। তা বেলা হতে বিপদ সারল। তাতেও বাঁদন খুলি নি। ঠাঁই সইরে দিয়ে থুয়েছিলাম । সাঁজ নাগাদ বেশ কতা কইলো, চোকে পষ্ট দেকল, দেকলাম রক্ত পড়লে হাওয়া লেগে জমচে। হাতে দিব্যি সাড়, ছুঁচ ফোটাতে গাল দিলে। আমি চলে এলাম।'

রাধি চা আনল। চা খেল ওরা। দুধহীন গুড়ের চা পরম তৃপ্তিতে চেটেপুটে খেয়ে গেলাসটা নামিয়ে শ্রীপদ বলল,'পরদিন সাগর ডাকলে। ঝেয়ে দেকি, হাঁ বাঁদন খুলে দিচলাম, তা ঝেয়ে দেকি, ঝেদিনে সাপে কাটে, সেদিনে পায়ে বাঁশের চোঁচ ফুটে ব্যতা হইছিল, সেই পা ফুলে উঠেচে, বুকে ফিক ব্যতা, আর ক্ষ্যানে ক্ষ্যানে বেহোঁশ হয়ে পড়তেচে। হোঁশ আসতে বলে, শ্বাস নিতে পারচি না, বুকে ব্যতা গো! তকনি ইরফানপুর নে ঝাওয়া হল। বাঁচল নি।'

ডাক্তার কি বললেন?

'বলল, তুমি ত সাপে কাটার চিকিচ্ছে ঠিকই করিছিলে ছিরিপদ, কিন্তুক ওর শরীলে কিচু ছিল নে, তাতে ওই ঝে বাঁশের চোঁচ, তাতেও বিষক্রিয়া হল।' শ্রীপদ নিষ্ফল ক্রোধে থুথু ফেলল। বলল, 'ডাক্তারের সেতাও ইঞ্জিশান ছিল নে ঝা ঝা দরকার। যুবতী মেয়ে-ছেলে, তিন সন্তানের মা, ধনুষ্টঙ্কারে বেঁকে গেল। আর কি গ্যাঁজলা মুকে। ছেলেদের মানুষ কত্তে সাগর এই সেদিনে বিয়ে বসল। সাতটি মাস বেচারী কেঁদে কেঁদে মরেচে।'

'এই একটা?'

'আরো আচে। স্বচক্ষে দেকিয়ে দেব। আচেন ত একন? দেখতে পাবেন। আচ্ছা, সাপের বিষ নামল, তাতেও বিষক্রিয়া হল?'

'হয়।'

'নিবারণ কিসি?'

'তখন ডাক্তার বিনা গতি নেই।'

'ওষুধ নি, ইঞ্জিশান নি, ডাক্তার কি করে?'

'রুগী মরে।'

'আমাদের মরণ সর্বত্তর।'

'এবার শুনুন। ইঞ্জেকশনের ছুঁচ, ওষুধ সব এনেছি। আপনাকে শেখাব।'

'আমাকে।'

'আপনাকে।'

'আপনি বলচ, আমি পারব?'

'পারবেন। এবার কোন কেস হলে আমি কি ভাবে কি করি দেখে নেবেন।'

'ছেলেরে পড়াচ্চি, সে দেকলে হতু না?'

'সেও দেখুক। আপনি ত চিরকাল থাকবেন না।'

'আমি পারব?'

'পারবেন। আমি জানি, তাই শিরায় ইঞ্জেকশন দিই। আপনি দেবেন হাতের বা পায়ের এমন জায়গার ওপরে। চামড়ার নিচে। কতটা দেবেন, কিভাবে মেলাবেন, আমি বুঝিয়ে দেব। যে সিরাম আছে তাতে অনেক দিন যাবে।'

'খারাপ হয়ে যাবে নে?'

'না।'

'আমি ইঞ্জিশান দে বাঁচাতে পারব?'

'নিশ্চয়।'

'শ্রীপদ দু হাত মাথা চেপে বসে থাকল। তারপর চোখ মুছে বলল, 'পিত্তিপুরুষ গোঁসা হবে। হ'ক। আমারে ভগবান সবে ঝেনে আসে। কিচু কত্তে পারি নে গো। তেনারা ঝে বিদ্যে চাইপে দে গেচে, সে একন এক জগদ্দল বোঝা। নয় মন্দ হলাম, বেপতে গেলাম, মানুষ ত বাঁচবে!

'হ্যাঁ, বাঁচবে।'

'তবে শেকাও?'

'শেখাব, শেখাব।'

শ্রীপদর শেখার ক্ষমতায় বিস্মিত হয় বসন্ত। বসন্ত প্রথমে ওকে, নিজের ঘরে বসিয়ে হাতের ও পায়ের পেশীতে, চামড়ার নিচে ডিস্টিল্ ওয়াটার ফোঁড়ে ও দেখায়। তারপর বসন্তর ওপর ও শেখা প্র্যাকটিস করে। ফলে দুজনেরই হাতে পায়ে ব্যথা হয়। কিন্তু শ্রীপদ খুব তাড়াতাড়ি শেখে।

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও গরম জল ব্যবহার করতে শেখায় বসন্ত। ফুটন্ত গরমজলে

তাপ দিতে শেখায়। দুজনেই বেজায় উত্তেজিত ও আনন্দিত। শ্রীপদ বলে, 'আপনি মোরে ঝা শেকাচ্ছ তাতে মানুষ বাঁচে। মানুষ বাঁচলি বিষহরির কোপ নি।'

'কিসের কোপ?'

'তাই ত বলি! ঝে ঝুগে ঝা মন্তর! শালারা ছেলে বিয়োতে বউরে হাসপাতালে দেচ্চনা? টাইফায়েট হলে সেতা যাচ্চ না? সাপে কাটলে ডাক্তারে ইঞ্জিশান থাকলে দেচ্চে তা নেচ্চ না?

বসন্ত হেসে ফেলে। কলকাতার অদূরে এই নির্বান্ধব বেহুলায় অবস্থিতি শ্রীপদর কারণে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। শ্রীপদ বলে, 'শিয়র চাঁদার স্তি-পুরুষে বিয়ে পৌষ-মাঘে। এবার শালা অঘ্ঘানে ধান কেটে সবাই চাঁদা করে কেরাচিনি কিনব, পাঁজায় আগুন দে বংশ লোপাট করব। ওঃ, সাপের আড়ত কি, ঝেমন মনসাপুরী!'

এর পরেই হেদো নস্করের বালক মাহিন্দার শশী, সাপের ভয় ভুলে পাঁজা থেকে চারটি ইট সরাতে যায় এবং উরুতে রুষ্ট কালাজের ছোবল খায়। বসন্তকে ডেকে পাঠায় শ্রীপদ। বলে, 'বসাতে পারে নে গো, দাঁত ঘেঁষে দেচে মাত্তর!'

শশী ধরেই নেয় সে মারা যাচ্ছে এবং মনস্তাত্ত্বিক বিকলতায় কালাজে তেজুতে কামড়ের লক্ষণাদি ডেভেলপ করতে থাকে। শ্রীপদ ওকে প্রবল চিৎকারে গাল পাড়ে ও বলে, 'ঢং দেকাস না শশী!'

বসন্ত এসে দেখে বাঁধন ছাঁদন শেষ। জল গরম হচ্ছে, নিসাদল রেডি। ও বলে, 'দিন ইঞ্জেকশন। যেমন দেখিয়েছি।'

'ছিরিপদ? ইঞ্জিশান দেবে?' সবাই খুব ঘাবড়ে যায়। শ্রীপদ এখন প্রখ্যাত বালককে অ্যানটিরেবিড ইঞ্জেকশন দান কালে লুই পাস্তরের আত্মবিশ্বাসে গর্জে ওঠে, 'বিষহরির আজ্ঞায় ঝা কচ্চি তাতে যদি বিশ্বেস না পাস তো ভাগ শালারা!'

ও ইঞ্জেকশান দেয় এবং চেঁচাতে থাকে,

''মা মনসা দয়া করে বিষয়ে পেরি ধরি।
ভুজঙ্গজননী ভুজঙ্গের বিষ নিলেন হরি।।
বিষ গেলেন সপ্ত স্বর্গের উপর দিকে।
মা মনসা দোহাই দিলেন শঙ্কর পিতার।।
বিষ গিয়ে শঙ্করের হল কণ্ঠহার।
জয় জয় শুভঙ্কর শঙ্করের দোহাই।।

বিজ্ঞান ও বিষহরি, উভয়ের সাধনা শ্রীপদ সুকৌশলে চালাতে থাকে। গরম জলে নিসাদল ফেলে ক্ষতস্থানে ঢালে। গরম জলের তাপ দেয়। ইঞ্জেকশান দেবার একঘন্টা বাদে বাঁধন বদলে অন্যত্র বাঁধে এবং চেঁচাতে থাকে।

''ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনি যার।
ধ্বনি বলিতে বিষ নাই আর।।
হাড়ে মাসে ধ্বনি ফুটে।
ধ্বনি উড়িতে বিষ না উঠে।।''

বসন্ত যখন বলে, শশীর আর প্রাণের আশঙ্কা নেই, তখন শ্রীপদ তার ঝোলা গোছায়। শশীর মাকে বলে, 'নস্করের ঠেঙে চাল-ডাল মেঙে এনে মায়ের ভোগ দে। খুব চিল্লিয়ে কাঁদবি। বলবি, তোমার ইটের পাঁজা হতে সাপ কাটল, তোমারে দিতি হবে।'

'সে আর বলতি? দুগ্‌গো ক্যাওরানী হেদো নস্কররে ছেড়ে দেবে? ওই পাঁজা হতে সব্বনাশ হচ্ছিল! তা ছিরিপদ! মা আজ্ঞা দেচে ইঞ্জিশান দিলে?'

'ব্বাপ রে, তেনার আজ্ঞা না হলি পারি? এত অবিশ্বেস কেন গো? জান দে তোমাদের জান রাকি, তা কোনদিন কলাটা কচুটা নিচ্চি? তোমরা বাচা গুখেগো, ডাগলে পরে না এলে ঠিক হতু।'

শশীর মা শ্রীপদর পায়ে পড়ে ও সমবেত সবাই শশীর মাকে গাল পাড়ে। শ্রীপদ দক্ষ অভিনেতা। ও বোঝে মঞ্চ এখন তার। তাই বলে, 'আরো কতা আচে, সবাই শোন!'

'বল হে। মরা ছেলে জীয়ালে তুমি!'

'মায়ের সেবক, মায়ের সেবক, তিনি না বললে পারি? তিনিই স্বপ্ন দেলে বসন্তরে পাট্যো দিচ্চি। সে তোরে শেকাবে সকল। বললে বেউলোর আবুস্তা দেকে মনে বড় কষ্ট!'

'বল গো!'

'হেদো নস্কর সরকারের কেরাচিনি নে ঘরে ডিম ফোটাচ্ছে। ওর পাঁজা হতে সব্বনাশ, তা ও দেবে নে! এবার অঘঘানে ধান তুলে দে আমরা সবাই চাঁদা তুলে কেরাচিনি কিনব।'

'কিনে?'

'পাঁজায় আগুন দে শিয়রচাঁদার বংশ নিবংশ করব। নইলে বাঁচবুনি।'

'তাই হবে! তাই হবে!'

বেরিয়ে এসে শ্রীপদ বলে, 'এখন নাচতেছে সব! তকন দেকবেন সবাই পাশ কাটাবে। নিঝের ভাল নিঝে বোঝে নে এরা। সবাই গুখেগো।'

তারপর বলে, 'আজ এট্টা কি দিন! আমি ইঞ্জিশান দিলাম, শশে বাঁচল? অ্যাঁ?'

'কিন্তু স্বপ্ন-টপ্ন, ও কি বললেন?'

'সত্যি!' শ্রীপদ বসন্তর হাত চেপে ধরে। বলে, 'মায়ের আমার অনেক দয়া গো! আপনারে "হ্যাঁ" বলে থেকে মনস্তাপ হইছিল খুব। তা রাতে মা ওই শিয়রচাঁদার গওনা পরে স্বপন দেকাল। বলল, ঝা তুই। ওরে আমি পাট্যেচি।'

বসন্ত বোঝে, শ্রীপদর স্বপ্ন দেখাটি অটোসাজেশন। ওইভাবে ও আদিম বিশ্বাসের কাছে এখন অবিশ্বাসী হয়ে বিজ্ঞানে উত্তরণের জন্যে ক্ষমা চাইছে। এও বোঝে, শ্রীপদর মনের এসকল জট ওপড়ানো ওর সাধ্যি নয়। শ্রীপদর পক্ষে অন্ধকার ত্যাগ করে জ্যোতির্ময় হওয়া সম্ভব নয়। অন্ধকার ও আলো সহাবস্থান করবেই। কেননা, নামেই বিংশ শতকে আছে শ্রীপদ। আসলে নাগরিকের সকল সুবিধায় বঞ্চিত অন্ধকার জীবনে ওর বাস। বিষহরিকে বর্জন করা ওর সাধ্য নয়।

শ্রীপদ বলে, 'কাল হাটে ঝাব। কাল রাতে আমার ঘরে খেতে হবে কিন্তু। এ আমার গুরুদক্ষিণা।'

'খরচ করবেন?'

'করব না? শালার মাচ আনব, আলু আনব, আমার পরিবার সরা পিঠে ভাজবে। খুব খাব।'

বসন্ত সকালে ইরফানপুর চলে যায় ও দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসে। সন্ধেয় বেরোবার সময় হেদো নস্কর বলে, ছিরের বাড়ি খেতে যাচ্ছেন! এতে ছোটলোককে আশকারা দেয়া হয়।

বসন্ত হাসে ও বলে, 'ও আমার বন্ধু।'

'বন্ধু!'

'হ্যাঁ। আর, আমি ত এখানে থাকব না। আমার জন্যে ও আশকারা পাবে না।'

হেদো সত্যিই বিভ্রান্ত। সে বলে, 'নকশালরা এসব বলত বটে। আপনি ত তা নন?'

'না, না, মোটেই নয়।'

'গ্রাম দেশ! সমাজ আচে হেতা।'

'আমি চলি।'

ছিরে না কি ইঞ্জিশান দিয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'বিষহরির আজ্ঞায়?'

'তাই তো বলছে।'

'মা আজ্ঞা দিল?'

'কি করে জানব বলুন? ও-ই পুজো করে, ও-ই জানে মিছে কথা বলার মানুষ কি?'

'না না! জিব খসে ঝাবে সে কথা কইলে। তা দিক। গাঁয়ের ভাল হ'ক।'

'ভালই হবে।'

'আমি ত শুনেই শশের মারে চাল-ডাল-মসলা দিইচি। মায়ের ভোগ দিক। বেটা বাঁচল।'

'ও বাঁচল, কিন্তু আপনার পাঁজার ব্যবস্থা না করলে সবাই বাঁচবে না।'

'দেকি। দর পেলেই ঝেঁপে দোব।'

শ্রীপদর বাড়িতে টেমির আলোয় হাঁসের মাংস, কচুঘণ্ট ও ভাত খাওয়া হয়, রসগোল্লা খাবার পর শ্রীপদ বলে,

'মায়ের গান শুনবেন?'

'নিশ্চয়।'

মনসামঙ্গলের গান। রাত বাড়ে। শেয়াল ডাকে। চারদিক নিঃশব্দ। বসন্তর মন ভরে যায়, ভরে যায়।

কয়েকদিন বাদে তামলীতে ডাক পড়ে শ্রীপদর। স্কুলের মাস্টারকে সাপে কেটেছে। শ্রীপদ যায়, চেষ্টা করে খুব। কিন্তু সাপে কাটার পর আট ঘণ্টা কেটে গেছে বলে মৃতদেহেই চেষ্টা করতে হয়। এতে বসন্ত বোঝে, শ্রীপদর একটা নতুন পরিচয় গ্রামাঞ্চলে ছড়াচ্ছে। তামলীতেও সাপের ওঝা আছে ভূষণ মাল। ভূষণই শ্রীপদকে ডাকতে বলেছে। এটি খুবই দ্যোতক! ভূষণ স্বগ্রামে শ্রীপদকে ডাকা মানে শ্রীপদর ইঞ্জেকশন দেবার কথা সে জেনেছে।

এই ভাবেই দিন যায়। শ্রীপদ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের সহায়তায় বসন্ত, তার পেপারের কাজ করে চলতে পারে! ঘোড়ার প্লাজমা-সিরামে যারা অ্যালার্জিক নয়, তারাও প্রতিরোধহীন শরীরে সেকেণ্ডারি সিম্পটম্ ডেভেলপ করে মারা যেতে পারে। খাদ্যহীন, পুষ্টিহীন শরীর। শোথ, স্ফীত প্লীহা, উদারময়, দাঁতের ক্ষত, ঘা এদের নিত্য সাথী। অতএব অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়!

মরে, মানুষ মরে। কিন্তু যে সব রুগী বেঁচে যায়, তারা ডাক্তারকে মনের জোর জোগায়, শ্রীপদকে। শ্রীপদর কাছে বসন্ত নতুন করে সব শেখে। সর্পদষ্ট রোগী ভয়েও মরে, তা বসন্ত পড়েছে।

সে ভয়ের চেহারা, রক্তমাংসের চেহারা শ্রীপদ ওকে দেখিয়ে দেয়। বলে, 'রাজীব ধোপার মরণটা দেখলেন? আমি গেলাম হাটে। ওরে কাটল ঢ্যামনা, ডাকল বামনা। ভয়ের চোটে বুকের ধুকধুকি থেমে গেল। বউ কাঁদল, কোতা গেচলে বাবা গো, তুমি রইলি ওর কিচু হতুনি। ঢ্যামনা কাটলি মনে জানে তিনি কাটল। বাস্! এতেই আমাদের শাস্তরে বলেচে রুগীরে একা রাকবে নি, বকে হ'ক, মেরে হ'ক, মনে বল জোগাবে।'

'ভয়ে হার্টফেল করল।'

'এ ভয়ের নিরসন কী,বল?'

'ছেলে শিখছে?'

'নিশ্চয়? বেটা মন্তরতন্তর শিখতে আসেনে। একন ইঞ্জিশানে খুব উৎসাহ। তবে লক্কন তো বোজে নে সকল? ওর হাতে ছাড়ি নি।'

'বাঁধন না বদলালে গ্যাংরিন আর ঝপ করে খুললে মরণ, সেটা শেখাবেন।'

'সব, সব শিকুচ্চি। পয়সা ত নিই নি, তাতে নিশিকান্ত জেলে এট্টা কাঁটালকাটের বাক্স করে দে গেচে। ওর মারে বাঁচালাম? বলে, এতে ওষুদ ইঞ্জিশান রাকো। মায়ের নামে দিব্বি। তুমি আর তোমার ইঞ্জিশান একন ভস্সা। তা আপনার কাজ হচ্ছে?'

'নিশ্চয়। এখানে না এলে জানতেই পারতাম না উপোসী শরীরে ইঞ্জেকশান পড়লেও কত লক্ষণ দেখা দেয়, কী ভাবে মানুষ কষ্ট পায়।'

'হেদোরে তো কাটবে নে। তা'লে ঝানতেন হাতির আহার করা শরীলে কী কী লক্ষণ দেকা ঝায়। ওরে সাপেও কাটবে নে। কাটলে বুঝি বা সাপই মরে ঝাবে! বাপ রে! নস্কর বলে কতা!'

'আমার যাবার সময় হল।'

'সে ভাবলি ত কষ্ট হয়!'

'আবার আসব হয় ত।'

'দেকুন! কাজে পড়লি কি আসা চলে? না একবার বেরুলি এই গয়েলে আবার গরু সাঁদায়?'

'আপনার মনসার গায়ে ও কি কালাজের চামড়ার গয়না? বেশ দেখতে হয়েছে ত?'

'ওই, মাত্তে হয়, চামড়া খসিয়ে গওনা কত্তে হয়। আমাদের ঝা নিয়ম। মালেরা নিয়ম রাকে নে সবে। একন ত দাঁড়াস মাত্তেছে, চামড়া বেচতেছে কলকেতায়। গোখরো পেলি ত দুনো লাভ।'

বসন্তর চলে যাবার সম্ভাবনায় হেদো নস্কর খুবই খুশি হয় ও ইরফানপুরে থানায় বসে মনের কথা বলে আসে। বলে, 'হাকিমের শালা, তাতেই কিচু বলি নে। নইলে নকশালের কাঁদে হাগতেচে। ছিরিপদর সঙ্গে ওটা-বসা। ছোটজাতরে ইঞ্জিশান দিতেচে, সেতা ভাত খাচ্চে। ধান ওটার কালে বেটাদের বাগে রাকা মুশকিল হবে। ওর দুদিনের খেলা, আমাকে মেরে থুয়ে যাচ্চে।'

'কোন গণ্ডগোল পাকাচ্ছে না কি ?'

'পাকায় নি বটে, কিন্তু গেরামের হাওয়াটা তো পালটে দিল ? ছিরে মাল জুতো পায়ে, টচবাতি জেলে ঘুত্তেছে ? ছোট জাত ঝকন জুতো পরবে, তকন ঝানবেন ঘোর কলি। কী ? না সাপে কাটবে। কাটবে ঝকন, তকন কি জুতো পরে আটকাবি ? তোর সাদ্যি আচে ?'

বিষহরি সম্ভবত হেদো নস্করের কথাগুলি শোনেন।

রাতে ঘুমের মধ্যে বসন্ত শোনে দরজায় ধাক্কা এবং কার বিপন্ন কণ্ঠে ডাক। ধড়মড় করে ওঠে ও, দরজা খোলে। স্বয়ং হেদো নস্কর, আরো কয়েকজন, শ্রীপদর ছেলে পতিত। পতিত কেঁদে ওঠে, 'ইঞ্জিশান নে চল বাবু! বাবারে...বাবারে...!'

'শ্রীপদকে ?'

'হ্যাঁ বাবু, ঘুমের মদ্যে বগলে....'

হঠাৎ জায়গাটি তীব্র আলোয় ঝল্‌কায়! শশীর হাতে পেট্রোম্যাক্স। জ্বলছে। হেদো নস্করের কণ্ঠেও ভয়। শ্রীপদকে সাপে কাটার গুরুত্ব তিনিও বোঝেন যেন। বলেন, 'আলো নিয়ে যাই।'

'আপনি যাবেন ?'

'ছিরিপদ....!'

বসন্ত টর্চ নিয়ে দৌড়য়। কাঁধে ঝোলা। শ্রীপদকে সাপে কাটল। শ্রীপদকে ?

উঠোনে ও ঘরে ভিড়। সকলকে ঠেলে সরায় বসন্ত, ভেতরে ঢোকে। কারা কেঁদে ওঠে, 'মালরে বাঁচিয়ে দাও বাবু। ও নইলে বাঁচবুনি!'

শ্রীপদ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। সামনে একটি নিহত কালাজ। শ্রীপদর হাত তুলে স্ত্রীর কাঁধে রাখা। স্ত্রী অঝোরে কাঁদছে। বগলে চেরার ক্ষত। শ্রীপদর দু চোখে ঘুম। চোখের পাতা নামছে বারবার, টেনে টেনে খুলছে।

'শ্রীপদ ?'

'বাবু ? বসন্ত বাবু ?'

'গরম জল ফোটাও কেউ, অনেক জল। হ্যাজাক এখানে রাখ। শ্রীপদ! আমি ইঞ্জেকশান দিচ্ছি।'

ইঞ্জেকশান দিতে বসন্তর হাত কাঁপে। শ্রীপদ ক্ষীণ হাসে ও অনেক দূরে চলে যেতে যেতে বাতাসে গলা ভাসিয়ে দিয়ে সুদূরের কণ্ঠে বলে, 'বাঁদন দিতে চাইল পতিত, বাঁদন কোতা দেবে ?'

'শ্রীপদ! সবচেয়ে বেশি ডোজ দিলাম।'

'দাও!'

বসন্ত নির্মমভাবে শ্রীপদর বগলে কাটতে থাকে। শ্রীপদ আবার হাসে ও বলে, 'কোন সাড় পচ্চি না। কাজ হবে নে বাবু। তুমি বোস!'

গরম জল। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। প্রত্যেকটি চেষ্টা বৃথা জেনেও বসন্ত যুঝতে থাকে।

শ্রীপদ অনেক দূর থেকে বলে, 'হোতা কাটলে কি কাজ হয় বাবু? বগলে আর হাটো তফাত নি, তুমি ঝে বল?'

'শ্রীপদ, তাকাও!'

'চোকে দিষ্টি নি বাবু! আর ঘুম! আর ঘুম!'

'গরম জলের হাঁড়ি? কম্বলের আসনটা দাও।'

কম্বলের পুজো করার আসনে বগল জড়িয়ে গরম জলের ভাপ। সাড়া নেই শরীরে, সাড়া থাকে না। বসন্ত শ্রীপদর নাড়ি দেখে, বুকে কান পাতে।

শ্রীপদ অমানুষী চেষ্টায় চায় ও জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'ইট বেচল না নস্কর!'

বসন্ত কান চেপে থাকে বুকে। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। শ্রীপদকে আস্তে শুইয়ে দেয়। তারপর হা হা করে কেঁদে ওঠে ও মুখ ঢাকে। বেহুলার শতাধিক লোক এক সঙ্গে কাঁদে। রাতটা চমকিত হয়। কালাজের পুরোন চামড়ার শিরোভূষণ পরে পেতলের মনসা একই দৃষ্টিতে সস্নেহ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন।

সকাল হয়। সর্বনাশের সকাল যেন। কী করে খবর যায় কে জানে। তামলী, বকুলপুর, গাওটি ও ফুলে গ্রাম থেকে মালেরা আসে। এখন বসন্ত দর্শক মাত্র। এতে ওর কোন ভূমিকা নেই। কলার ভেলা তৈরি হয়। তাতে বিছানা। শ্রীপদর ধূসর শরীর শায়িত। মালেরা একে একে ভেলায় ছোট ছোট সরা রাখে। চালতুলসীপাতা। প্রণাম করে শ্রীপদকে:

বিশাল, গ্রামের পক্ষে বিশাল ও দীর্ঘ শবযাত্রা। সবাই হরিধ্বনি দেয় ও চোখ মোছে। পুরুষরা নির্লজ্জায় কাঁদে। বেহুলায় ভেলাটি নামানো হয়! সবাই এখন পাশে পাশে হাঁটে। ভেলাটি টানতে বৃদ্ধা বেহুলার মাজা ফাটে। অভিশপ্ত সে, অভিশপ্ত। ধীরে, অতি ধীরে ভেলা চলে। বসন্ত হাঁটতে থাকে। ভূতেপাওয়া মানুষ যেন। হাঁটতে হাঁটতে সবাই এবার থমকে দাঁড়ায়। বাঁওড়া। এখানেই ভেলা পাক খায়। নিয়ম। ভেলাটির দিকে চেয়ে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের চোখে অন্ধকার, এ রোদ ও দিনের দৃশ্য অন্ধকার।

কে যেন বলে, 'সাত বার ভেলা ঘোরাবে, তা বাদে ডুইবে নে তামলীতে তুলবে।'

তারপর সবাই বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে। কেন না ভেলাটি সকলকে চমকিত ও সন্ত্রাসিত করে মন্থরে পাক খায়, কেবলি পাক খায়। বাতাসে শ্রীপদর মুখের চাদর উড়ে যায় ও বসন্ত সভয়ে বোঝে, শ্রীপদর আধবোজা চোখে একা তার প্রতি অভিযোগ। তার তিরস্কার। মানুষ, সর্পদংশনভীত মানুষ রিসার্চ পেপার নয়, বিবাদী বাগের দপ্তরে দশমিক পরিসংখ্যান নয়। মানুষ বিনশ্বর। তাই মানুষের সহায়তা প্রয়োজন, ভয় দূর করা প্রয়োজন, প্রয়োজন তাকে বাঁচানোর।

শশীর মা ফুকরে ওঠে, 'অনাথ করে রেখে যাচ্চ বাবা, তাতেই ঝেতে পাচ্চ না? তাতেই ঘুরে ঘুরে দেকতেচ?'

তারপর যেন মৃত শ্রীপদ বোঝে, পিতৃদত্ত দায়িত্ব সে নিয়েছিল। তার সে দায়িত্ব নেবার

কেউ নেই। পতিত কিছুই শেখে নি। বসন্ত চলে যাবে। পিণ্ডদানের অধিকার সে পতিতকে দিয়ে গেল, কিন্তু তার উত্তরাধিকার নিতে কেউ রইল না। শ্রীপদর উত্তরাধিকারী ত পিণ্ডদান করলেই হওয়া যায় না! যেন গভীর হতাশায় শ্রীপদ নদীকে কিছু বলে। বেহুলা বাঁওড়ে এবার টেনে নেয় ভেলাটি।

বসন্ত ফিরে আসে। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে ও, অস্নাত, অনাহারী। সারা রাত।

সকালে ও হেদো নস্করকে ডাকে। বলে, 'কেরোসিন বের করে দিন। সরকারী কেরোসিন।'

'কী হবে?'

'দেখতে পাবেন।'

'কিন্তু, কী হবে তা না বললি...' হেদো নস্কর আরো কথা বলতে চায়। শ্রীপদর মৃত্যুতে সেও মর্মাহত। কিন্তু কেরোসিন মানে অথরিটি হাতে রাখা। বসন্ত ওকে কোন কথাই শেষ করতে দেয় না।

'আগে গ্রামের সকলকে ডাকব নস্কর বাবু, কেরোসিন বের করাব। তারপর এস. ডি. ও. কে জানাব। তারপর কলকাতায় গিয়ে যা করবার করব। আপনার ইটের পাঁজা...এস. ডি. ও. শুধু আমার ভগ্নীপতি নন, জবরদস্ত লোক। কেরোসিন আপনি এদের পারমিট থাকলেও দেন না, মজুত করেন। মজুত করেন আপনি, আমি জানি না? পঞ্চায়েতে প্রধান হয়েছেন! কীর্তিকলাপ জানলে প্রধান রাখবে আপনাকে?'

হেদো নস্কর, শান্ত ও নির্বিরোধী বসন্তর চোখে নিজের আপাত-পরাজয় সংবাদ পড়ে এবং তারও মনে হয়, বড় বেশি বিচ্ছিন্ন গ্রাম, থানা ইরফানপুরে। মনে ভিত্তিহীন ভয়। সত্তর-একাত্তরে এ-হেন ভয়ের তাড়নেই ও পালিয়েছিল।

'নিন, ক টিন নেবেন।' শুকনো গলায় বলে ও।

'এক টিন রেখে সব নেব। শশী! চরণ, সাগর, রাবণ, নিশিকান্ত সকলকে ডাক্। বিশ জন লোক চাই।' বসন্তর গলায় ও মনে হিংস্র আনন্দ। নস্করের পাঁশুটে মুখ দেখে এত আনন্দ পাবে তা ও বোঝে নি।

'হোস পাইপগুলোও দেবেন। গ্রামে আগুন নেভাতে সরকার দিয়েছে। আপনি বেগুন গাছে জল দেন।'

চরণরা সবাই আসে। বসন্ত বলে, 'টিন নাও, পাইপ নাও, তারপর যত পার খড় আন।'

চরণরা ওর দিকে তাকায়। শ্রীপদর মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাত, শোক, বিমূঢ়তা, সব সত্ত্বেও বসন্ত ওদের জীবনের উজানমুখী প্রবহমানতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'বড় বড় বাঁশ নিয়ে চল। মেয়েছেলে, ছোট ছেলে কাছে আসে না যেন।'

খড়ের আঁটি ছিঁড়ে পাঁজা করা হয়, পাঁজায় ছুঁড়ে ফেলা হয়, হতে থাকে। খড়ের নিচে ক্রমে চাপা পড়ে পাঁজাটি। পাঁজা ঘিরে খড়ের পাঁচিল। আগুন বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্মশান-ডোম সাগর বলে, 'ছেলেরা ঝেয়ে কূলগাছ্ কাট গা। শঁসানে বিস্তর। একবার আগুন ধরলি নিভবে না।'

চরণ বলে, 'ঘর ঘর হতে তুঁষ চেয়ে আন্ গা। শীতে আগুন পোহাবে বলে সকলা থুয়েছে।'

খড়ের পাঁচিল ও পাঁজা-ঢাকা খড়ে কেরোসিন স্প্রে করা হয়। বসন্ত বলে, 'এক সঙ্গে চারদিকে আগুন দেবে। ন্যাকড়া জ্বালিয়ে ছুঁড়বে! খড়ের পাঁচিল যেন না নেভে। সমানে খড় ফেলবে। সাপ বেরোতে দেখলেই লাঠি পেটাবে।'

'সে আর বলতে হবে নি বাবু, ছিরিপদরে খেয়েচে ঝকন, তকন আর বাঁচতে হচ্চে নি।'

আগুন জ্বলে। ধূ ধূ করে। সবাই সাগ্রহে দেখে। এবার বাইরে থেকে, অভ্যস্ত দক্ষতায় বাঁশের খোঁচা মেরে সাগর ডোম পাঁজা খুঁচিয়ে ইট ফেলতে থাকে ও বলে, 'সকলা খোঁচা মার্। সুমুন্দিরা নামুতে সাঁদাচ্ছে। হুই, হুই দেখ্!'

আগুনের তাপে ছিটকে পড়ে কালাজ। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, নতুন উদ্দীপনা পায়। খড়ের পাঁচিলে কাঠ পড়ে, কেরোসিনের পিচকিরি। সাপ বেরোতে থাকে। মরতে থাকে। গ্রামের লোকগুলির শোক, কালাজ বিষয়ে ভয়, হেদো নস্করের ওপর রাগ, সব উত্তরিত হয় এক্ষণিক প্রজ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে। □

মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ

জায়গাটি নওয়াগড়ের সীমানায় ও বাস-পথের ওপরে। নওয়াগড় ছিল এক ছোটখাট স্টেট বা বড় জমিদারি। জমিদারের ''রাজা'' খেতাব মিলেছিল। স্বাধীনতার বছরে রাজা সাহেবের বয়েস ছিল এক। তা সত্ত্বেও এখন সে রাজা সাহেব নামেই পরিচিত। তালুক চলে গেলেও রাজা সাহেব নিঃসম্বল হন নি। রাজ্যসমূহ হস্তান্তরের সময়েই বহু জমি প্রচলিত নিয়মে জনা পঁচিশ ঠাকুরদেবতার নামে খাসে রাখা গিয়েছিল। তবু রাজা সাহেবের ওপর চূড়ান্ত অবিচার ঘটে যায়। রাজ্য সরকার পাপ করে বসে। বাসরাস্তা ও রেলপথ হবার কারণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার খাস জমি আত্মসাৎ করে।

রাজা সাহেব কৈশোরেই ঘটে যায় এসব। দক্ষ রাজমাতা ও তার অনুগত ভকিল এই চূড়ান্ত অবিচারে মরমে মরে যান। তারপর ওদিকে রাঁচি ও পাটনায় উকিলী পরামর্শ। এদিকে রাজা সাহেবের দিনগুজরানের ব্যবস্থা, একই সঙ্গে চলতে থাকে। আবাদী-জমি জঙ্গল-কাটাই ঠিকাদারি ও কাঠচেরাই কারখানা, লরি-ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা, এগুলি পোক্ত করে নেবাব পর শুরু হয় প্রতিকারকল্পে ছুটোছুটি।

কোনো প্রতিকার হয়েছে ছয় বছরের চেষ্টায়। আজ নওয়াগড়ে বড় ধুম। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটি। রাজমাতা ট্রান্সপোর্টের একশো লবির ছুটি। রাজা সাহেবের আবাস ''শূরনিবাস'' থেকে রঙিন কাগজে ঢাকা মিষ্টান্নের ডালা থালা, তোহরিব কাছাবি, টাহাড়ের শিবমন্দির, ইত্যাকার জায়গায় সওগাত যাচ্ছে।

অনেকদিন বাদে নওয়াগড়ে সবাই যেন বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। রাজা সাহেব জানিয়ে দিয়েছেন, খুশি মনাও ধুম মচাও, ঘর ঘর দীপ জ্বালাও—যে যার খরচে। তা তেমন না হলেও সকলে যেন হালকা।

মাস দশেক আগে রাজা সাহেবেব জমির বাটাইদার চাষীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এরকম গত বছর আষ্টেক হচ্ছে। কোনো বারই পুলিস বসে যায় নি এখানে। প্রথমে রাজার লোক বাটাইদারদের মেরেছে, তারপর এসেছে পুলিস। বাটাইদারদের মধ্যে যাদের মনে করেছে পালের গোদা, ধরে নিয়ে গেছে।

এ রকম হয়েই আসছে, হয়েই থাকে। নওয়াগড়ের মাটি যত পুবনো, এসব ঘটনাও ততই পুরনো।

এব মধ্যে বছরে-বছরে বাটাইদারদের সংখ্যা বেড়েছে, খেতের শস্যের বাটা বা অধিকার বিষয়ে তাদের চেতনাও বেড়েছে। কোনো তৃতীয় শক্তি কাজ করছে বলেই পুলিসের সন্দেহ।

তৃতীয় শক্তিও না-কি এক দলে আবদ্ধ নেই। কৌন্ হো কমনিস্, কৌন হো আদিবাসী স্বার্থ সংরক্ষক, কৌন্ হো উগ্রপন্থ, লেকিন্ সব্ হি শালা গরিব কিষাণো কো মদত দেতে হ্যায়।

এতেই গড়বড় লাগছে এবার। তিন মাস আগে বাটাইদাররা যে লড়াই করে, তাতে

ওরা একটা কাপড়ে লিখেছিলো, মেহনত কা ফসল কা আধা বাট্টা পর্ হম্ লোগোঁকো মৌল্ অধিকার হ্যায়।

কাপড়টি দু'ধারে বাঁশে বাঁধিয়ে ওরা নিয়ে ঘুরেছিল। কথাগুলি যথেষ্ট অস্বস্তিজনক। বক্তব্যটি। ভাগচাষী, রাজা সাহেবের ভাগচাষী বলবে শ্রমোৎপাদিত ফসলে তার ন্যায্য অধিকার? এ তো ঠিক হয় না। আর ওদের মধ্যে লিখতে জানে কে? লিখে দিল কে?

রাজা সাহেবের মনে হয় গভীর বঞ্চনার বোধ। অবিচার, অবিচার। শোষিত তিনি, অত্যাচারিত। সরকার তাঁর জমি দিয়ে বাস ও রেলপথ করেছে। করেছে বলে তাঁর রাজমাতা ট্রান্সপোর্টের লরি ওই পথে কাঠ-কয়লা-শস্য-কুলি বইছে, রেলগাড়ির ওয়াগন বইছে তাঁর চেরাই তক্তা, এতো গৌণ কথা। সেই অবিচারের প্রতিকার না হতে বাটাইদারদের একি নতুন অবিচার? ফসলের ভাগ চাই, সরকারের শ্রমদপ্তরের নিয়ম মতো ভাগ চাই?

এবার বাটাইদাররা রাজা সাহেবের লোকদের ফসল ওঠাতে দেয় নি। বলেছিল, মার বেটাদের।—মারতে মারতে মথুরা সিংকে ওরা জখমই করে, চন্দন মলের বন্দুক নেয় কেড়ে। স্বয়ং রাজা সাহেবকেই গুলি চালাতে হয়। ওদের একদল মরে।

এতো হয়, হয়েই থাকে। নওয়াগড়ের মাটি যত পুরনো, এসব ঘটনাও ততই পুরনো। ঘুম পাড়াতে গিয়ে কোনো ঠাকুমা কোনো নাতিকে রূপকথা বলার সুরে বলে থাকে, উস্ কে বাদ আয়ে রাজা সাহেব! বোলে, কা দুখিয়া, ইয়ে কা খচড়াই হ্যায়? তোহার নানা বোলে, কা খচড়াই? ফসল দিয়া করো, ঔর তুমহারা হত্যারা সেপাই লোগোঁকো যানে বোলো। উস্ কে বাদ চালায়া রাজা সাহেব গোলি। মার দে তোহার নানাকো, ফাট গয়ে কলিজা ঔর খুন নিকলে যৈসে ভাদোঁ মেঁ গঙ্গা জী মেঁ পানি।

এই হয়, হয়েই থাকে। জমির ধনী মালিক আর গরিব কিষাণ-ক্ষেতমজুর-বাটাইদারের কাহিনী এই রকমই হয়ে থাকে। কেউ পারে না এ কাহিনী বদলে দিতে।

এবার তফাত ছিল। ওরা মারতে মারতে, মার খেতে খেতে শ্লোগান দিচ্ছিল,

মেহনত কা ফসল কা
আধা বাট্টা পর্
হম্ লোগৌ কো
মৌল অধিকার হ্যায়

এমনটি নওয়াগড়েব মাটির জীবনকালে ঘটে নি। ফলে পুলিস বসে গেল নওয়াগড়ে। দুখিয়ার লাশ চালান গেল। জখম লোক সব হাসপাতালে। শান্তিভঙ্গ ও আইনভঙ্গের কেস বাটাইদারদের নামে। হঠাৎ নতুন এক কাণ্ড। বাটাইদার ইউনিয়নও আদালতে আর্জি করে বসে আছে। তারাও লড়বে।

এই সব কারণে, নওয়াগড়ে পুলিস বসে যাওয়ায় সবাই খুব দমে। গুম্ মেরেছিল তিনমাস। তার মধ্যে রাজাসাহেবের কি প্রতিকার মিলেছে। বদ্ধ বাতাস যেন পাতলা হয়েছে। কি যে হয়েছে, সে কথাই মুখে মুখে।

ভিখারী দুসাদকে কেউ পাত্তা দিচ্ছিল না। দেবার কথাও নয়। অত্যন্ত ভীরু আর নিরীহ লোকটা। ঘুরে ঘুরে ছাগল চরানই ওর জীবিকা। ছাগলরাই কাজের একমাত্র সহায়, ছাগল

জাতি। ওদের যত্ন-আত্তি লাগে না। বহু রকম পাতা খায় ওরা, ঘাস তো খায়ই। বছরে একাধিকবার একাধিক বাচ্চা পাড়ে।

অন্য কেউ হলে ছাগল থেকে কপাল ফিরত বোধহয়। ভিখারীর যে কি কপাল। ওর ছাগপালে পরিবার পরিকল্পনা। দুই বকরি, এক বকরা—নইলে এক বকরি, দুই বকরা—ইসিসে বঢ়তাহি নেহি। কা কিয়া যায় মহারাজ। ভিখারী পোড়া-কপালে।

অন্য লোক হলে ছাগল চরিয়ে কপাল ফেরাত। তোর কপাল ফেরে না কেন?

কি করে ফিরবে? জঙ্গলে চরাই। লাকড়া নিয়ে যায়। শেয়াল নিয়ে যায়। এক পোয়া ছাতু দিয়ে দাও লালাজী, আর ওই লেবুর আচার এতটুকু, পাঁচ পয়সার। পাঁচ পয়সার নিমকও দাও।

বাস! ওই হয়ে গেল?

হাঁ লালাজী।

ভিখারী তুই ছাগল হাটে বেচিস না কেন? হাটে বেচলে বেশি দাম পাস্।

কা কিয়া যায়? আমাকে তো কেউ বেশি দাম দিতেই চায় না।

ভিখারী ভীরু হাসে ও নিজের অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের জন্যে যেন লজ্জিত হয়ে চলে যায়।

মাঝে মাঝে দেখা যায় ও কোলে বাচ্চা নিয়ে, ধাড়ি ছাগল তাড়িয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটছে। মুখে-চোখে ভীষণ ভয় আর উদ্বেগ। মুখের কোণে ফেনা। ভিখারী যখনই ভয় পায়, জিভটা শুকিয়ে ওঠে ওর। ঠোঁটের কোণে জমে ফেনা।

প্রথম প্রথম নওয়াগড়ের লোক অবাক হ'ত।

কি হ'ল, ও ভিখারী?

পুলিস আয়ি, পুলিস।

তাতে তোর কি?

বকরা উঠা লি যায় য়ো লোক।

পালায়, পালায় ভিখারী। জঙ্গলে আছে নেকড়ে, শেয়াল ছাগলের দুশমন ওরা। ভিখারীর একই দুশমন পুলিস। জঙ্গলে ঢুকে পড়ে ও, ঢুকেই দা দিয়ে গাছের ডাল কেটে ছাগলের খোঁয়াড় বানায়। তার মধ্যে ঢোকায় পশুগুলিকে। নিজে খোঁয়াড়ের মুখে বসে কাঁপে।

আর তো কিছু নেই ওর সম্পদ বলতে। ওর সম্পত্তি ওই ছাগলগুলি। না জমিজমা, না বউ-বাচ্চা, না কোনো কাজ। পরনে নেংটি, ছাগল চরাও। এ কোনো মন্দ কাজ নয়। যদি কখনো ছাগল হয় দশ-পনেরোটা, ভিখারী তখন আগে নিয়ে যাবে ওগুলি সুমাদির হাটে। অনে—ক টাকায় বেচবে। গাভীন্ বকরী রেখে স—ব বেচে দেবে।

তারপর একটা বড় ধুতি কিনবে। সব সময়ে কেনে ছোট ধুতি, লেংটি মতো পরে। একটা নতুন গামছা।

তারপর সুমাদি বা অন্য কোথাও দুসাদটোলিতে খোঁজ করবে। হাটে তো নাপিতরা আসে, তারাই বলতে পারবে। কোনো বিধবা, বয়স্কা দুসাদিনকে বিয়ে করবে। তখন একটা ঘরও হবে হয়তো। দু'জনে থাকলে ছাগল সংখ্যায় বাড়বে।

কিন্তু কিছুতে আর স্বপ্ন সত্যি হয় না ভিখারীর জীবনে। বাঢ়া গ্রামের দুসাদরা জঙ্গল-জমিতে

দুসাদটোলি করেছে। সেখানে ভালই ছিল ভিখারী। কিন্তু কা কিয়া যায় মহারাজ। নাঢ়ার গণেশী সিং মালিক থে য়ো। কি হ'ল তার সঙ্গে দুসাদদের, গণেশীকে মেরে ফেলল ওরা। পুলিস এসে গ্রামে বসল, আর দুসাদদের বকরি-বকরা তুলে নিতে থাকল। ভিখারীরও।

কত কেঁদেছিল ভিখারী। আর কিছু নেই আমার এই বকরা-বকরী সম্বল। কিন্তু পুলিস বোঝে না কিছু। শেষে রাঁকা দুসাদ বলল, গাভীন বকরি নিয়ে পালিয়ে যা। নাঢ়া গ্রামে কোনো গোলমাল নেই। মাঠ আছে চরাই করতে। বটগাছের নিচে থাকবি।

বটগাছের নিচে কাশের ঝোপড়ি। বকরীর বাচ্চা হ'ল। সে বাচ্চা বড় হ'ল। নাঢ়ার মালিক-পরোয়ার রাজপুত লোক সব। মাংস খায়। দেহে তাগদ খুব। তারা ভিখারীকে চেয়েও দেখেনি। মাংস খেলে বকরা কিনে নিত। দাম খুব কম দিত। আট টাকা, দশ টাকা। দশ-বারো-পনেরো সের মাংসের দাম কি তাতে হয়? কা কিয়া যায় মহারাজ? সব কি আর সকলের কপালে হয়? কিন্তু নাঢ়ার এক মালিক-পরোয়ার গোলি সে মার দি এক ঔরত কো। হোলির গানের দলে মেয়েটি ছিল। বাস্! নাঢ়াতে এসে গেল পুলিস। পুলিস আসতেই মালিক-পরোয়ার বলল, ভিখারী দুসাদের কাছ থেকে একটা বকরা নিয়ে আয়। তিন দিনে তিনটি বকরা পুলিসকে দিয়ে ভিখারী ভাগ গিয়ে।

সকলের জন্যে এ দুনিয়া বহোত বড়া না হোতা, ভিখারীকে লিয়ে দুনিয়া বহোতহি ছোটা। নাঢ়ার পর ভাঙা বুকে ভিখারী গিয়েছিল টাহাড়। টাহাড়ের শিব মন্দিরের পূজারী হনুমান মিশ্রকে প্রণামও করে এসেছিল।

কি চেহারা! টকটকে রং, শরীরে আলো বেরুচ্ছে। কৈসে না হোই? দেওতা রোজ দুধ খান, দুধে স্নান করেন, মহাদেব ভগবানের সঙ্গে কথা বলেন।

ভিখারী গিয়েছিল বনের আঁচলে দুসাদ-গঞ্জের টোলিতে। টাহাড়ের দুসাদরা ওকে খুব যত্ন করে ডেকে নেয়। ছাগল চরাই করার সময়ে এক বুড়ি দুসাদিন্ ওর গাভীন্ বকরি দেখাই-ভালাই করত। সে ওকে রেঁধেও দিত। ওরা বলেছিল, থেকে যাও। আমাদের সমাজে এক ঘর লোক বাড়ে। বিয়ের ব্যবস্থাও করে দেব।

বেশ ছিল ওখানে ভিখারী। কিন্তু দেওতার কাছে এল একদিন দারোগা। সাত দিন থেকে গেল টাহাড়ে, ঔর দেওতা বললেন, ভিখারী দুসাদ! বকরা দে দারোগাকে খেতে।

এটা যে বেচতে যাচ্ছিলাম দেওতা।

কি? পুলিস দারোগা হ'ল দেও-দেওতা ঔর বরাম্ভোনের পরে। সে খাবে, তাতে পয়সার কথা?

বকরা ভেট দিয়ে টাহাড় ছাড়ে ভিখারী। টাহাড়ের দুসাদরা দুঃখ করেছিল। কা কিয়া যায়? ভিখারীর তো তোমাদের মত মজদুরি কাম, খেতমজদুরি কাম, পোরমিট নিয়ে জঙ্গলের শুখা লাকড়িগুড়ানো কাম নেই। তার তো এই ছাগলগুলি সম্বল। ছাগল পালবে, বেচবে, পালবে, বেচবে। পুলিস যে তার জীবিকার একমাত্র উপায় নষ্ট করে দেয় বারবার।

খুব পছন্দ হয়েছিল টাহাড়ের দুসাদটোলি। তোমাদের চেয়েও গরীব বলে ভিখারীকে কেউ ছোট মনে করনি। বুড়ি মা রেঁধে দিয়েছে খাটো আর ধুঁধুলের তরকারি। হরোয়ার বউ, ছেলেকে দিয়ে পাঠিয়েছে করমচার আচার ছট পরবের প্রসাদ। হরোয়া একটা শজারু মারলে তার মাংস ভিখারীও খেয়েছে।

সব ছেড়ে শেষ অবধি নওয়াগড়। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার সুখচাঁদজী মানুষ ভাল। স্কুলের চালাঘরের পাশের বটগাছের নিচে বসে ভিখারীর সঙ্গে কথা বলে। অল্প বয়স, এ সব জায়গায় রীতকরণ বোঝে না। তাতেই বলে, রাতে তো সাবালকের পড়াই শিখাই, তুমিও চলে এস ভিখারী।

কা কিয়া যায় মহারাজ? ভিখারীকে তুমি পড়তে শিখাবে, বাস্? ভাগো ভিখারী নওয়াগড়সে। রাজাসাহেব ভাগাবে, পুলিস চলে আসবে, লালা সওদা বেচবে না, কুয়ার জল মিলবে না।

সুখচাঁদ বলে, কৈসে হোই?

কৈসে না হোই? এক টরচ বাতি দেখ্ কর হাম পুছল্ করল্, উসি কা কত্তে দাম হো, এ লালাজী? তো লালা, কিত্না গুস্সা হোই? কা ভিখারী, দুসাদ হো তু, ছোটো কাম করত্ রহল্, আভি কা টরচ জ্বালায়ে গা?

নওয়াগড়ে ভিখারী থাকে একটি ভাঙ্গা বাসের মধ্যে। ভাঙ্গা বাস, ভাঙ্গা লরি, স—ব কেনে রাজাসাহেবের ভকিল। জমতে জমতে অনেক হলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে লোহালক্কড় বেচে। সেখানেই থাকে। সেখানে থাকে কয়েক ঘর ভিখমাঙা। বাস ও লরির মধ্যে মধ্যে ঘাস ঝোপ। ছাগল চরে। ছাগলচরাই করার জন্যে মাঠঘাট নওয়াগড়ে এখনো আছে। ভিখারীর তো এত ছাগল নেই যে মাঠ নষ্ট করবে?

জঙ্গলে বসে এ সব কথাই ভাবে ভিখারী। ভাবে আর ভাবে। পুলিস লালাজীর দোকান লুটে নেয় না, গয়লাদের গরু কেড়ে নেয় না। যার যা আছে রাখতে দেয়। তার ছাগলগুলো কেন কেড়ে নেয়? ছাগলগুলি ছাড়া আর যে কিছু নেই তার।

তারপর ছাগলগুলি খোঁয়াড়ে রেখে, মনে মনে রামজী অওতারকে ডেকে তার পশুগুলিকে রক্ষা করতে বলে ও দুরুদুরু বুকে আসে নওয়াগড়ে। তার আস্তানায়। এ সময়ে তাকে বড় মদত দেয় ল্যাংড়া, কানী ও কুষ্ঠরুগী ছোকরা দোরা। ওরাই বলে দেয়, পুলিস এখনো আছে। ভাগ্ যা।

জলের কলসি ও ছাতু-গুড় নিয়ে ভিখারী আবার চলে যায় জঙ্গলে। রামজী অওতার কখনো কৃপা করেন। ছাগলগুলি অক্ষত থাকে। কখনো ভুলে যান ভিখারীর আবেদন। তখন লাকড়া নিয়ে নেয় কোনোটা। সাপ কেটে দেয় বকরা। শেয়াল নিয়ে যায় বাচ্চা।

জঙ্গলে গিয়ে ভিখারী পশুগুলিকে জল খাওয়ায়। নিজে খায় ছাতু ও গুড়, কাপড়ের খুঁটে জলে মেখে। এভাবে কখনো দু-তিন দিনও কাটে। রোজই ওকে যেতে হয় নওয়াগড়। তারপর পুলিস চলে যায় ও ফেরে।

এবার তো তিন-তিন মাস নওয়াগড়ে পুলিস। ভিখারী একেবারে বুনোই হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলের কিনার ধরে ধরে ও চলে যায় বাঢ়ার দিকে। সেখানে জঙ্গলে দেখা হয় রাঁকা দুসাদের সঙ্গে। রাঁকা সাহায্য না করলে এবার ভিখারী এতদিন জঙ্গলে থাকতে পারত না।

রাঁকা ওর সমস্যার কথা খুব মন দিয়ে শোনে। তারপর বলে, দাঁড়াও, দেখছি।

তিন-চারজন দুসাদ ছেলেকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যিখানে ঢুকে যায় রাঁকা। খুব পোক্ত করে খোঁয়াড় বানিয়ে দেয়। উপরে থাকে সপত্র গাছের ডালের ছাউনি। বলে, থেকে যাও এখানে। ওই নালা থেকে জল পাবে।

কি খাব?

পয়সা দাও, কিনে দিয়ে যাব।

এই যে।

কয়েকদিন বাদে রাঁকা বলে, কতদিন থাকবে কে জানে। ওই বকরাটা বেচে দাও।

কোথায়?

হাটে।

তোহরিতে?

আর কোথায়?

কখনো যাই না।

বিশ্বাস পেলে আমাকে দাও।

একি কথা রাঁকা? বিশ্বাস করব না?

দেখি।

বকরাটি বেচে দেয় রাঁকা এবং ভিখারী হাতে ষাট টাকা নিয়ে নিজেকে মনে করে রাজা। এই তিন মাস সময়ের মধ্যে তার বকরির বাচ্চা হয়। আরেকটি বকরা বেচে খোরাকির টাকা দেয় রাঁকাকে।

রাঁকাই বলে, এখন পুলিস নেই। মাঝে মাঝে টোলিতে এসে ঘুরে যেও।

বাঢ়ার টোলিতেই একদিন কনু দুসাদ বলে নওয়াগড় থেকে পুলিস চৌকি উঠে যাচ্ছে।

সত্যি?

তাই তো শুনলাম।

ভিখারীর মনে হয়, এখন চলে গেলেই হয়। ছাগল এখন আটটা। দুটো বকরি, দুটো বকরা, বাচ্চা চারটে।

রাঁকা বলে, চলে যাক, তারপর যেও।

চলে যায় পুলিস, চৌকি তুলে নেয়। তারপর ভিখারী রওনা হয় নওয়াগড়ে। আস্তানায় ফিরবে বলে মন খুব খুশি। আর নওয়াগড়ে ঢোকে যখন, যখন ফেরে আস্তানায়, তখন তাকে দেখে ভিখিরীরা কি খুশি, কি খুশি।

কানী ঝাউডাল দিয়ে ওর বাসাটা ঝাঁট দিয়ে দেয়। এক চোখে সব দেখে নেয় আর বলে, দেখে নে, সব তো আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব আছে, ঘাসে বোনা চাট্টিটা, গলাভাঙা বোতলটা, টিনের কুপি।

খবর আছে ভিখারী।

কি?

দোরা তো ভেগে গেল।

কোথায়?

সুমাদি। হাটে বসলে বেশি পয়সা। আর ল্যাংড়া কি করছে জানিস? দালিকে তাড়িয়ে দিয়ে আরেকটা মেয়েকে এনেছে।

তুই?

আমাকে কে নেবে বল্? এক চোখে দেখি না, দুচোখ কানা হলে পয়সা বেশি। আর তত বুড়োও হইনি। তাই মানুষ বলে, খেটে খেতে পারিস না? কম খাঁটি? যাই না তোহরিতে? হাঁটি না অতটা পথ?

সেই তো।

বাপ্ রে, কত ছাগল হ'ল?

কালই বেচতে বেরোব।

নওয়াগড়ে আরো খবর।

কি?

রাজাসাহেবের কি মিলেছে সরকারের কাছ থেকে। তাই খুব হইচই, আর খাওয়া-দাওয়া। সন্ধ্যেবেলা বাজি পুড়বে।

তোদের মজা।

না না এরা কি সে রকম, যে না খেয়ে ফেলবে এঁটো পাতে কিছু? আমরা খেতে পাব? সে খেয়েছিলাম তোহরির বৈজনাথ লালার মা মরে গেলে। এত এত পুরি-কচৌরি।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

কোথায় যাস?

একবার সুখচাঁদজীর কাছে যাই।

সুখচাঁদজী ওকে দুসাদ আর ছাগল চরৈয়া বলে ঘেন্না করে না। নওয়াগড়ে ঢোকার পর কেউ ভিখারীকে জিগ্যেস করেনি কি ভিখারী! এতদিন কোথায় ছিলি?

সে যে থাকে, তাও কারো চোখে পড়ে না। সে যে এসেছে, তাও কারো চোখে পড়ে না।

কা কিয়া যায় মহারাজ? এ তো হয়েই থাকে, হয়েই চলে। ছাগলের মাংস, দুধ, এসব জোগাবার জন্যে ভিখারীকে দরকার। অত্যন্ত সস্তায় মাংস ও দুধ জোগাবার জন্যে কিন্তু তা বলে তাকে হিসেবের মধ্যে আনা? ন না তা হয় না। এ কাহিনী বড় পুরনো। নওয়াগড়ের মাটির চেয়েও পুরনো।

সুখচাঁদের ইস্কুল আজ ছুটি, ছুটি, ছুটি। সুখচাঁদ বসেছিল বটগাছটির নিচে। নওয়াগড়ের গয়লারা খুবই সম্পন্ন লোক। মোতিহার ও ভকত বসে কি যেন শুনছিল। বয়েস কম, বোঝাবার উৎসাহ আছে, সুখচাঁদ ওদের খুব বিশদ করে কি বোঝাচ্ছে।

এস এস ভিখারী, কবে এলে?

আজ ভোরে সুখচাঁদজী।

ভাল আছো?

রামজী যৈসে রাখেন। আপনি ভাল?

হ্যাঁ ভিখারী। বোস বোস।

ভিখারী ভীরু হেসে দূরে বসল হাত জোড় করে। গয়লাদের পায়ে মোটা নাগরা, কানে পেতলের রিং, হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি, ওদের ভয় করে ভিখারী।

মোতিহার ভিখারী দুসাদকে আমলই দিল না। বলল না না সুখচাঁদজী আবার বলুন।

প্রথম থেকে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

বললাম তো।

তবু বুঝছি না। রাজাসাহেবের খাস জমি দিয়ে রেল লাইন বসল, বাস রাস্তা হ'ল, এতো হয়েই থাকে। কি ভকত। সরকার কি আকাশ দিয়ে লাইন টানবে, বাস রাস্তা বানাবে, তা কি হয় ?

হ্যাঁ হ্যাঁ মোতিহার, ঠিক ঠিক।

তার জন্যে রাজাসাহেব মামলা করল কেন ? ওই কথাটাই আমি বুঝছি না।

সুখচাঁদ বলল, কেন করবে না ? দেখুন, ও জমি কার ছিল ? রাজাসাহেবের ছিল ?

নিশ্চয়। আরে কত কত জমিন্।

সে জমিতে রাজাসাহেবের হক ছিল ?

একি কথা জী ! নিশ্চয় ছিল ?

এই নিজের সম্পত্তির ওপর যে হক, এর নাম ভারতীয় সংবিধানে এক মৌল অধিকার। মৌল অধিকার সাত রকম। আর সংবিধানের কর্তব্য হ'ল প্রতি ভারতীয় নাগরিকের মৌল অধিকার রক্ষা করা।

কা তাজ্জব ! ''মৌল অধিকার'' কোই বুরা বাত না হ্যায় জী ?

ঠিক বাত হ্যায় ?

কৈসে হো বুরাই বাত ? য়ে খেয়াল আপকো কৈসে আয়া, হাঁ মোতিহারজী ?

মোতিহার বলল, তখন বাটাইদাররা চেঁচাচ্ছিল ''মৌল অধিকার'' বলে, উসিসে না পুলিস আয়ি ?

নেই নেই, য়ো তো আইন-শৃঙ্খলা কা বাত আ গিয়া থা না ? ইস লিয়ে আয়ি পুলিস।

মৌল অধিকার কি রকম হয় ?

সুখচাঁদ খুব খুশি হয়। কেননা বিদ্যা জাহির করার সুযোগ মেলে তার। আঙ্গুলের কড় গুণে গুণে সে বলে চলে, প্রথমে হ'ল সাম্যতার মৌল অধিকার। জাত কি পাত, ধর্ম, কোনো কারণ দেখানো চলবে না। সবাই সমান। এ সব কারণে কারো ওপর অবিচার হতে পাবে না। এর নাম প্রথম মৌল অধিকার।

এ কথা লেখা আছে ?

নিশ্চয়।

মোতিহার সত্যে বিশ্বাসের তেজে সদর্পে বলল, সে জরুর আংরেজের লেখা। জাত-পাত-ধর্ম তফাত থাকবে না ? আমি আর ভিখারী দুসাদ সমান ?

নিশ্চয়। সংবিধান বলছে।

তবুও তা ঝুট। এ তো চোখেই দেখা যাচ্ছে সব সময়ে। জাতের কারণে ভিখারী দুসাদকে কোনো উঁচা জাতের লোক ঘরে উঠতে দেবে না, ওর ছোঁয়া জল খাবে না। এ নিশ্চয়ই কোনো দুশমনের বানানো কথা। কেন সুখচাঁদজি ? জবাহরজী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরাজী ছিলেন। আমরা তো কখনো এ সব কথা শুনিনি আর চোখেও দেখিনি দুসাদ আর বরাভ্ভোনকে কেউ সমান মান দেখাচ্ছে।

সুখচাঁদ মৌচাকে ঢিল মারে না। ওর সাধ্যমত সরল ভাষায় স্বাধীনতায় মৌল অধিকার কি কি, তা বোঝাতে চেষ্টা করে।

এখন ভকত বলে, ঝুট বাত।

কেন ?

যে যা কাজকাম করবে, তার স্বাধীনতা আছে ?

নিশ্চয়।

মুসলমান যা খায়, তার বেওসা করতে পারবে নওয়াগড়ের কেউ, করতে দেবে ?

সুখচাঁদ হাসে। তারপর বলে, অন্যগুলোও শুনে নিন। তারপরে বলি, আমি তো সন্ধ্যাবেলা সাবালকদের পড়াই, ক্লাস নিই। আপনারা আসুন, অন্যদেরও আনুন। পড়তে শিখলে আপনারা তো নিজেরা পড়তে পারবেন।

া কি করে হয় ? এই বয়সে ?

লেখাপড়ার কি বয়স আছে ?

জরুর।

কি আর বলব ! নিন শনুন।

'খুব মন দিয়ে শোনে মোতিহার ও ভকত।' ভিখারী একবারও মুখ খোলে না। শুনে যায় মৌল অধিকারগুলির কথা এবং সুখচাঁদকে সসম্ভ্রমে দেখে।

এখন মোতিহার বলে, ওই শেষ কথাটা, হাঁ, কারো সম্পত্তি সে যাই হোক না কেন, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা চলবে না, হাঁ—ওটা ভাল লিখেছে।

ওই কারণেই রাজাসাহেব ছ' লাখ টাকা পেলেন।

ছয় লাখ !

ছয় লক্ষ টাকার কথা ভিখারীর মনে কোন ভাবান্তর ঘটায় না। কেন-না ছয় লক্ষ টাকা যে কত টাকা, সে বিষয়ে তার কোন ধারণা নেই। মোতিহার ও ভকত কিন্তু থ মেরে যায়। ছয় লক্ষ টাকা !

সুখচাঁদ নিম্ন প্রাইমারী শিক্ষকের অনুমোদিত বেতনহারে মাইনে পায়। টাকার অঙ্ক তার মনেও কোন ভাবান্তর ঘটায় না। সে এখন মৌল অধিকার বোঝাতে চেষ্টা করে।

সেই কথাই তো বলছি। রাজাসাহেবের তো তাঁর জমির ওপর ছিল মৌল অধিকার। সরকার যখন লাইন পাতল, রাস্তা কাটল সে জমি দখল করে, তখন তো সে অধিকারে চোট দিল।

কৈসে ?

আরে, অনুমতি তো নেয় নি। ভেবেছিল ওটা সরকারী জমিই চলছে। গোল হয়েছিল কোথাও।

হাঁ হাঁ, তারপর ?

রাজাসাহেব সাবালক হয়ে কেস করল।

কার নামে ?

রেল বিভাগ, পূর্ত বিভাগ।

সে কেসে জিতে গেল ?

নিশ্চয়।

ওই কথাটাই ভাল, সম্পত্তিতে মৌল অধিকার। তবে তো তা জমিন্ হতে হবে, তাই নয় ?

না না ভকতজী। কি বলি ! দেখুন না, আপনার সম্পত্তি, ঘর- গরু-মোষ-আসবাব-বাসন, সব্। মোতিহারজীরও তাই। আমার সম্পত্তি এই কাপড়জামা-খাটিয়া-বইগুলো। ভিখরীর সম্পত্তি ওই ছাগলগুলো। স্থাবর-অস্থাবর সবই সম্পত্তি। সে কেউ কেড়ে নিলে ক্ষতি-পূরণ দিতে বাধ্য।

বুঝলাম। খুব শান্তি হল সব কথা জেনে।

আসবেন আবার।

বিদায় নেবার সময়ে মোতিহার বলে, এবার একটা বিয়ে করে নিন। আপনার জাতির মেয়ে নওয়াগড়ে আছে, আর ক্ষেতী-ভৈঁসা-হাল-সাইকেল সব দেবে।

না না।

চলি সুখচাঁদজী ?

হ্যাঁ জী।

ওরা চলে যায়। এখন ভিখারী যেন কোন নতুন কথা জেনে তার আঘাতে বির্পযস্ত।

সুখচাঁদজী।

বল ভিখারী।

ও কথা যে আপনি বললেন, ও সত্যি ?

সত্যি।

ও মৌলা অধিকার ?

মৌলা নয়, মৌল।

আর আমি ভাবতাম, ও বাটাইদারদের নারা উঠাবার কথা এক। ওরাও তো ও কথা বলেছিল।

হ্যাঁ ভিখারী।

রাজাসাহেবের জমিন্ তাঁর সম্পত্তি ?

হ্যাঁ।

আবার আমার বকরা-বকরি আমার সম্পত্তি ?

নিশ্চয়।

তো রাজাসাহেবে কা জমিন্ ছিন্ লি সরকার, ঔর না জানে কিত্না রুপয়া দি ?

হ্যাঁ।

তো আমার বকরা-বকরি তুলে নিয়ে যায় পুলিস, সুখচাঁদজী ! ওহি ডরে আমি ভেগে যাই জঙ্গলে—তো আমার বকরা-বকরি নিয়ে যায় পুলিস, আমি তো কখনো এক টাকাও পাই না ? তা সরকার ভুলে গেছে পুলিসকে ওই মৌল অধিকারের কথা বলতে ?

সেটা তো জুলুম করে ভিখারী।

তবে রাজাসাহেব যে টাকা পেল সুখচাঁদজী, শুধু রাজাসাহেব আর বড়মানুষরা পায়?

বেদনার্ত হেসে সুখচাঁদ বলে, কাজে হয়তো তাই দাঁড়ায় ভিখারী। কিন্তু সংবিধানে ভাল কথাই লেখা আছে। আমি তো বললাম তখন।

হম্ কা জানে সুখচাঁদজী কা লিখা হ্যায়।

রাজাসাহেব যে পেলেন, সেও মামলা করে। সংবিধানে এও লেখা আছে যে, মৌল অধিকার নষ্ট হলে তুমি মামলা করতে পার।

আমি? আমি কি করে মামলা করব সুখচাঁদজী? আমি মামলার কি জানি? পুলিস ছাগল নিলে কোনো দুসাদ তার নামে মামলা করতেও পারে না।

সুখচাঁদ বলে, করতে পারে, করার হক আছে।

কৈসে?

মানে হক আছে।

টাকা কোথায়? সাহস কোথা দুসাদের? ও হকের কথা আমি বুঝি না সুখচাঁদজী। উসিসে কুছ কাম তো হোতা নেই!

তাও সত্যি। কি যে বলি তোমায়......

কি আর বলবেন?—সুখচাঁদের বিভ্রান্তি ও বিব্রত ভাব দেখে হঠাৎ ভিখারী ওকে ভরসা দিয়ে হাসে। বলে, আপ কা করিয়েগা? ধরতি মে যো হি চলতা হ্যায় ওহি চলতে রহবে, হায় কি ন?

তা নয় ভিখারী। যা লেখা আছে তাই ঠিক। সেগুলো কাজে দাঁড়ায় না, কেন-না গলত্ আমাদের মধ্যেই। এতো আমাদেরও কাজ, তাই না?

আমি বুঝি না। মোতিহারজী ঔর ভকতজী, বাপ রে! কত কত গরু আর মোষ ওদের। ওরা তো অনেক জানে। ওরা যা বলল, তাই ঠিক। জাত পাত কি সমান হয়?

সুখচাঁদ নিজে ভিখারীর ছোঁয়া খাবার কথা ভাবতেও পারে না, কিন্তু তার ধারণা, সে জাত-পাত, ছুঁয়াছুঁতে অবিশ্বাসী। কেন-না ছাপা বইয়ে লেখা আছে জাত-পাঁত, ছুঁয়াছুঁত মিথ্যা, আর ছাপার অক্ষরে তার বিশ্বাস খুব। সেই বিশ্বাসের জোরে সে বলে, এ সব গেঁয়ো লোকের বিশ্বাস। না জবাহরজী তা বিশ্বাস করতেন, না ইন্দিরজী।

তবুও তো ছুয়াছুত আছে, হ্যায় কি ন। আর থাকবেই। দেখুন না, এতো ভগবানের সৃষ্টি। রামজী অওতার কাকে বানালেন বরাম্ভোন, কাকে বানালেন দুসাদ, ইসিসে ছুঁয়াছুতও চলতা হ্যায়। আমি তো কিছুই জানি না। কিন্তু টাহাড়ের দেওতা হনুমান মিশ্র তো এক আচ্ছা বরাম্ভোন, হায় ন? উনি দুসাদের ছায়াতে কখনো পা ফেলেন না। ওঁর সঙ্গে তো মহাদেব বিশ্বনাথের বাতচিত হয়। দেওদেওতার ইচ্ছা উনি জানেন।

সুখচাঁদ নাচার হয়ে হাল ছেড়ে দেয় ও বলে, বল ভিখারী, কেমন ছিলে?

এখন ভিখারীর মুখ আলোকিত হয়। হেসে ও বলে, ভালই ছিলাম। এত ভাল থাকব ভাবিনি। আর সব চেয়ে ভাল কি, বকরা-বকরি দশটা হয়েছে।

দশটা! বল কি?

বকরা দুটো জোয়ান। তা পনেরো-ষোল সের মাংস হবে। হাটে মাংস বেচে আট টাকা সের। যদি ছয় টাকা সেরেও কেনে গোটা মাল, তবে?

দুটোতে প্রায় দুশো টাকা পাবে।

দুশো টাকা!

হ্যাঁ ভিখারী।

ভিখারীর চোখ জলে ভরে আসে। বলে, সেই আশীর্বাদ করুন সুখচাঁদজী। দুশো টাকা পেলে আমার সব দুঃখের আসানী মিলে।

কৈসে?

কৈসে নহী? দেখুন না, তাহলে বিয়েও করতে পারি। সংসার হয় নিজের। দুসাদ মেয়ে খাটেপিটে জী। বকরা-বকরি নিয়ে জীবন চলে যাবে। একটা ঝোপড়ি তুলে নেব কোথাও। বাসনকোসন হবে, সংসার যেমন হয়।

তোমার ঘর কোথায় ভিখারী?

সেই বিজুপাড়া ছাড়িয়ে।

কেউ নেই তোমার?

না।

হোক, তোমার ভাল হোক।—আন্তরিক শুভেচ্ছায় বলে সুখচাঁদ। ভিখারীকে খুব আপনজন মনে হয় ওর।

চলি সুখচাঁদজী।

এস।

আজ না কি বাজি পুড়বে?

শুনছি তো তাই।

ভিখারী রওনা হয় ঘর-পানে। মনটা কেন যেন ভাল লাগে ওর। বকরা-বকরিগুলিকে আদর করতে সাধ যায়। পুলিস ওর একটা উপকার করে গেছে। নওয়াগড়ে পুলিস-চৌকি না বসলে ও পালাত না বাঢ়া।

বাঢ়া গিয়েছিল বলে রাঁকার মদত পেল। সে মদত পেল বলেই ছাগল বেড়ে বেড়ে দশটা হল।

পথে ও কিনে নিল আটা, লবণ, মরিচ, শুকনো কচু। লালাকে বলল, ভাল আছেন লালাজী?

লালা ওর কথার জবাবও দিল না। রামধারী ঠিকাদারদের কথা শুনতেই ব্যস্ত থাকল। সওদা নিতে নিতে ভিখারী শুনল, বাজি পোড়ানো হবে "শূরমহল"-এর সামনের মাঠে। সন্ধ্যাবেলা। পাঁচ হাজার টাকার বাজি পুড়বে। শুনে ও ঠিক করল, সন্ধ্যাবেলাই বাজি পোড়ানো দেখতে যাবে। এখন ও একটা ছোট কাপড়কাচা সাবানও কিনল। সাবান দিয়ে কাপড়টা কেচে নেবে।

কচুর রাঁধবে শুকনো ঝাল, রুটি বানাবে কড়া সেঁকা। আজ আর কাল দুদিন চলে যাবে। দুশো টাকা। ল্যাংড়া যদি আরেকটা মেয়ে আনতে পারে, ভিখারীও পাবে একটা বউ। প্রথমটা বকরি চরাতে হবে। তারপর বলা যায় না, হয়তো জমি পেতে পারে কিছু। বিয়ে করলে আত্মীয়-বন্ধুর সমাজ পাবে একটা ভিখারী। তারাও সাহায্য করবে। একা একা পারা যায়

না-কি? বাঢ়া-টাহাড়-নাঢ়া——— আরো আরো রুক্ষ মানুষের মদতে ও সাহচর্যে মনে জোর থাকে কত।

কাপড় কেচে নিল ভিখারী। রাঁধতে বেলা গেল। খেতে সূর্য ডুবল। ছাগলগুলি গুণে গুণে বাসে ওঠাল ও। ঝাঁপ টেনে দেবে, এমন সময়ে ওরা এল।

রাজাসাহেবের সেপাই, দুজন পুলিস।

পুলিস।

ভিখারী ভীষণ ভয়ে ঝাঁপে পিঠ রেখে দাঁড়াল। এ কি ব্যাপার? পুলিসচৌকি নেই, পুলিস নেই, সেই জন্যই তো নওয়াগড়ে ফিরেছে ভিখারী। পুলিস?

কা ভিখারী? ডর গৈল্ কা?

সেপাই গজানন হাসল। মুখে মদের গন্ধ।

দো বকরা নিকাল। রাজাসাহেব পুরা থানাকে নেমন্তন্ন করে বসেছে, কাঁহা মিলে গোস্?

নায় নায়। বকরা না হ্যায়।

তব্‌ বকরি নিকাল।

এ্যায়সা ন করিও সিপাই সাহেব, গোড় লাগি, গোড় লাগি তুমহাবা। ওহি হামাবা জীউ-জীবন হায় দেওতা। ন লিয়া করো।

ভাগ্ শালে দুসাদ!

গজানন হাতের চেটো দিয়ে প্রচণ্ড চড় মারে ভিখারীব মুখে। নাকের চামড়া ও ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরে। ভিখারী তবুও চেঁচায় ওহি পুলিসকে ডরসে মরে হাম, ভাগ যাই বাঢ়া, ন লিয়া করো সিপাহীজী, ও পুলিস উঠা লেতা বকরি, লেতেহি চল্‌তা।

কাহে ন লি? রাজাসাহেব পাত্তা চলাই তব পুলিস আই না? গোস্ কা খরিদ খায়েগি? তু রাজাসাহেব কা মলুক মেঁ রহত্ হো, ন? চল্, ভাগ্।

ভিখারী বিপদে পাগল ও উন্মত্ত হয়। বলে, বকরা-বকরি পর হামানি কে ঐসেহি হক্ হ্যায়, যৈসে হক্ থে রাজাসাহেব কা যো জমিন্ পর ঔর জমিন্ ছিন্ লি যব, উসি হক সে উন্‌কা রূপয়া মিলি। হাম কাহে ছোড়ে হামানি কা হক?

কা? কা বোলা দুসাদ?

সিপাহী ও পুলিস দুটি ভিখারীকে মারে। দক্ষ নিপুণ পেশাদারী, প্রশাসন অনুমোদিত মার। মারতে তাদের দম ছোটে না ও মারতে মারতে তারা বলে চলে, কথাগুলো শুনেছ ভাই গজানন? বাটাইদার লোক ওই লড়াই করতে গিয়ে এদের হক-টক শিখিয়েছে। পুলিস বকরা খাবে না শালা? কোন খাবে শুনি? পুলিস খাবে না? হঁ ভাই গজানন, এ তো আরেক রাজাসাহেব নওয়াগড়ে। রাজাসাহেবের জমিনে হক আর এর বকরায় হক না-কি একই?

মেরে-ধরে রক্তাক্ত ভিখারীকে ফেলে রেখে ওরা ঝাঁপ খোলে। বকরা ও বকরি চারটিই নিয়ে চলে যায় মহোল্লাসে।

ভিখারী পশুর মত কাঁদতে থাকে, কাঁদতেই থাকে। নড়তে পারে না যন্ত্রণায়, ও কাঁদে বঞ্চনাব বেদনায়। মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা সুখচাঁদজীর। বকরা-বকরিতে তাব যে অধিকাব,

সেও এক মৌল অধিকার? সম্পত্তিতে অধিকার সপ্তম মৌল অধিকার? মৌল অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তা দেখে ভারতের সংবিধান? মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা। ভিখারীব মৌল অধিকার যে বারবার ক্ষুণ্ণ হয়? রাজাসাহেবের ক্ষতিপূরণ মেলে, ভিখারীর মেলে না কেন? রাজাসাহেবকে ছয় লক্ষ টাকা দিলেই ক্ষতিপূরণ হয়। ভিখারী দুসাদের বকরা-বকরি নিয়ে বাঁচবার মৌল অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তাকে নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা ভারত সবকারের নেই, সে জন্যই ভিখাবী ক্ষতিপূবণ পায় না?

গায়ে কাদের শীতল ছোঁয়া। কানী ও ল্যাংড়া, ল্যাংড়ার মেয়েমানুষ ভিখাবীকে ধবাধবি কবে সরিয়ে আনে। ল্যাংড়ার মেয়েমানুষ ন্যাকড়া ভিজিয়ে ওর গা থেকে বক্ত মোছে। কানী মোছে মুখের রক্ত। ল্যাংড়া বলে, পানি পি লে ভিখাবী।

ল্যাংড়ার মেয়েমানুষ বলে, চুন নিয়ে আসি আমি। চুন দিলে রক্ত বন্ধ হবে, ব্যথাও হবে না।

তিন ভিখিরি ভিখাবীব পরিচর্যা করে। ক্ষত শুকোতে, উঠে দাঁড়াতে ভিখারীব দিন দশেক যায়। তাবপর ভিখারী বলে, চল্, ল্যাংড়া, বাচ্চাগুলো বেচে দিয়ে আসি। যা মিলে!

কুড়ি টাকায় চারটি বাচ্চা বেচে দেয় ভিখাবী। ওব কোমব আব সোজা হবে না, ক্ষতবিক্ষত মুখে চিহ্ন থেকে যাবে মৌল অধিকার বক্ষায় প্রথম ও শেষ প্রতিবাদেব পবিণামের। মাথাটা কামিয়ে ফেলতে হবে ঘা শুকোলে।

অব কা কবব্, হাঁ ভিখাবী?

ভিখ মাঙল্ব।

ভিখ্।

হাঁ, ভিখ্ মাঙল্ব।

ইঁহা।

নায়।

মাথা নাড়ে ভিখারী। ওদের টাকা দেয় তিনটে কবে। লালাব দোকানে শোধ দেয় ছয় টাকা। ছাগল বাঁধা দড়ির দরুন মোতিহাবেব চাকবকে শোধ দেয় দু'টাকা। তিনটি টাকা ট্যাকে গোঁজে। গাছের ডাল চেঁছে লাঠি বানিয়ে নেয় একটা। তোহরির হাট থেকে বাটি কিনবে একটা। ভিক্ষাপাত্র। ছ'আনা নিলামে, এক টাকা নিলামে, যা মেলে।

সুখচাঁদ ওকে দেখে দাওয়া থেকে নেমে আসে। ঘটনাটির কথা ও শুনেছে।

ভিখারী!

চলে যাচ্ছি সুখচাঁদজী।

কোথায়, ভিখারী কোথায়?

যেখানে ভিখ মিলবে।

ভিখ! ভিখ মিলবে।

হাঁ সুখচাঁদজী।

কিন্তু তোমার গায়ে তো এখনো.....

এই কথা! কা কিয়া যায় মহারাজ? আপ তো ঝুট বোল দিয়া হমানি কো। মেরে লিয়ে তো য়ো মৌলা অধিকার হ্যায়ই নহী। সিবিফ বাজাসাহেব কা লিয়ে হ্যায়। চলে সুখচাঁদজী।

লাঠির ভরে চলে ভিখারী দুসাদ। ধীরে ধীরে । পরম নির্ভয়ে। এখন .লিস দেখলেও ভয় পাবে না ও। বকরা-বকরি, জমি, বাসনবর্তন, দুসাদের সম্পত্তি থাকলে পুলিসকে ভয় করতে হয়। পালাতে হয় জঙ্গলে। তেমন দুসাদ দেখলে, হাঁ, পুলিস জরুর মারেগি, ছিন্ লেগি সব। নিঃস্ব রক্ষ ভিখিরী দুসাদ দেখলে পুলিস মারবে না। কখনো মারবে না। ভিখারীর এখন মনে হয়, এই কথাটা জানত না কেন ও? মাতৃভূমিতে দুসাদ যদি রাজাসাহেব, লালাজী, পুলিস, হনুমান মিশ্র সকলের ক্ষমা পেয়ে বেঁচে থাকতে চায়; তার একমাত্র পথ হল ভিখমাঙা হয়ে যাওয়া? যেসব দুসাদ বকরি-চরৈয়া ভিখারী দুসাদের মত মাতৃভূমি থেকে মানুষের মত বাঁচার রসদ খুঁজতে যায়, তাদের ওপরেই তো রেগে যায় ওরা।

নিজেকে একলাও লাগে না ওব। কোথায় নেই ভিখমাঙা? কানী-ল্যাংড়া-দোরারা সব জায়গায় আছে। এখন ভিখারী এক্টা বড়, মস্ত বড় সমাজের সদস্য।

সুখচাঁদ ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেখে ভিখারী দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকারে বঞ্চিত হলেও, তিন নম্বর মৌল অধিকারের প্ররক্ষা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার। যে-কোনো বৃত্তি বা জীবিকার অধিকার। ভিখারী ভিখমাঙার বৃত্তি নিয়েছে। ও যাতে জন্ম জন্মকাল ভিখমাঙাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান তা নিশ্চয় দেখবে। ওকে উন্নততর জীবনে ও জীবিকায় যদি কেউ উত্তরিত করতে চায়? মৌল অধিকারে সে হস্তক্ষেপ ভারতের সংবিধান সহ্য করবে না। ভারতের যেখানেই সে অন্যায় ঘটুক, ভারতের সংবিধান সেখানে নামিয়ে দেবে পুলিস, রিজার্ভ পুলিস, সামরিক পুলিস, সেনাবিভাগ, ট্যাঙ্ক, জঙ্গীবিমান সব।

ভিখারী দুসাদ পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়। এখন আর তার কিছু হাবাবার নেই।

□□

Printed at Shivam Offset Press, A-12/1 Naraina Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110 028